বাংলা লোকগীতিকায় প্রতীক ও চিত্রকল্পের ব্যবহার

মোঃ শাহনেওয়াজ রিপন

401855

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
401855

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
ডিসেম্বর ২০০৪

বাংলা লোকগীতিকায় প্রতীক ও চিত্রকল্পের ব্যবহার

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এম.ফিল.ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ)

তত্ত্বাবধায়ক :

ডঃ সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক :

মোঃ শাহনেওয়াজ রিপন

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২৩, শিক্ষাবর্ষ : ১৯৯৭-৯৮

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

প্রত্যয়ণ পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ণ করা যাচ্ছে যে, **মোঃ শাহনেওয়াজ রিপন** কর্তৃক উপস্থাপিত **'বাংলা লোকগীতিকায় প্রতীক ও চিত্রকল্পের ব্যবহার'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ
ডঃ সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

সূচিপত্র

অবতরণিকা ১

প্রথম অধ্যায় : বাংলা গীতিকার সাধারণ ও তুলনামূলক পরিচয় ৯

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলা গীতিকায় প্রতীক ৫৯

তৃতীয় অধ্যায় : বাংলা গীতিকায় চিত্রকল্প ১২৯

উপসংহার ১৬৩

গ্রন্থপঞ্জি ১৬৫

তথ্য সংকেত

মৈগী=মৈমনসিংহ গীতিকা (দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত)
পূগী=পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা (দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত)

অবতরণিকা

প্রতীক ও চিত্রকল্পের স্বরূপ

প্রতিটি শব্দেরই দুটি মাত্রা থাকে - ধ্বনি এবং অর্থ। ধ্বনির আশ্রয়ে গঠিত হয় শব্দালঙ্কার এবং অর্থের আশ্রয়ে গঠিত হয় অর্থালঙ্কার। প্রতীক (Symbol) ও চিত্রকল্প (Image) উভয়ই অর্থালঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত।

ক. *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*-এ প্রতীক বলা হয়েছে কোনো সঙ্কেত বা চিহ্ন দ্বারা ভাবপ্রকাশের পদ্ধতি (শৈলেন্দ্র বিশ্বাস ১৯৯৩:৪৪৬)। *Oxford Advanced Learner's Dictionary*-তে প্রতীকের অর্থ "mark or sign with a particular meaning" (Hornby 1994:1304)। *Literary Terms : A Dictionary*-তে প্রতীকের সংজ্ঞা করা হয়েছে, " In its simplest sense, it is also something that stands for something else" (Beckson and Ganz 1982:246)। *A Dictionary of Literary Terms*- এ গ্রিক শব্দ 'Symballein' ও 'Symbolon' থেকে 'Symbol' শব্দটির উৎপত্তি বলে দাবি করা হয়েছে। Symbol বা প্রতীক সম্পর্কে সেখানে আরো বলা হয়েছে "It is an object, animate or inanimate, which represents or 'stands for' something else" (Cuddon 1982:671)। A *Glossary of Literary Terms* এ বলা হয়েছে:

> "A symbol, in the broadest sense of the term, is anything which signifies something else... Symbol is applied only to a word or set of words that signifies an object or event which itself singnifies something else; that is, the words refer to something which suggests a range of reference beyond itself" (Abrams 1999:168)।

আসলে সঙ্কেত বা চিহ্ন (sign) হচ্ছে প্রতীক প্রকাশ করার মাধ্যম; অর্থাৎ সঙ্কেত বা চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত ভাবটিই প্রতীক। তাই প্রতীক মাত্রেই একরকম চিহ্ন। প্রতীকের মাধ্যমে কবি অভিজ্ঞতালব্ধ সামগ্রিক চেতনার পরোক্ষ প্রকাশ ঘটান। অর্থাৎ বিভিন্ন ধারণা, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি প্রভৃতি কবির চিত্তে গোপনে যে শিল্পরূপ ধারণ করে তা-ই প্রতীক। *বিষ্ণু দে-র কবি স্বভাব ও কাব্যরূপ* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "বস্তুত প্রতীক হচ্ছে এক ধরনের গোপন প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের খেলা, অর্থ খুঁজে পেলেই পাঠকের বুদ্ধি নান্দনিক হয়ে ওঠে" (বেগম আকতার কামাল ১৯৯২:১৯০)। তাঁর মতে প্রতীকের এ গোপনতা হচ্ছে এক ধরনের 'অস্পষ্ট মজা'। প্রতীক থেকে অব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন অর্থটি পাঠক তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে বের করা মাত্রই 'অস্পষ্ট মজা'র সন্ধান লাভ করতে পারবেন। প্রতীকের এ গোপনতাকেই একটি গভীর রহস্য হিসাবে মনে করে *রবীন্দ্র কাব্য: উপমা ও প্রতীক* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "প্রতীক হচ্ছে কতকগুলি অভিজ্ঞতার সমষ্টি, সম্মিলন, একটি গভীর রহস্য, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে বিচিত্র ব্যঞ্জনা" (আহমদ কবির ১৯৮৬:১০০)।

যে কোনো বস্তুর নাম উচ্চারণ করলে ঐ উচ্চারিত শব্দটি দ্বারা আসলে আমরা ঐ বস্তু সম্পর্কে একটি ধারণা পাই। কেননা শব্দটি আসল বস্তুটির প্রতীক মাত্র। অর্থাৎ একটি ধারণাকে যখন ভিন্ন আরেকটি ধারণা দিয়ে প্রকাশ করা হয় তখন তা-ই প্রতীক হয়ে ওঠে। যেমন 'ফুল' বলতে শব্দটি ফুল নয় বরং

ফুলের ধারনা। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ যখন তার অর্থকে অতিক্রম করে ভিন্নতর অর্থ প্রকাশ করে বা প্রকাশের ইঙ্গিত দেয় তখনই তাকে প্রতীক বলা যায়। যেমন:

"পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতাসেন"

এখানে চোখকে পাখির নীড়ের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে। কোনো কোনো বস্তুর কর্ম ও এর বহুল পরিচিত চরিত্রের উপর নির্ভর করে কিছু প্রতীক গড়ে ওঠে। যেমন ময়ূর অহঙ্কারের প্রতীক, সিংহ বীরত্বের প্রতীক, অগ্নি ক্রোধের প্রতীক, সকালের সূর্য জন্মের প্রতীক, অস্তাচলগামী সূর্য মৃত্যুর প্রতীক, ইত্যাদি।

প্রতীক ভাবের প্রকাশক এবং অনুপস্থিত বিষয়ের প্রতিনিধি। অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার প্রকাশে এটি অপরিহার্য। প্রতীককে প্রতীকরূপেই কাব্যে পাওয়া যায়। সে বলার আগ্রহ দেখায় কিন্তু বলে না। এ বলার আগ্রহই তার ভাষা এবং গোপনতা।

প্রতীকের ধারণা স্পষ্টতর করার জন্য রূপকের সাথে এর পার্থক্য প্রসঙ্গে *আধুনিক কবিতায় চিত্রকল্প চর্চা* গ্রন্থে বলা হয়েছে:

> "রূপকের সঙ্গে প্রতীকের পার্থক্য বিস্তারিত তুলনায়। প্রতীকের মধ্যে রূপক থাকতে পারে কিন্তু রূপক হতে গেলে তার মধ্যে আরও অনেক বেশি সম্ভাবনা থাকা চাই। প্রতীক অভিজ্ঞতার বিস্তৃত ক্ষেত্র বিচরণ করেই বিচিত্র আস্বাদে নিজেকে সমৃদ্ধ করে, রূপক কিন্তু তা নয়। শব্দচিত্র প্রথমে রূপক, পরে হয়ে ওঠে প্রতীক" (শিখা দত্ত ২০০২:১৮)।

প্রতীক সর্বদাই একার্থবোধক। এর অর্থ পাঠক নির্বিশেষে এক ও অভিন্ন। কিন্তু কোনো কোনো প্রতীক একাধিক অর্থও বহন করতে পারে, কিংবা একই প্রতীক একাধিকবার আসতে পারে এবং তা বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন রকমও হতে পারে। কবি কোন্ অর্থে তা ব্যবহার করেছেন তা সমালোচকের কাছে স্পষ্ট হয় না। যেমন প্রতীক হিসাবে হরিণ প্রাণের প্রতীক হতে পারে, সৌন্দর্যের প্রতীক হতে পারে, চাঞ্চল্যের প্রতীক হতে পারে। একইভাবে ফুল জীবন সচেতনতার প্রতীক, পবিত্রতারও প্রতীক হতে পারে। এ কারণে প্রতীককে বহু সম্পর্কের সংযোগ কেন্দ্রও বলা হয়ে থাকে।

আদর্শ সৌন্দর্যকে শিল্পরূপ দিতে প্রতীক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এতে ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহত্ত্বের ব্যঞ্জনা লাভ করা যায়। বস্তু বা বাস্তবের অন্তর্নিহিত আত্মার সারবস্তু প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। প্রকৃত প্রতীক বিশেষ কোনো অর্থ বহন না করে তা বিভিন্ন অর্থের প্রকাশ হয়ে দাঁড়ায়।

কবিরা কখনো কখনো গতানুগতিক ও অতি পরিচিত প্রতীক ব্যবহার করেন, আবার কখনো নিজেদের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচনা করেন অপ্রচলিত প্রতীক। তবে প্রতীক যে ধরনেরই হোক না কেন তাকে সর্বজনগ্রাহ্য বা সর্বজনীন হতে হবে।

কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীকগুলো কবি নিজেই ইচ্ছে মতো তাঁর পারিপার্শ্বিক থেকে বেছে নেন। কারণ প্রকৃতিই হচ্ছে প্রতীকের ভাণ্ডার, যা মানবহৃদয়কে আনন্দ বেদনায় আপ্লুত করে। প্রকৃতির যে কোনো উপাদানই প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন চন্দ্র, সূর্য, নদী, সমুদ্র, আগুন, পাথর, পাহাড়, পদ্ম, সাপ, হরিণ, ভ্রমর, স্বর্ণ ইত্যাদি।

যেহেতু প্রকৃতির যে কোনো উপাদানই প্রতীক হতে পারে সেহেতু এর শ্রেণীবিভাগ করা অত্যন্ত কঠিন। *A Glossary of Literary Terms* গ্রন্থে দুই প্রকার প্রতীকের কথা বলা হয়েছে- ১. conventional or public (প্রচলিত অথবা সাধারণ প্রতীক) এবং ২. private or personal symbols (নিজস্ব অথবা ব্যক্তিগত প্রতীক) (Abrams 1999:168-169)। *A Dictionary of Literary Terms* গ্রন্থেও দুই প্রকার প্রতীকের কথা বলা হয়েছে- ১. public or private (সাধারণ অথবা নিজস্ব প্রতীক) এবং ২. universal or local (সর্বজনীন অথবা স্থানীয় প্রতীক) (Cuddon 1982:671)।

বিভিন্ন প্রতীক সম্পর্কে আলোচনায় এর সু-শৃঙ্খল শ্রেণিবিভাগ পাওয়া যায় না। অথচ শ্রেণিবিভাগ না করে প্রতীক- বিশ্লেষণ বা আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায় এ-বিবেচনা থেকে আলোচ্য অভিসন্দর্ভে বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য বাংলা গীতিকায় প্রাপ্ত প্রতীকগুলো-কে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. নৈসর্গিক প্রকৃতি আশ্রয়ী প্রতীক
২. বস্তু আশ্রয়ী প্রতীক
৩. প্রাণি আশ্রয়ী প্রতীক
৪. কাল্পনিক জীব-জন্তু ও ধর্মীয় চরিত্র আশ্রয়ী প্রতীক
৫. সংস্কার আশ্রয়ী প্রতীক এবং
৬. বিবিধ প্রতীক।

খ. অর্থালঙ্কারের মধ্যে চিত্রকল্পের ধারণা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। প্রাচীন কাব্যশাস্ত্রে এর উল্লেখ পাওয়া যায় না ; যদিও প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যেও চিত্রকল্পের ব্যবহার প্রচুর। বলা যায় কবিতায় চিত্রকল্পের ব্যবহার সুদূর অতীত থেকে; তথাপি 'চিত্রকল্প' শব্দের ধারণাটি আধুনিক যুগেরই সৃষ্টি।

চিত্রকল্পকে সংজ্ঞায়িত করা যায় কল্পনায় কোনো কিছুর অবয়ব দান রূপে। 'চিত্র' হচ্ছে ছবি এবং 'কল্প' কল্পনা শব্দেরই খণ্ডিত অংশ। সাধারণভাবে অবস্তুগত বা বিমূর্ত বিষয় বস্তুগত বা মূর্ত বিষয়ের উপর অথবা বিপরীতক্রমে কিংবা মূর্ত বিষয়ের উপর মূর্ত বিষয় আরোপিত হলেও চিত্রকল্পের সৃষ্টি হয়। আবার অচেতনে চৈতন্য আরোপিত হলেও চিত্রকল্পের সৃষ্টি হয়। প্রতীকের আশ্রয়েই বেশির ভাগ চিত্রকল্প গঠিত হয়। যেমন:

> "সবুজ স্বচ্ছ জল সাপের চিকন দেহের মত"

উদ্ধৃতিটি একটি অচেতনে চৈতন্য আরোপিত চিত্রকল্প এবং 'সাপের চিকন দেহ' প্রতীকটিকে আশ্রয় করেই তা গঠিত হয়েছে। এখানে মূর্ত বিষয়ের উপর মূর্তই আরোপিত হয়েছে। তবে চিত্রকল্প গঠনে প্রতীক অনিবার্য নয়; উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষাকে আশ্রয় করেও চিত্রকল্প তৈরি হতে পারে। তবে চিত্রকল্পটি উপমা, রূপক, প্রতীক বা আর যা-ই হোক, অসমান দুটি ব্যাপারের মধ্যে কবি যখন সঙ্গতি সাধন করেন এবং তা যখন আমাদের কোনো ইন্দ্রিয়ের কাছে আবেদন সৃষ্টি করে তখনই তা সার্থক হয়ে ওঠে। এটি সর্বদা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় না, তাকে কখনো মূর্ত আবার কখনো বিমূর্তভাবে পাওয়া যায়। এগুলো পঞ্চেন্দ্রিয় নির্ভর। এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়গম্য না হওয়া পর্যন্ত তা চিত্রকল্প হতে পারে না। তাই কবিতায় চিত্রকল্পের সবচেয়ে বড় ভূমিকা হলো কবিতাকে ইন্দ্রিয়গম্য কারে তোলা। অর্থাৎ এগুলো দর্শনেন্দ্রিয়ের বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বা রসনেন্দ্রিয়ের বা ত্বগেন্দ্রিয়ের হয়ে থাকে। তবে প্রত্যক্ষতা চিত্রকল্পের মৌলধর্ম।

অনুষঙ্গ বা বিষয়ীভূত হওয়া চিত্রকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোন্ কোন্ প্রসঙ্গ নিয়ে চিত্রকল্পটি নির্মিত হয়েছে তার উল্লেখ থাকা দরকার। অভিনবত্ব এর অপর বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি চিত্রকল্পই অভিনব। নতুন নতুন চিত্রকল্প সৃষ্টিতেই কবির কবিতা হয়ে ওঠে চিত্ররূপময়। একই চিত্রকল্প বার বার ব্যবহার করলে এ-অভিনবত্ব খর্ব হয়। রস রূপায়ণের অভিনবত্বেই চিত্রকল্পের জন্ম। একইভাবে গতিময়তা, প্রাণময়তা বা চলমানতা এর আরেকটি শর্ত; যদিও ক্ষেত্র বিশেষে স্থির চিত্রকল্পের সাক্ষাত পাওয়া যায়। চিত্রকল্প সাহিত্যের যে কোনো উপাদানের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। শুধু কাব্যে বা কবিতায়ই চিত্রকল্প থাকবে এমন নয়। যে কোনো সাহিত্যিক রচনাতেই এর সাক্ষাত লভ্য। বিভিন্ন সমালোচক এর বিভিন্ন নাম দিয়েছেন। যেমন - চিত্রকল্প, বাক্‌কল্প, রূপকল্প, শব্দকল্প, চিত্রপ্রতিমা, চিত্তপ্রতিমা, বাক্‌প্রতিমা, বাকচিত্র, রূপচিত্র, কল্পচিত্র, ভাবরূপচিত্র, মানসপ্রতিবিম্ব, বাণীশিল্প, চিত্রক, কল্পক, বিম্বক ইত্যাদি।

বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ গ্রন্থে 'A few point' (১৯১৩) রচনায় এজরা পাউন্ডকৃত চিত্রকল্পের সংজ্ঞাটি হলো, "An 'Image' is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time" (বেগম আকতার কামাল ১৯৯২:১৫১)। সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করে বলা যায়, চিত্রকল্প কবিসত্তার বুদ্ধি ও আবেগের মিশ্রণে একটি জটিলতার উপস্থাপন যা সময় ও কালিক মাত্রা থেকে চেতনার মুক্তি ঘটাতে সাহায্য করে।

চিত্রকল্পকে শব্দ দিয়ে গড়া কতগুলো চিত্রমাত্র আখ্যা দিয়ে *রবীন্দ্র নির্মাণ : কবিতার অবয়ব* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "ইমেজের সবচেয়ে সহজ ও ব্যাপক সংজ্ঞা হচ্ছে-ওটা আর কিছু নয়- শব্দচিত্র, 'a picture made out of words" (জীবেন্দ্র সিংহ রায় ১৯৮৪:১৫২)। কিন্তু মনে রাখতে হবে চিত্র মানেই চিত্রকল্প নয়। কবি যা দেখেন ভাষা দিয়ে তারা এক অপূর্ব ছবি এঁকে সেই চিত্রে তাঁর মনের সৌন্দর্য-সুরভী দান করেন, ছবিকে জীবন্ত করেন। এটাই হচ্ছে কবিতার চিত্র সৃষ্টি।

উপমান এবং উপমেয়র মধ্যে দুটি চিত্র থাকে। একটির স্পর্শে আরেকটি প্রাণ পায়। সমৃদ্ধ চিত্রটিই পরবর্তীকালে হয়ে ওঠে সার্থক চিত্রকল্প। অর্থাৎ উপমান ও উপমেয়র মধ্যে উপমানকে আশ্রয় করেই সার্থক ও সুন্দর চিত্রকল্পের জন্ম হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতীক হতে পারে তাদের আশ্রয়। কবিরা চিত্রকল্প রচনার জন্য স্বাভাবিক প্রতীকগুলোকেই উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেন। এর ফলে যে সমস্ত স্মৃতি জাগ্রত হয় তার সাহায্যেই গঠিত হয় চিত্রকল্প।

চিত্রকল্পের কাজ শুধু সাদৃশ্য সৃষ্টি নয়। এ প্রসঙ্গে সমালোচক স্পার্জিয়ন তাঁর *iterative imagery : aspects of shakespeare* গ্রন্থে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, "When I say 'Images' I mean every kind of picture, drawn in every kind of way, in the form of simile and metaphor - in their widest sense"-। তিনি এখানে উপমা ও রূপকের বিকল্প হিসাবে চিত্রকল্পকে বেছে নেন। কিন্তু *রবীন্দ্র কবিতা ও চিত্রকল্প* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "কল্পনার বাহন হিসাবে চিত্রকল্পের মর্যাদা উপমা, রূপকের অনেক উর্ধ্বে হওয়ায় চিত্রকল্পের পরিবর্তে উপমা অথবা রূপক অভিধা ব্যবহার অথবা উভয়ের একাত্মতা স্বীকার চিত্রকল্পের ভূমিকা ও দায়িত্বকে অযথার্থভাবে সঙ্কুচিত করে" (তুষার কান্তি মহাপাত্র ১৯৮৭:৩)। তবে উপমা ও রূপক সেখানেই চিত্রকল্প হতে পারে যেখানে উপাদান হিসাবে থাকে আবেগের ভাষারূপ ব্যঞ্জনা।

চিত্রকল্প প্রসঙ্গে *ময়মনসিংহের গীতিকা : জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য* গ্রন্থে বলা হয়েছে,

> "একটি উপমান-চিত্র যখন কেবল সরল-চিত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে, পাঠকচিত্তে অনুভূতিময় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে, সংবেদনায় হয়ে ওঠে মাত্রাবহুল, রং ও রেখার কারুকার্যে তার দ্যুতিময়তা ক্যানভাসের চতুষ্ক সীমা অতিক্রম করে যায়- তখনই তা চিত্রকল্প হয়ে ওঠে" (সৈয়দ আজিজুল হক ১৯৯০:৩৭৮)।

সংস্কৃত, গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতগণ মনে করতেন চিত্রকল্প অলঙ্কারমাত্র। কিন্তু ছন্দ যেমন অলঙ্কার নয়; চিত্রকল্পকেও আধুনিক কাব্য-সমালোচকগণ অলঙ্কার বলে মনে করেন না। *সাহিত্যালোক* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "বাক প্রতিমা অলঙ্কার নয় যেমন নয় ছন্দলীলা, বস্তুত ছন্দে ও প্রতিমায়ই কাব্যের অন্তরতম সত্তা" (অমলেন্দু বসু ১৯৭১:৬)। তবে আমাদের বিবেচনায় যেহেতু চিত্রকল্পে চিত্রই প্রাধান্য পায় এবং তা কাব্যের রসাস্বাদনে সহায়তা করে, সেহেতু এটি অলঙ্কারের আলোচনায় স্থান পেতে পারে। কাব্যের প্রতিটি চিত্রকল্পই চিত্রলোকে পৌঁছবার মাধ্যম হতে পারে। কখনো কখনো অলঙ্কার শুধু কাব্যের অলঙ্কার হয়ে থাকে, আবার কখনো অলঙ্কারকে আশ্রয় করে চিত্রকল্প জন্ম নেয়। চিত্রকল্পের তিনটি অঙ্গ থাকে:

১. উপমা (simile)
২. রূপক (metaphor) এবং
৩. সঙ্কেত বা প্রতীক (symbol)।

সুতরাং বলা যায় চিত্রকল্প তৈরিতে যে সব অলঙ্কার প্রয়োজন সেগুলো অর্থালঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে চিত্রকল্পও অর্থালঙ্কারভুক্ত হয়ে যায়। তাছাড়া কাব্যালঙ্কারের কাজ কবির ভাবনাকে সুন্দর ও রূপময় করে তোলা। আর চিত্রকল্পের উদ্দেশ্য ঐ রূপময় জগতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। তাই বলা যায় অলঙ্কারের যেখানে শেষ চিত্রকল্পের সেখানেই শুরু। এ প্রসঙ্গে *বৈষ্ণব কবিতায় রূপকল্প*এ *কবি ও কবিতা* পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, "অলঙ্কারের প্রস্থান থেকেই রূপকল্প প্রস্থানের উদ্ভব হয়েছে" (মালবিকা দাশ ১৯৯৯:১৫)। তবে চিত্রকল্পে অলঙ্কারের স্বভাব লক্ষ করা গেলেও আসলে এটি অলঙ্কারের চেয়ে অনেক বড়। আবার অলঙ্কারের বিবর্তনে চিত্রকল্পের উদ্ভব এবং অলঙ্কারের সঙ্গে এর যোগ আন্তরিক হলেও *বৈষ্ণব কবিতায় রূপকল্প* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "অলঙ্কারহীন রূপকল্প সৃষ্টি সম্ভব ও স্বাভাবিক" (মালবিকা দাশ ১৯৯৯:১৫)।

চিত্রকল্পের রূপ বিভিন্ন। কখনো পুরো একটি কবিতায় আবার কখনো কবিতার কয়েকটি চরণে চিত্রকল্প ফুটে ওঠে। এতে কল্পনার সাহায্যে ভাষায় ছবি ফুটে ওঠে বলে এর চিত্রকল্প নাম দেয়া হয়েছে।

চিত্রকল্প সর্বদাই কবিতার এক বিশেষ অংশ। তবে অনিবার্য না হলেও কবিতায় ব্যবহৃত হওয়ার পর তা কবিতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়। অলঙ্কারের সীমানা পার হয়ে সে হয়ে যায় কবিতার দেহ। তাই মূল কবিতা থেকে চিত্রকল্পগুলোকে আলাদা করে সরিয়ে নিলে তাদের পূর্ণ পরিচয় সম্ভব হয় না এ কারণে কবিকে চেনার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে তাঁর রচিত চিত্রকল্পগুলো।

কবির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও মানসিক সক্রিয়তা বাস্তবের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতার ডালিকে সাজিয়ে চিত্রকল্প তৈরি হয়। তাই নির্মাণক্ষমতা এর মৌল বৈশিষ্ট্য। যেহেতু অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সার্থক রূপায়ণ ঘটে চিত্রকল্পে সেহেতু সমগ্র কবিতাটিও চিত্রকল্প হয়ে উঠতে পারে। সাধারণত একাধিক চিত্রকল্পেই কবি তাঁর ভাবনাকে গতি দান করেন। চিত্রকল্প যে শুধু অভিজ্ঞতাকেই রূপ দেয় তা নয়, একই সাথে সে পরিচয়

করিয়ে দেয় কবির মানসিকতার সঙ্গেও যাতে থাকে কবির প্রবণতার পরিচয়। অর্থাৎ কবি চেতনার অভ্যন্তরেই চিত্রকল্পর স্থান। তাই *আধুনিক বাংলা কবিতায় চিত্রকল্প চর্চা (১৯২০-১৯৬০)* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "প্রবল কবি বাসনার বৃত রূপই চিত্রকল্প" (শিখা দত্ত ২০০২:১৮)।

সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে রচয়িতার মনে কল্পনার রঙে বস্তু জগতের বাস্তব একটা রূপ গড়ে ওঠে। এ রূপই চিত্রকল্পের জন্ম দেয়। এটি শুধুই ছবি নয়, তা অনুভূতিময় অর্থও প্রকাশ করে। চিত্রকল্প থেকেই কবিতার ধরন সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এটি কবির অভিজ্ঞতার নিদর্শন। জীবন ও জগৎকে তিনি কতটুকু ভালোবেসেছেন তার প্রকাশ থাকে তাঁর রচিত প্রতিটি চিত্রকল্পে। কারণ বিচিত্র অভিজ্ঞতা কবি মানসে স্তরে স্তরে জমা হয়ে তার জারক রসরূপেই সৃষ্টি হয় চিত্রকল্প।

কবির অজ্ঞাতসারে কখনো সচেতন-অবচেতন-অচেতন মনে চরণে চরণে চিত্রকল্প সৃষ্টি হয়ে যায়। এর সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে চিত্র এবং দৃশ্যময়তা। *আলো-আঁধারের সেতু : রবীন্দ্র চিত্রকল্প* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে সংহত করার জন্যই চিত্রকল্পের জন্ম" (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৪:৯)। চিত্রকল্প রচনায় কবিরা সমকালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। অর্থাৎ কবির যুগের যে বিশিষ্ট চেতনা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি এগুলো রচনায় আনেন। চিত্রকল্পের মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টির (কবি ও কবিতার) একত্র পরিচয় লাভ করা যায়।

কোনো কোনো সমালোচক চিত্রকল্পকে নিছক চিত্র বলে মনে করেন না। তাঁরা মনে করেন শুধু "বাক্‌প্রতিমা" বললে শব্দ দ্বারা নির্মিত চিত্র বা মূর্তি কল্পনায় আসে। বিভিন্ন সূক্ষ্ম ও সংহত কল্পনা বা ভাবনা বলয় যখন চিত্ররূপে দেখা দেয় তখনই চিত্রকল্পের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে চিত্রকল্প বা বাক্‌প্রতিমা যা-ই হোক কবির অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভূতি শব্দের আশ্রয়ে যখন ক্ষুদ্রত্বে বৃহত্ত অথবা বৃহত্ত্বে ক্ষুদ্রত্ব আরোপিত হয় তখনই তা চিত্রকল্প হয়ে ওঠে। যেমন

"উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা"

এখানে বিশাল নিস্তব্ধতাকে উটের ক্ষুদ্র গ্রীবার ন্যায় প্রকাশ করা হয়েছে যার কল্পনায় চমৎকার একটি চিত্রের অবতারণা হয়।

'চিত্রকল্প' এবং 'প্রতীকে' কবি কল্পনার রূপায়ণ ঘটে। জীবন সম্পর্কে মনোভাবের পরিবর্তন হলে এ রূপায়ণও পরিবর্তিত হয়, ফলে চিত্রকল্পও ভিন্নতর রূপ লাভ করে। এর মধ্য দিয়ে কবি একটি উপলব্ধিকেই নির্মাণ করেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর *সংস্কৃত কবিতা ও আধুনিক যুগ* গ্রন্থে বলেছেন, "চিত্রকল্পে থাকে চিত্র রচনা আর প্রতীকে থাকে রহস্য"। এ রহস্য উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমেই চিত্রকল্প ও প্রতীকের যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কৃত হয়। চিত্রকল্পে চিত্র প্রাধান্য লাভ করলেও এর সঙ্গে আরো থাকে ভাব, ভাবনা, আবহ, কল্পনা, অনুভূতি এবং এর অতিরিক্ত একটি ব্যঞ্জনা যা ভাষায় রূপদান সম্ভব নয়, উপলব্ধির ব্যাপার। চিত্রকল্প কবিতার শব্দের ব্যঞ্জনার গভীরে মূল বোধটিকে ইঙ্গিতে ধরিয়ে দেয়। কখনো বলার মধ্য থেকে না বলার, কখনো না বলার মধ্য থেকে বলার, আবার কখনো শব্দ থেকে নৈঃশব্দে এ বোধের প্রকাশ ঘটে।

চিত্রকল্পের যেমন নির্দিষ্ট কোনো বিষয় নেই তেমনি এর শ্রেণিবিভাগেরও কোনো সীমারেখা নেই। বিভিন্ন সমালোচক চিত্রকল্পের বিভিন্ন রকম শ্রেণিবিভাগ করেছেন। *নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* গ্রন্থে চার

প্রকার চিত্রকল্পের কথা বলা হয়েছে: ১. সাধারণ চিত্রকল্প ২. রূপকাত্মক চিত্রকল্প ৩. সাঙ্কেতিক বা প্রতীকধর্মী চিত্রকল্প এবং ৪. মালা বা শৃঙ্খল চিত্রকল্প (বিশ্বজিত ঘোষ ১৯৯৩:৩৫-৩৬)। এজরা পাউন্ড 'As For Imagism' নামে প্রবন্ধে ইমেজকে বলেছেন দু'শ্রেণির- সাবজেকটিভ বা মন্ময় রূপকল্প ও অবজেক্টিভ বা তন্ময় রূপকল্প। মনের অবচেতনায় ও অন্তঃগূঢ়স্তরের বিভিন্ন প্রক্ষোভ থেকে সাবজেকটিভ বা মন্ময় রূপকল্পের সৃষ্টি বলে তিনি বিশ্বাস করেন। তেমনি অবজেক্টিভ বা তন্ময় রূপকল্পের সৃষ্টি বহির্জগতের বিবিধ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকে উপজাত বলেই তাঁর বিশ্বাস" (মালবিকা দাশ ১৯৯৯:১৯)। *রবীন্দ্র কবিতা ও চিত্রকল্প* এ চিত্রকল্পকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা, ১. মূল বা বিষয় চিত্রকল্প এবং ২. সহযোগী চিত্রকল্প (তুষার কান্তি মহাপাত্র, ১৯৮৭:৮)। *বৈষ্ণব কবিতায় রূপকল্প* গ্রন্থে গঠনগত দিক থেকে চিত্রকল্পকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা, ১. প্রত্ন বা আদিম রূপকল্প ২. পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ানুভূতির রূপকল্প এবং ৩. ইন্দ্রিয় সমন্বয় বা বিপর্যয়জাত রূপকল্প (মালবিকা দাশ, ১৯৯৯:২১)। যে চিত্রকল্পে 'একটা জাতির দীর্ঘদিনের চিন্তাভাবনা কেন্দ্রীভূত থাকে' তাকেই এখানে প্রত্ন চিত্রকল্প বলা হয়েছে (মালবিকা দাশ, ১৯৯৯:১৬)। ঐতিহ্যসূত্রেই কবি এ ধরনের চিত্রকল্প লাভ করেন। যেহেতু এগুলো প্রথানুগত সেহেতু এগুলো বৈচিত্র্যহীন ও গতানুগতিক। ফলে এ ধরনের চিত্রকল্প কিছু বলেনা বা কোনো ভাবাবেগও সৃষ্টি করে না। পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ানুভূতির চিত্রকল্পে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমান লীলা প্রত্যক্ষ করা যায়। অর্থাৎ চিত্র, ধ্বনি, গন্ধ, স্পর্শ ও স্বাদ-এ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মিশ্র ও অমিশ্র উপাদানে এ শ্রেণির চিত্রকল্প গড়ে ওঠে। আসলে চিত্রকল্প সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চাহিদাই পুরণ করে। কখনো বিচ্ছিন্নভাবে একক ইন্দ্রিয়ের আবার কখনোবা একাধিক ইন্দ্রিয়ের যোগে বা বিয়োগে এ চাহিদা পূরণ ঘটে। ইন্দ্রিয় সমন্বয় বা বিপর্যয়জাত চিত্রকল্পে একাধিক ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ জাতীয় চিত্রকল্পে কখনো বিবিধ ইন্দ্রিয়ের সমন্বয়ে, কখনো বিপর্যয়ে, কখনো একক ইন্দ্রিয়ের মহিমায় আবার কখনো এক ইন্দ্রিয় থেকে আরেক ইন্দ্রিয়ে গড়িয়ে পড়ে ভাবাবেগ। ফলে কবি অনুভূতি সমগ্রতার আস্বাদ লাভ করে। *রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা: চেতনা ও চিত্রকল্প* গ্রন্থে চিত্রকল্পের শ্রেণিভেদ করতে দুটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে: ১. গঠন বিচার এবং ২. গুণ বিচার (সিদ্দিকা মাহমুদা ১৯৮১:৩৪-৩৫)। গঠন বিচারে সেখানে চিত্রকল্পকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ক. একক চিত্রকল্প খ. মিশ্র চিত্রকল্প এবং গ. জটিল চিত্রকল্প। আবার গুণ বিচারেও চিত্রকল্পকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ক. মূর্ত খ. মূর্ত-বিমূর্ত এবং গ. বিমূর্ত চিত্রকল্প। মূর্ত চিত্রকল্প একান্তই পঞ্চেন্দ্রিয়নির্ভর। কবিতায় এমন চিত্রকল্পই সর্বাধিক পাওয়া যায়। মূর্ত-বিমূর্ত চিত্রকল্প ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েও তা যেন পুরোপুরি অনুভব করা যায় না। কল্পনায় নির্মাণ করে নিতে হয়। বিমূর্ত চিত্রকল্প পুরোটাই কল্পনা নির্ভর। অর্থাৎ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধির ব্যাপার।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা অভিসন্দর্ভে চিত্রকল্পগুলিকে নিম্নোক্ত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছি:

১. রূপ বর্ণনাত্মক চিত্রকল্প,
২. মানসিক অবস্থা বর্ণনাত্মক চিত্রকল্প, এবং
৩. বিবিধ চিত্রকল্প।

গ. প্রতীক ও চিত্রকল্পের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ চিত্রকল্প সৃষ্টিতে প্রতীকের আশ্রয় নিতে হয়। তাছাড়া একই জিনিস কখনো চিত্রকল্প আবার কখনো প্রতীক হতে পারে। একজন কবি চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রতীককে প্রকাশ করতে পারেন আবার প্রতীকের মাধ্যমে চিত্রকল্পকেও ধারণ করতে পারেন। চিত্রকল্প তার জাদুশক্তির ব্যঞ্জনা পেয়েই প্রতীকে পরিণত হয়। *সাহিত্য চিন্তা* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "বহুস্তরী

ভাবাদর্শের ইঙ্গিত সম্পন্ন বাক্প্রতিমায় প্রতীকের প্রকাশ" (অমলেন্দু বসু ১৩৭৯:৮৬)। প্রতীকের কাজ চিত্রকল্পের প্রকাশটিকে স্পষ্ট করা। চিত্রকল্পের প্রকাশকে স্পষ্ট, রমণীয় ও ব্যঞ্জনাময় করে তোলায় প্রতীক দ্বিবিধ ভূমিকা পালন করে। প্রথমত, চেনা মানুষের সাহায্যে অচেনাকে চেনার মতো প্রতীকের সাহায্য নিয়ে চিত্রকল্পের আকর্ষণকে সহজে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা যায়। ফলে সহজ চিত্রকল্পের মাধ্যমে কবিতার দুর্বোধ্যতা দূর হয়ে পুরো কবিতাটি পাঠকের সামনে সহজ হয়ে ধরা দেয়। তাই প্রতীকের মাধ্যমে সহজ চিত্রকল্পসৃষ্টি কবির লক্ষ্য হতে পারে। দ্বিতীয়ত, কবির লক্ষ্য যদি সীমিত শব্দের প্রতি হয় সেখানে অপরিহার্য না হলেও প্রতীক একটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ। এ কারণে প্রতীক ও চিত্রকল্পের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় অতি সূক্ষ্মতায় এসে দাঁড়ায়। তাই *রবীন্দ্র কাব্যে রূপকল্প* গ্রন্থে প্রতীককে বলা হয়েছে "রূপকল্পেরই বিচ্ছুরিত আলোকমালার সংহত মূর্তি" (কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় ১৩৮২:১৮৪)। চিত্রকল্পের প্রভাব তাৎক্ষণিক, কিন্তু প্রতীকের প্রভাব পাঠকের নিকট প্রায়ই স্থায়ী।

প্রতীক সবসময়েই এক অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু চিত্রকল্প বহু অর্থজ্ঞাপক পাঠকের রুচি, ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা, আবেগ ও অনুভূতি বিশেষে চিত্রকল্পের অর্থ ও ব্যঞ্জনার অনুভবে ভিন্নতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু প্রতীকের অর্থ পাঠকভেদে এক ও অভিন্ন। তাই প্রতীক নতুন অভিজ্ঞতার প্রতিনিধি আর চিত্রকল্প নতুন ব্যঞ্জনা। বিষয় ছাড়া চিত্রকল্পের প্রকাশরীতিতে প্রতিটি চিত্রকল্পই নতুন ও বৈচিত্র্যময়। কিন্ত এতে শুধু বিষয়েরই পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে, অর্থ-একত্বের সম্ভাবনা এতে নেই। চিত্রকল্পের লক্ষ্য'ই হচ্ছে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে *আধুনিক বাংলা কবিতায় চিত্রকল্প চর্চা* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "প্রতীক নির্বিশেষকে বিশেষিত করে। আর চিত্রকল্পে নির্বিশেষ আভাসিত হয়"। (শিখা দত্ত ২০০২:১৯)। এ সব কারণে প্রতীকের তুলনায় চিত্রকল্পের সীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রথম অধ্যায়

বাংলা গীতিকার সাধারণ ও তুলনামূলক পরিচয়

বাংলা লোকসাহিত্যে গীতিকা (Ballad)-র একটি উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে।

বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চার ইতিহাস গ্রন্থে বলা হয়েছে, "গীতোপযোগী প্রেম বিরহ-মিলন কেন্দ্রিক কাহিনী লেখকের আত্মোপলব্ধির জারক রসে জারিত হয়ে একই রূপ-ছন্দে বিরতিহীনভাবে দীর্ঘ পরিসরে বর্ণিত হয়ে গীতিকা আখ্যালাভ করেছে" (বরুণ কুমার চক্রবর্তী, ১৩৮৪:৩৬১-৩৬২)। *Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend*- এ Ballad সম্পর্কে বলা হয়েছে, "A ballad is story of the four elements common to all narrative-action, character, setting, and theme- the ballad emphasizes the first" (Maria Leach, 1949:106)। *A Glossary of Literary Terms* গ্রন্থে Ballad এর সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "It is a song, transmitted orally, which tells a story" (Abrams, 1999:13)। *গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য* গ্রন্থে গীতিকার যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা হলো, "জটিলতামুক্ত মূলত একটি ঘটনাকেন্দ্রিক আখ্যান, সচরাচর যা জনপ্রিয়, নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে কোনো প্রকার নীতি-উপদেশে ভারাক্রান্ত না হয়ে, সারল্যকে রক্ষা করে, অপরিণত চরিত্রকে উপলক্ষ্য করে, ঘটনা ও সংলাপকে আশ্রয় করে গোষ্ঠী বিশেষের মানসিকতা সঞ্জাত হয়ে অজ্ঞাত পরিচয় রচয়িতার আত্মনির্লিপ্তির পরিচয়বাহী, মৌখিক ঐতিহ্যে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাকৃতির স্তবকে রচিত যে সঙ্গীত, তাই হল গীতিকা" (বরুণ কুমার চক্রবর্তী, ১৯৯৩:১০)। "গীতিকার প্রতিশব্দ হিসেবে 'গাথা', 'পালা' ও 'গীতিকথা' শব্দেরও প্রচলন আছে" (ওয়াকিল আহমদ, ২০০০:৩৫৫)।

এখন পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশ থেকে গীতিকা সংগৃহীত হয়নি। সংগৃহীত ও প্রকাশিত গীতিকাগুলোকে মোটামুটি ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায় :

১. নাথ-গীতিকা
২. মৈমনসিংহ গীতিকা
৩. পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা
৪. চট্টগ্রাম গীতিকা
৫. সিলেট গীতিকা এবং
৬. রংপুর গীতিকা।
এদের মধ্যে মৈমনসিংহ এবং পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকাই তুলনামূলক বিচারে জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ।

দীনেশ চন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) সম্পাদিত *মৈমনসিংহ গীতিকা* দশটি পালা নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে। সম্পাদক নিজেই এর নাম দেন *মৈমনসিংহ-গীতিকা*। দীনেশ চন্দ্র সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে *পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকার* যে চারটি খণ্ড সম্পাদনা করেন, *মৈমনসিংহ-গীতিকা* তারই প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা।[১]

---

[১] তাঁর সম্পাদিত *মৈমনসিংহ-গীতিকা* ও *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার* এ চারটি খণ্ড যথাক্রমে *মৈমনসিংহ গীতিকা* (*পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা* প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা-১৯২৩), *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা* দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা-১৯২৬, *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা* তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা-১৯৩০ এবং *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা* চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা-১৯৩২ নামে প্রকাশিত হয়।

দীনেশ চন্দ্র সেন ১৯২৩ থেকে ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট দশ বছরের মধ্যে মৈমনসিংহ গীতিকা সহ পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার চারটি খণ্ড সম্পাদনা করে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অর্থানুকূল্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন। এর বিভিন্ন খণ্ডে যে সব গাথা আছে তার সংখ্যা, নাম ও খণ্ডের প্রথম প্রকাশকালসহ একটি তালিকা নিচে উপস্থাপন করা হল:

মৈমনসিংহ-গীতিকা
(পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা)
প্রথম প্রকাশ-১৯২৩
এ খণ্ডে মোট দশটি পালা এবং এগারটি চিত্র আছে:

১। মহুয়া
২। মলুয়া
৩। চন্দ্রাবতী
৪। কমলা
৫। দেওয়ান ভাবনা
৬। দস্যু কেনারামের পালা
৭। রূপবর্তী
৮। কঙ্ক ও লীলা
৯। কাজলরেখা
১০। দেওয়ানা মদিনা।

পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা
দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা
প্রথম প্রকাশ-১৯২৬
এ খণ্ডে মোট চৌদ্দটি পালা এবং একুশটি চিত্র আছে:

১। ধোপার পাট
২। মইষাল বন্ধু
৩। কাঞ্চনমালা
৪। শান্তি
৫। নীলা
৬। ভেলুয়া
৭। কমলা রাণীর গান
৮। মানিকতারা বা ডাকাইতের পালা
৯। মদনকুমার ও মধুমালা
১০। সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া
১১। নেজাম ডাকাইতের পালা

৮। বগুলার বারমাসী

৯। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ

১০। সন্নমালা

১১। বীরনারায়ণের পালা

১২। মহীপালের গান

১৩। রতন ঠাকুরের পালা

১৪। পীরবাতাসী

১৫। রাজা তিলক বসন্ত

১৬। মলয়ার বারমাসী

১৭। জীরালনী

১৮। পরীবানুর হাঁহলা

১৯। সোনারায়ের জন্ম

২০। সোনাবিবির পালা।

এ চারটি খণ্ডে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, ঢাকা, নোয়াখালী, কুমিল্লা (ত্রিপুরা) এবং চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত ৫৫টি গীতিকা প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে দশটি গীতিকা নিয়ে প্রকাশিত *মৈমনসিংহ-গীতিকা*। এ গ্রন্থের বেশির ভাগ গাথাই কাব্যরস ও শিল্পগুণের দিক থেকে অন্য গাথাগুলোর চেয়ে উৎকৃষ্ট বলে *মৈমনসিংহ-গীতিকা* বাংলা লোকসাহিত্যের এক অমর গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত।

মৈমনসিংহ-গীতিকা সংগ্রহ ও প্রকাশে যারা দীনেশ চন্দ্র সেনের সহযোগী ছিলেন তাদের অন্যতম ময়মনসিংহের *সৌরভ* পত্রিকার সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার এবং কবি চন্দ্র কুমার দে।

কেদারনাথ মজুমদার (১৮৭০-১৯২৬) ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে (বাংলা ১৩১৯ সন কার্তিক মাস) ময়মনসিংহের রিসার্চ হাউজ থেকে পুস্তকাকারে *সৌরভ* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা শুরু করেন। *চন্দ্রকুমার দে জীবনী গ্রন্থ*-এ উল্লেখ করা হয়েছে *সৌরভের* ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল (বাংলা ১৩২০ সালের ফাল্গুন) সংখ্যায় ময়মনসিংহের অল্পশিক্ষিত এক কবি চন্দ্রকুমার দে (১৮৮৯-১৯৪৬) র লেখা 'মহিলা কবি চন্দ্রাবতী' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (যতীন সরকার, ১৯৯০:১৭)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র সেন এ প্রবন্ধ পাঠ করলে চন্দ্রকুমারের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি সম্পাদক কেদারনাথের মাধ্যমে চন্দ্রকুমারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং তাকে মাসিক ৭০ টাকা বেতনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পালাগান সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করেন। তার ফলেই মৈমনসিংহ ও পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার পালাগুলো ক্রমান্বয়ে সংগৃহীত হতে থাকে। চন্দ্রকুমার দে পূর্ব-ময়মনসিংহ ও সিলেটের বহু স্থান ঘুরে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাস থেকে ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের শেষদিক পর্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন ও খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভিন্ন পালা সংগ্রহ করে সম্পাদক দীনেশ চন্দ্রের হাতে দেন (যতীন সরকার ১৯৯০:৪২-৪৫)। পরে এ খণ্ডাংশসমূহ পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে এক একটা পালার পুরো কাঠামো গড়ে তোলেন দীনেশ চন্দ্র সেন। *মৈমনসিংহ-গীতিকায়* প্রকাশিত ১০টি পালাই সংগ্রহ করেছেন কবি চন্দ্র কুমার

দে। এ ছাড়াও *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায়* প্রকাশিত ৪৫টি পালার মধ্যে ২৩টি পালাসহ সর্বমোট ৩৩টি পালা তিনি সংগ্রহ করেন।

পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার সংগ্রাহকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চট্টগ্রামের আশুতোষ চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪৪)। তিনি কিছুটা শিক্ষিত ছিলেন। *ছেলেদের চট্টল ভূমি* নামে তিনি একটি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ লেখেন। এ বইটির সূত্রেই দীনেশ চন্দ্রের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটে। *আশুতোষ চৌধুরী* জীবনীগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে দীনেশ চন্দ্র সেন *মৈমনসিংহ গীতিকা* প্রকাশিত হওয়ার পরে চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে লোকগীতিকা সংগ্রহের জন্য আশুতোষ চৌধুরীকে প্রস্তাব দিলে তিনি রাজী হন এবং দীনেশ চন্দ্রের অনুরোধে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৫ বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রাহক ছিলেন (মাহবুবুল হক ১৯৯৪:২৫)। আশুতোষ চৌধুরী দীনেশ চন্দ্রের *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায়* প্রকাশিত ৪৫টি পালার মধ্যে ৯টি পালা সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সংগৃহীত সবগুলো গীতিকাই চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে সংগ্রহ করা।

নগেন্দ্র চন্দ্র দে সংগ্রহ করেন ৩টি, বিহারীলাল রায় ২টি এবং মনোরঞ্জন চৌধুরী, বিজয় নারায়ণ আচার্য, মনসুরউদ্দীন, কবি জসীম উদ্দীন, শিবরতন মিত্র প্রত্যেকে ১টি করে পালা সংগ্রহ করেন। এরা সবাই দীনেশ চন্দ্রের উৎসাহে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাতাপ্রাপ্ত সংগ্রাহক ছিলেন।

দীনেশ চন্দ্র সেন মনে করতেন শিক্ষিত ও শহুরে যুবকেরা পল্লীর আনাচে কানাচে ঘুরে এসব গীতিকা সংগ্রহ করতে পারবে না, পারলেও অশিক্ষিত গায়েনদের নিকট থেকে আঞ্চলিক ভাষায় হুবহু কপি করতে পারবে না। এসব দিক বিবেচনা করে তিনি গীতিকা সংগ্রাহক হিসাবে অল্পশিক্ষিতদেরকেই বেছে নেন।

বাংলার লোক সাহিত্য (১ম খণ্ড)এ বলা হয়েছে *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার* ৩টি খণ্ডে প্রকাশিত ৪৫টি পালার মধ্যে ৩০টি পালাই পূর্ব মৈমনসিংহ হতে সংগৃহীত (আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৫৪:৪৩৫)। আর *মৈমনসিংহ-গীতিকার* ১০টি পালার মধ্যে ৯টি পূর্ব মৈমনসিংহের। সুতরাং সর্বমোট ৫৫টি পালার ৩৯টি পালাই মৈমনসিংহ অঞ্চলের। এ কারণে সম্পাদক দীনেশ চন্দ্র সেন নিজেই এর নাম দিয়েছেন *মৈমনসিংহ-গীতিকা*। কিন্তু *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড গ্রন্থে বলা হয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহ জেলাকে পূর্ব ও পশ্চিম - এ দুই ভাগে ভাগ করে রেখেছে। এ কারণে "ময়মনসিংহ গীতিকার উৎপত্তি হয়েছে পূর্বভাগে, পশ্চিমভাগে নহে" (কাজী দীন মুহাম্মদ, ১৯৬৮:২৯৫)।

মৈমনসিংহ গীতিকা ও *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা য়* প্রকাশিত পালাগুলোর নাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্পাদক প্রদত্ত। তবে কোনো কোনো পালার নাম সংগৃহীত অঞ্চলে প্রচলিত নাম। সম্পাদক দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* ও *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায়* প্রকাশিত ৫৫টি পালকে গীতিকায় স্থান দিলেও তিনটিকে তিনি রূপকথা বলেছেন: কাজলরেখা, কাঞ্চনমালা, মদনকুমার ও মধুমালা।[১]

---

[১] *মৈমনসিংহ গীতিকার* ভূমিকাংশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৩, *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা* ২য় খন্ড, ২য় সংখ্যার ভূমিকা, ১ম প্রকাশ ১৯২৬ এবং *বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের* পরিশিষ্ট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৪৩।

গীতিকায় প্রকাশিত পালাগুলো মুখে মুখে রচিত। তাই গায়কেরা যখন গান বা আবৃত্তি করেন তখন মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে হয়। কিন্তু পাঠের সময় তা সম্ভব হতো না বলে একঘেয়ে মনে হতো। এ একঘেয়েমী দূর করার জন্য সম্পাদক দীনেশ চন্দ্র সেন নিজেই প্রতিটি পালাকে প্রয়োজনমতো বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ে বা সর্গে বিভক্ত করে পাঠোপযোগী করেছেন। সংগ্রহের সময় এমন বিভাজন ছিল না। এমনকি সংগ্রাহকগণ যখন পালাগুলো সম্পাদকের কাছে পাঠিয়েছিলেন তখন সেগুলো বিশৃঙ্খল ছিল, তিনি সেগুলোকেও যথাসাধ্য শৃঙ্খলার মধ্যে এনে প্রকাশ করেছেন।

লোকমুখে গীতাকারে প্রচারিত হতে হতে গাথাগুলোর রচয়িতাগণের নাম কালক্রমে লুপ্ত হয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। গায়েনরা মূল রচয়িতার আপন নামের ভণিতা সংযুক্ত করে গাথাগুলো গাইতেন এবং লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রচয়িতার নামের পরিবর্তে ভণিতায় গায়েনের নাম উল্লিখিত হতো। এ কারণে খুব কম ক্ষেত্রেই প্রকৃত রচয়িতার নাম জানা যায়। মৈমনসিংহ ও পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায় দীনেশ চন্দ্র প্রদত্ত বিভিন্ন পালার ভূমিকা থেকে যেসব পালাকার, কবি, গায়েন, বয়াতি, পালারচক বা প্রণয়ণকারীর নাম পাওয়া যায় তারা হলেনঃ দ্বিজ কানাই, নয়ানচাঁদ ঘোষ, দ্বিজ ঈশান, চন্দ্রাবতী, অন্ধ ফৈজু, রঘুসুত, দামোদর দাস, শ্রীনাথ বেনিয়া, সুলা গাইন, মনসুর বয়াতি, রজনীকান্ত ভদ্র, দীন গোপ, চন্দ্রকুমার সরকার, কুল্লার আব্বাস, নিধু ব্যাপারী, গয়া সেক, গাছুনী সেখ, হরচন্দ্র বর্ম্মা, রামকুমার মিস্ত্রী, এছেম খাঁ, অধর চাঁদ, জামাইৎ উল্লা, সদর আলী গায়েন, মতিয়ার রহমান, সাহরালী গায়েন, সদীর গায়েন, রহমান গায়েন, কঙ্ক, পাষাণী বেওয়া, সেখ কাঞ্চা, নিদান ফকির, সাধু ধুপী, জামাল দিসেক, মধুর রাজ, দুখিয়ামাল, সেকেন্দার গাইন, অলিয়র রহমান, ওজু পাগলা, নবচন্দ্র ধুপি, কৈলাশ চন্দ্র দে, শচিনী সোম, অদেলা দাস, কমলদাস গায়েন, আঁধা মকবুল, বেলায়েৎ আলী গায়েন, সজু বয়াতি, নূর হোসেন ভাইয়া, গুরু মিয়া, রহমান, কালু সেখ, নন্দলাল দাস, হয়বৎ আলী, হাকীম খা, গুণা মিয়া, পৈথানচন্দ্র দে, নাজির ফকির, বুন্ধু হাজাং, মঙ্গলনাথ, নকুল বৈরাগী, কৃষ্ণরাম মাল, কালাচাঁদ মাল, সেখ পানা উল্লা, গাছিম সেখ, রামচরণ বৈরাগী, বৃন্দাবন বৈরাগী, শ্রীদাম পাটুনী, জগবন্ধু গায়েন, লোচনদাস, রজনী কর্ম্মকার, ভাদাই ফকির, ইনাতুল্লা ফকির, নিমাই মুদী, গোলাম হুসেন, রহমন সেখ, যদুনাথ বাউল, রজনী মাল। এদের মধ্যে কেউ কেউ এককভাবে আবার কেউ কেউ সম্মিলিতভাবে পালাগান রচনা করেছেন। এ পর্যন্ত যাদের নাম সংগৃহীত হয়েছে তাদের মধ্যে মাত্র দুই জন মহিলা কবি - দুইজনই মৈমনসিংহ অঞ্চলেরঃ একজন কবি বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী এবং অন্যজন সুলা কবি বা সুলা গাইন।

মৈমনসিংহ গীতিকার ভূমিকায় সম্পাদক মৈমনসিংহ ও পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার অধিকাংশকে চাষাদের রচনা বলে মনে করেছেন। তিনি এসব পালা রচয়িতাদের 'কৃষক কবি' বলেছেন (দীনেশ চন্দ্র সেন, ১৯৯৩:ভূমিকা ৮)। তবে গীতিকাগুলো পাঠে মাঝে মাঝে ভাষা ব্যবহার, অলঙ্কার প্রয়োগ, প্রবাদের উল্লেখ ইত্যাদি লক্ষ করলে এতে যে শিল্পগুণের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে অনভিজ্ঞ রচয়িতারা রচনা করেছেন বলে মনে হয় না। এ প্রসঙ্গে *গীতিকা:স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য গ্রন্থের মন্তব্য*, "গীতিকার রচয়িতারা নিরক্ষর হলেও, অশিক্ষিত ছিলেন না, ছিলেন না শিল্পসম্মত প্রকাশভঙ্গীর ব্যাপারে অসচেতন"(বরুণ কুমার চক্রবর্তী, ১৯৯৩:৩১)।

পালাগুলোর রচয়িতা হিন্দু মুসলমান দুইই। হিন্দু কবিরা হিন্দু সমাজের কাহিনী এবং মুসলমান কবিরা মুসলিম সমাজের কাহিনী নিয়ে এগুলো রচনা করেছেন। আবার এক সম্প্রদায়ের কবি অন্য সম্প্রদায়ের ঘটনা নিয়েও পালা রচনা করেছেন। এখানেই গীতিকাগুলোতে অসাম্প্রদায়িকতার পরিচয় প্রকাশ পায়। তবে সংগ্রাহকগণ পালাগুলোর বেশির ভাগই মুসলমানদের নিকট থেকে সংগ্রহ করেছেন। তাই *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান* গ্রন্থে বলা হয়েছে "তাহারাই এই সাহিত্যের চৌদ্দ আনি রক্ষক" (দীনেশ চন্দ্র সেন, ১৯৯৫:৯৪)। এ ছাড়া *বাংলা সাহিত্যের কথায়* মৈমনসিংহ ও পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার মোট ২৩টি পালাকে মুসলমান কবির রচিত বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে (ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ)। তবে হিন্দুদের নিকট থেকেও বেশ কিছু পালা সংগৃহীত হয়েছে।

পল্লী অঞ্চলে কোনো সাড়া জাগানো ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে সেটা অবলম্বনে গান বা রসাল পালা রচনা করা স্থানীয় পল্লী কবিদের কাছে সাধারণ ব্যাপার। গায়েন বা বয়াতিদের মুখে মুখে সেটা স্থান থেকে স্থানান্তরে গমন করে এবং নির্দিষ্ট কাঠামো লাভ করে। মৈমনসিংহ ও পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার সকল পালাই এভাবে রচিত।

যেহেতু লোকসাহিত্যের সৃষ্টি মুখে মুখে সেহেতু এগুলো লোকমুখেই রচিত ও প্রচলিত হয়েছে। তাই এদের রচক ও সুনির্দিষ্ট রচনাকাল নির্ণয় করা যায় না। তবে পালাগুলোর ভাষা, বিষয় ও ইতিহাস গবেষণা করে গবেষকগণ বিভিন্ন সময়ে এগুলো রচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। গীতিকার সম্পাদক তাঁর *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* গ্রন্থে কোনো কোনো পালাকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর রচনা বলে মনে করেছেন (দীনেশ চন্দ্র সেন, ১৯৪৩: ৫৯০)। আবার তিনি *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান* গ্রন্থে কোনো কোনো পালাকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে লেখা বলে অনুমান করেছেন (দীনেশ চন্দ্র সেন, ১৯৯৫:১১৫)। *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা* ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা গ্রন্থে বিভিন্ন পালার ভূমিকায় পালাগুলোকে ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে রচনা বলে মনে করা হয়েছে (দীনেশ চন্দ্র সেন, ১৯২৬)। *ময়মনসিংহ-গীতিকা* গ্রন্থের ভূমিকায় এর পালাগুলোর অধিকাংশই ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনা বলে মনে করা হয়েছে। যেগুলো প্রাচীনতর সেগুলোকে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের রচনা বলে মনে করা হয়েছে (সুখময় মুখোপাধ্যায়, ১৯৯৬:ভূমিকা)। *বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের কথা* গ্রন্থে গীতিকার কবিদের আবির্ভাবকাল এবং রচনা মোটামুটি খ্রিষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বলে অনুমান করা হয়েছে (কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৫৪:১৩৬)। মৈমনসিংহ গীতিকার রচনাকাল প্রসঙ্গে *ময়মনসিংহ-গীতিকার* ভূমিকায় বলা হয়েছে, "গীতিকাগুলো নবাবী আমলে রচিত হয়েছিল" (আলী নওয়াজ, ১৯৬৯:ভূমিকা ৩৬)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ১ম পর্যায়* গ্রন্থে মৈমনসিংহ ও পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকাগুলোর প্রায় কোনোটিই সপ্তদশ শতকের পূর্ব্ববর্তীকালের রচনা নয় বলে মনে করা হয়েছে (শ্রী ভূদেব চৌধুরী, ১৯৫৭:৪৬৭)। অর্থাৎ এগুলো সপ্তদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালের রচনা। প্রকৃতপক্ষে গীতিকার পালাগুলো স্বল্প সময়ের ব্যবধানে রচিত হয়নি বরং দীর্ঘকাল ধরেই রচিত। সমালোচকেরা ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এগুলোর রচনাকাল নির্দেশ করলেও সমগ্র মধ্যযুগের বিভিন্ন সময়ে এগুলো রচিত হয়েছে। এ কারণে *সাহিত্য পত্রিকায়* '*মৈমনসিংহ গীতিকার* জনজীবন' প্রবন্ধে ষোড়শ শতকের পূর্বেও মৈমনসিংহ গীতিকার কোনো কোনো পালার কাহিনী জনমনে তৈরি হয়ে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল বলে

অনুমান করেছেন। *বাংলা গাথাকাব্য গ্রন্থে* পালাগুলোর ঘটনা ঘটার সমসাময়িক অথবা সামান্য কিছু পরবর্তীকালই রচনাকাল বলে বলা হয়েছে (বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য, ১৯৬২:ভূমিকা ১১)। *গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য গ্রন্থে* মৈমনসিংহ ও পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার পালাগুলো মুঘল যুগের কোনো এক সময়ে রচিত বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে (বরুণ কুমার চক্রবর্তী ১৯৯৩:৭১)। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় *বাংলা বিভাগীয় পত্রিকায়* লেখা প্রবন্ধ 'বাংলা গীতিকা-সাহিত্যে লোকজীবন ধারা' থেকে একটি উদ্ধৃতিও দেওয়া হয়েছে- "এইসব কাহিনীর জন্মকাল, পালাকারের কাল এবং সংগ্রহের কাল সবই পৃথক" (বরুণ কুমার চক্রবর্তী, ১৯৯৩:৭১)। এ মতটি অনেকটা যুক্তিসঙ্গত। কারণ, পালাগুলোর প্রায়ই বাস্তবে ঘটে যাওয়া কাহিনী অবলম্বনে রচিত। আর বাস্তব ঘটনা ঘটে একসময়, কাহিনী রচিত হয় পরে এবং কাহিনীগুলো পালা আকারে পরিবেশিত হয় আরো পরে। অবশেষে সংগ্রহ হয় পরবর্তী বছরে, দশকে বা শতকে।

মৈমনসিংহ ও পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার পালাগুলো প্রধানত প্রণয় কাহিনীমূলক। হৃদয়রূপের পরিচয় এসব পালার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়াও ঐতিহাসিক ঘটনমূলক, দস্যুতাবিষয়ক, রাখালী, রূপকথাভিত্তিক, বারমাসী গাথাও আছে।

মৈমনসিংহ গীতিকার ভূমিকায় বলা হয়েছে "পাঠক মৈমনসিংহ-গীতিকায় এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিবেন" (দীনেশ চন্দ্র সেন, ১৯৯৩:ভূমিকা ১২)। সম্ভবত এ রাজ্যই হচ্ছে গীতিকায় বর্ণিত মানবীয় রাজ্য। কারণ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছিল একান্তভাবেই ধর্মকেন্দ্রিক, কিন্তু মৈমনসিংহ ও পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার কাহিনীগুলো মধ্যযুগের সৃষ্টি হলেও তা ধর্মের উর্ধে উঠে রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষেরই রাজকীয় আধিপত্য বিস্তার করেছে। এসব গীতিকায় হিন্দু বা মুসলমান নয়, পুরোপুরি মানুষের কাহিনীই সহজ-সরল-গ্রাম্যভাষায় বর্ণিত হয়েছে। ধর্ম ও সমাজ নিরপেক্ষ শাশ্বত মানবিক বৃত্তি দ্বারাই এর চরিত্রগুলোর আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে *বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের কথা* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে উপজীব্য না করিয়া বাঙ্গলায় ইহাই প্রথম গীতি-কবিতা" (কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৫৪:১৩৯)।

দীনেশ চন্দ্র সেনের *মৈমনসিংহ ও পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা* প্রকাশের পর ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক নিজেই মৈমনসিংহ, ঢাকা, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলা ঘুরে বয়াতী ও গায়েনদের নিকট থেকে দীনেশ চন্দ্র সেনের সংকলিত ৫৫টি পালার মধ্যে ৪৫টি এবং নতুন ৩টি পালাসহ মোট ৪৮টি পালা সংগ্রহ করেন। তিনি এগুলোকে *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* নাম দিয়ে ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা থেকে ৭টি খণ্ডে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ করেন। তিনি শুধু গাথাগুলো সংগ্রহই করেননি; সে সঙ্গে এসব গাথার সুর, তাল, ছন্দ সম্পর্কেও বহু প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ভূমিকায় সন্নিবিষ্ট করেছেন। পালাগুলোর কাহিনী বর্ণনায় যেখানে অস্পষ্টতা আছে, সেখানে তিনি সহজবোধ্য কথ্যভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। এ ছাড়া দীনেশচন্দ্রের সম্পাদিত পালাগুলো ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সুন্দরভাবে সাজিয়ে অধ্যায় বিন্যাসও করেছেন।

পালার রচয়িতাগণ তাদের রচনায় যে সব আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন সেগুলো পরিবর্তিত হয়ে পরবর্তীকালের শব্দ ও ভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণভঙ্গী প্রবেশ করেছে। যে অঞ্চলে কবির বাস ছিল, অথবা যে অঞ্চলের ঘটনা অবলম্বনে পালা রচিত হয়েছে সে অঞ্চলের গায়েনের লিখিত খাতার ভাষা ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক গ্রহণ করেছেন। এ কারণে দীনেশ চন্দ্রের পালার ভাষা, শব্দ, উচ্চারণভঙ্গী ও বানানের সাথে ক্ষিতীশচন্দ্রের পালার কিছু পার্থক্য এবং পাঠান্তর পাওয়া যায়। মোটকথা প্রতিটি পালার পাঠান্তর, দুর্বোধ্য শব্দগুলোর অর্থ- তাৎপর্য ও সর্বোপরি প্রতিটি পালার পরিচয় ভূমিকা দিয়ে তিনি তাঁর সম্পাদিত পালাগুলোকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। এসব কারণে ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিকের সংগৃহীত গাথাগুলো দীনেশ চন্দ্রের গাথার তুলনায় প্রায়শই দীর্ঘ, সুসম্পূর্ণ এবং বেশি নির্ভরযোগ্য। দীনেশ চন্দ্র সেন সংকলিত যে ১০টি গাথা ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সংকলন করেননি সেগুলো হচ্ছে কাজলরেখা, কাঞ্চনমালা, নীলা, মদনকুমার ও মধুমালা, সাওতাঁল হাঙ্গামার ছড়া, মুকুট রায়, মহীপালের গান, রাজা তিলকবসন্ত, সোনারায়ের জন্ম এবং সোনাবিবির পালা। অপরপক্ষে ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সংকলিত যে ৩টি গাথা দীনেশ চন্দ্র সেনের সংকলনে নেই সেগুলো হচ্ছে ভরার মেয়ের গান, বাইন্যা বউ-লক্ষীর ঝাঁপি পালা এবং একালের গান-বাল্য স্মৃতি স্মরণে উদ্‌বাস্তুর কান্না।

দীনেশ চন্দ্র সেন এবং ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক উভয়ের সম্পাদনায় যে ৪৫টি গীতিকা পাওয়া যায় ক্রমানুসারে সেগুলোর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিম্নোক্তভাবে দেখানো যেতে পারে :

দীনেশ চন্দ্র সেনের সম্পাদনায় *মৈমনসিংহ-গীতিকা* (*পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা*, ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে। এ খণ্ডের মোট ১০টি পালার মধ্যে ৯টি পালা ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সংকলন ও সম্পাদনা করে *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। পালাগুলো হলো মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা এবং দেওয়ানা মদিনা।

মহুয়া- একটি যাযাবর গোষ্ঠীর প্রধান হুমরা বেদের পালিত কন্যা মহুয়া ও একটি বিত্তবান প্রতিষ্ঠিত সামন্ত পরিবারের নদের চাঁদের অসম প্রণয় ও তার পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। এরা একে অপরের প্রতি গভীর প্রেমাসক্ত হয়ে পড়লে হুমরা বেদে এ প্রণয়ে বিরোধিতা করে। প্রণয়-রক্ষার্থে মহুয়া নদের চাঁদকে নিয়ে গৃহত্যাগ করে। পথে নদী পার হতে গিয়ে উভয়ে এক সাধু সওদাগর নৌকার শরণাপন্ন হলে সাধু মহুয়ার দেহ-রূপে মুগ্ধ হয়ে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। সাধু নদের চাঁদকে নদীতে ফেলে দেয়, পরে মহুয়ার বুদ্ধিমত্তার ফলে সাধু সওদাগর দলবলসহ নিহত হয়। বহু খোঁজাখুঁজির পর মুমূর্ষু নদের চাঁদের সঙ্গে এক মন্দিরে মহুয়ার সাক্ষাৎ ঘটলেও সেখানে আর এক অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় মন্দিরের সন্ন্যাসী। কিন্তু মহুয়া বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলে স্বামীকে সুস্থ করে সে সন্ন্যাসীর নাগাল থেকে পালিয়ে এক বনে এসে বন দম্পতির ন্যায় বসবাস শুরু করে। দীর্ঘদিন পর হুমরা তাদের খুঁজে পেয়ে নদের চাঁদকে হত্যা করতে মহুয়ার হাতে বিষলক্ষের ছুরি তুলে দেয়। সেই ছুরি দিয়ে মহুয়া প্রেমের বিজয় ঘোষণা করতে আত্মঘাতিনী হয়, অন্যদিকে নদের চাঁদকেও হুমরার নির্দেশে বধ করা হয়। শেষে কৃতকর্মের জন্য হুমরা অনুতপ্ত হয়। গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- মহুয়া, নদের চাঁদ, পালঙ্ক সই এবং হুমরা বেদে।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় ‘মহুয়া’ পালাটি বন্দনা ছাড়া ২৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৭৫৫, কিন্তু আমার গণনায় ৭৯০। বন্দনা ১টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি ‘বাইদ্যা কন্যা মহুয়া’ নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ১ম খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশচন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা বন্দনা ছাড়া ২২ এবং ছত্রসংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৯৮৬, কিন্তু আমার গণনায় ধুয়াসহ ৯৯৮। বন্দনা ২টি। অর্থাৎ দীনেশ চন্দ্র ‘মহুয়া’ পালায় যেখানে একটি মাত্র বন্দনাকে স্থান দিয়েছেন, সেখানে ক্ষিতীশচন্দ্র তাঁর পালায় দু'টি বন্দনা সংযোজন করেছেন। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র তিনি বলেছেন ২৩১; কিন্তু তিনি যে ছত্রগুলোর শেষে ‘+’ চিহ্ন দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র প্রকাশ করেছেন আমার গণনায় তার সংখ্যা ২২৬। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ২৪ অধ্যায়কে ভেঙ্গে ২২ অধ্যায়ে সাজিয়েছেন। কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৭৭টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন বলে ভূমিকায় বলেছেন। কিন্তু পাদটীকার পাঠান্তরগুলো গণনা করে ৭৪টি ছত্রের পাঠান্তর পাওয়া যায়। তবে লক্ষণীয় যে, দীনেশ চন্দ্র ভূমিকায় যে ছত্রসংখ্যা উল্লেখ করেছেন ক্ষিতীশ চন্দ্র সে হিসাবে অতিরিক্ত ছত্রের সংখ্যা নির্ণয় করে ভূমিকায় বলেছেন; যেমন (৯৮৬-৭৫৫) = ২৩১।

মলুয়া- কুড়া পাখী শিকার করতে গিয়ে আড়ালিয়া গ্রামে চান্দবিনোদ নিজেই মলুয়ার প্রেমশরে বিদ্ধ হলো। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য তাদের বিয়ে হলো না। চান্দ বিনোদ কঠোর পরিশ্রম করে তার আর্থিক উন্নতি ঘটিয়ে মলুয়াকে বিয়ে করে। এদিকে মলুয়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান কাজী ও দেওয়ান নেতাই কুটনীর সহযোগিতায় মলুয়াকে পেতে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে। মলুয়ার প্রয়াসে তাদের ষড়যন্ত্রের জাল থেকে চান্দ বিনোদ বহু কষ্টে বেরিয়ে আসতে পারলেও মলুয়া দেওয়ানের কাছে বন্দি হয়। নিজ কৌশলে সে দেওয়ানকে দিয়ে কাজীকে শাস্তি দেওয়াল এবং নিজেও দেওয়ানের কাছ থেকে মুক্তি পেল। এদিকে সর্প দংশনে মুমূর্ষু চান্দ বিনোদ মলুয়ার চেষ্টায় জীবন ফিরে পেলেও চান্দ বিনোদের মামার আপত্তিতে মুসলমান দেওয়ানের গৃহে অন্ন খাওয়ার অপরাধে বিনোদ কর্তৃক সে পরিত্যক্তা হয়। শেষ পর্যন্ত স্বামীর কল্যাণার্থে মলুয়া ভাঙ্গা নৌকায় উঠে পাড়ি জমায় নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে। গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্র হচ্ছে- মলুয়া, চান্দ বিনোদ, কাজী, দেওয়ান এবং নেতাই কুটনী।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় ‘মলুয়া’ পালাটি বন্দনা ছাড়া ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ছত্রসংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ১২৪৭, কিন্তু আমার গণনায় ১২৮১। বন্দনা ১টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি ‘সুন্দরী মলুয়া’ নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ১ম খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা বন্দনা ছাড়া ২৮ এবং ছত্রসংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ১৭৯৯, কিন্তু আমার গণনায় ১৮২৬। বন্দনা ১টি। দীনেশ চন্দ্রের ছত্র থেকে ১২ ছত্র বাদ দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র তিনি বলেছেন ৫৫৪, কিন্তু তিনি যে ছত্রগুলোর শেষে ‘+’ চিহ্ন দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র প্রকাশ করেছেন, আমার গণনায় তার সংখ্যা ৫৪৫। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১৯ অধ্যায়কে ভেঙ্গে ২৮ অধ্যায়ে সাজিয়েছেন। কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৯১টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন বলে ভূমিকায় বলেছেন। কিন্তু পাদটীকার পাঠান্তরগুলো গণনা করে

৯০টি ছত্রের পাঠান্তর পাওয়া যায়। তবে লক্ষণীয় যে, দীনেশ চন্দ্র ভূমিকায় যে ছত্রসংখ্যা উল্লেখ করেছেন ক্ষিতীশ চন্দ্র সে হিসাবে অতিরিক্ত ছত্রের সংখ্যা নির্ণয় করে ভূমিকায় বলেছেন। যেমন, {১৭৯৯-(১২৪৭-১২)}, (১৭৯৯-১২৩৫) = ৫৬৪; যদিও তিনি বলেছেন ৫৫৪ ।

চন্দ্রাবতী- ব্যর্থ প্রেমের গাথা 'চন্দ্রাবতী'তে নায়ক জয়চন্দ্র এবং নায়িকা চন্দ্রাবতীর প্রণয়ভঙ্গের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। জয়চন্দ্র এবং চন্দ্রাবতী বাল্যকাল থেকে পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত হলেও মুসলমান কন্যার পাণিগ্রহণের ফলে জয়চন্দ্রের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর আর বিয়ে হলো না। জীবনের প্রথম প্রেম ব্যর্থ হওয়ায় সে আজীবন অনূঢ়া থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে পিতার পরামর্শে শিব আরাধনায় ব্রতী হয়ে আত্মনিয়োগ করল রামায়ন রচনায়। এদিকে নিজ ভুল বুঝতে পেরে জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতীর সঙ্গে শেষবারের মতো সাক্ষাতের প্রার্থনা জানিয়ে পত্র লেখে। পত্র পাঠ করে চন্দ্রাবতীর প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও পিতার পরামর্শেই সে তার সাথে সাক্ষাত করেনি। ফলে উন্মাদ জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতীর সঙ্গে সাক্ষাতে ব্যর্থ হয়ে জলে আত্মবিসর্জন দেয়। জয়চন্দ্রের স্পর্শে মন্দির অপবিত্র হয়েছে বলে স্নানের উদ্দেশ্যে কলসীসহ জলের ঘাটে উপস্থিত হয়ে সে জয়চন্দ্রের মৃতদেহ পানিতে ভাসতে দেখে চরমভাবে ভেঙ্গে পড়ার মধ্য দিয়েই পালা শেষ হয়। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- চন্দ্রাবতী, জয়চন্দ্র এবং বংশীদাস।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'চন্দ্রাবতী' পালাটি ১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্রসংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৩৫৪, কিন্তু আমার গণনায় ৩৭৯। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি একই নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ১ম খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা ১৪, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্রসংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৫৪৬, কিন্তু আমার গণনায় ৫৪৮। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র তিনি বলেছেন ১৯২, কিন্তু তিনি যে ছত্রগুলোর শেষে '+' চিহ্ন দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র প্রকাশ করেছেন আমার গণনায় তার সংখ্যা ১৮২। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১২টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ১৪টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন, তবে শুধু ১০ম অধ্যায়টি তিনি নতুন সংযোজন করেছেন যা দীনেশ চন্দ্রের সংকলনে ছিল না। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ১৯টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন বলে ভূমিকায় বলেছেন। কিন্তু পাদটীকার পাঠান্তরগুলো গণনা করে ১৬টি ছত্রের পাঠান্তর পাওয়া যায়। লক্ষণীয় যে, দীনেশ চন্দ্র ভূমিকায় যে ছত্রসংখ্যা উল্লেখ করেছেন ক্ষিতীশ চন্দ্র সে হিসাবে অতিরিক্ত ছত্রের সংখ্যা নির্ণয় করে ভূমিকায় বলেছেন। যেমন, (৫৪৬-৩৫৪) = ১৯২।

কমলা- কমলা পিতৃপ্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হলেও তাদেরই কারকুন নিদানের চক্রান্তে তাকে অপরিসীম দুঃখ ভোগ করতে হয়। নিদান চিকন গোয়ালিনীর মাধ্যমে কমলাকে প্রেমপত্র পাঠায়। কিন্তু কমলা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে গোয়ালিনীকে প্রহার করে তাড়িয়ে দেয়। প্রতিশোধ পরায়ণ নিদানের নানা চক্রান্ত সহ্য করতে না পেরে কমলা ছদ্মবেশে এক মৈষালের গৃহে আশ্রয় লাভ করে। সেখানেই শিকারী বেশে রাজকুমার প্রদীপকুমার কমলাকে বিয়ের উদ্দেশ্যে নিয়ে নিজ দেশে যাত্রা করে। কিন্তু তার শত অনুরোধেও কমলা আপন পরিচয় দান থেকে বিরত থাকে। শেষ পর্যন্ত কমলার বুদ্ধিমত্তার কারণেই শত্রুর দণ্ড বিধান হয় এবং তার পরিবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। প্রদীপকুমারের সাথে কমলার বিয়ের মধ্য

দিয়েই কাহিনী মিলনাত্মক পরিণতি লাভ করে। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- কমলা, প্রদীপকুমার, কারকুন নিদান এবং চিকন গোয়ালিনী।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'কমলা' পালাটি 'আরম্ভণ' নামক মুখবন্ধ ছাড়া ১৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ছত্রসংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ১৩২০, কিন্তু আমার গণনায় ১২০৮। 'আরম্ভণ' নামক মুখবন্ধ ১টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'কমলা কন্যা' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা বন্দনা ছাড়া ১৮ এবং ছত্রসংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ১৪২৬, কিন্তু আমার গণনায় ১৪১৬। বন্দনা ১টি। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র তিনি বলেছেন ২১৮, কিন্তু তিনি যে ছত্রগুলোর শেষে '+' চিহ্ন দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র প্রকাশ করেছেন আমার গণনায় তার সংখ্যা ২২৩। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১৭টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ১৮টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন। কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেন নি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ১৮টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন বলে ভূমিকায় বলেছেন। কিন্তু পাদটীকার পাঠান্তরগুলো গণনা করে ২৪টি ছত্রের পাঠান্তর পাওয়া যায়।

দেওয়ান ভাবনা- কৈশোরে পিতৃহীন বালিকা সুনাই নিরাপত্তাহীনতার কারণে আশ্রিতা হয় মাতুলালয়ে। এরই মধ্যে জমিদার-পুত্র মাধবের সঙ্গে তার প্রণয়ের সূত্রপাত হয়। এদিকে আশ্রয়দাতার হীন বিষয়লোভী মানসিকতার ফলে বাঘরার মাধ্যমে দেওয়ান ভাবনা সুনাইয়ের রূপ সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাকে অপহরণ করে। সংবাদ পেয়ে মাধব পথিমধ্যে অপহরণকারীদের পর্যুদস্ত করে সুনাইকে উদ্ধার করে বিয়ে করে। ফলে দেওয়ান প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে মাধবের পিতাকে বন্দি করে। পিতাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করতে গিয়ে মাধব নিজে বন্দি হয়। শ্বশুরের অনুরোধে জীবনরক্ষার জন্য সুনাই দেওয়ানের কাছে আত্মসমর্পণ করে মাধবকে মুক্ত করে এবং নিজে আত্মঘাতিনী হয়ে সতীত্ব রক্ষা করে। গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- সুনাই, মাধব, ভাটুক ঠাকুর, দেওয়ান ভাবনা এবং বাঘরা।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'দেওয়ান ভাবনা' পালাটি ৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্রসংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৩৭৪, কিন্তু আমার গণনায় ৩৭৮। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'সুনাই সুন্দরী' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা ১০, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্রসংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৫৪৫, আমার গণনায়ও তাই। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র তিনি বলেছেন ১৭১, কিন্তু তিনি যে ছত্রগুলোর শেষে '+' চিহ্ন দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র প্রকাশ করেছেন, আমার গণনায় তার সংখ্যা ১৫৩। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ৯টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ১০টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন। কোন নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৪৩টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

দস্যু কেনারামের পালা- পালার উপজীব্য বিষয় দস্যু কেনারামের ভক্তে রূপান্তর। অপুত্রক খেলারাম ও তার স্ত্রী যশোধারা মনসার বরে পুত্র কেনারামকে লাভ করে। পিতা-মাতার অবর্তমানে মামীর কাছেই

কেনারাম মানুষ হচ্ছিল। এদিকে দেশে অভাব দেখা দিলে মাত্র পাঁচ কাঠা ধানের বিনিময়ে মামী তাকে দুর্ধর্ষ ডাকাত হালুয়ার কাছে বিক্রী করে দেয়। হালুয়ার সাতপুত্রের সংস্পর্শে কালক্রমে কেনারামও হয়ে উঠল নরঘাতি ডাকাত। ঘটনাচক্রে একদিন তার সাথে পথে দেখা হয়ে যায় বংশীদাসের। বংশীদাস ও তার সঙ্গীদের কণ্ঠে মনোমুগ্ধকর মনসার ভাসান গান শুনে তার কঠোর মন বিগলিত হয় এবং সেই সঙ্গে পাপের পরিণতির কথা জেনে কেনারামের মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটে। ডাকাতি করা ধন সম্পদ নদীতে বিসর্জন দিয়ে সে দীক্ষিত হয় বংশীদাসের কাছে এবং মনসামঙ্গল গেয়ে ভিক্ষা করে জীবন নির্বাহ করে। গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- কেনারাম, খেলারাম, যশোধারা, ডাকাত হালুয়া এবং বংশীদাস।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'দস্যু কেনারামের' পালা'টি ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্রসংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ১০৫৪, কিন্তু আমার গণনায় দিশাসহ ১০৭৯। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'দস্যু কেনারাম' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ১ম খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা ৫টি, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্রসংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৬০২, আমার গণনায়ও তাই। দীনেশ চন্দ্র তার পালায় মনসার ভাসানবা মনসা মঙ্গল পালার কিছু অংশ প্রকাশ করেছেন, ক্ষিতীশ চন্দ্র সেগুলো বাদ দিয়েছেন। তিনি যে ছত্রগুলোর শেষে '+' চিহ্ন দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র প্রকাশ করেছেন, আমার গণনায় তার সংখ্যা ১৩২টি। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ৬টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ৫টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন। কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৪০টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন বলে ভূমিকায় বলেছেন। কিন্তু পাদটীকার পাঠান্তরগুলো গণনা করে ৩৮টি ছত্রের পাঠান্তর পাওয়া যায়।

রূপবতী-নায়িকা রূপবতী তার মাতা-পিতার অবলম্বিত কৌশলে নবাবের লালসা থেকে আত্মরক্ষার জন্য গৃহভৃত্য বক্সী মদনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে রাজ প্রাসাদ ত্যাগ করে বনান্তরে উপস্থিত হয়। সেখানে এক জেলে দম্পতির গৃহে আশ্রয় পেয়ে ছয় বছর পার হওয়ার পর বক্সী মদন মা-বাবার সংবাদ আনতে যায়। দীর্ঘ দিনেও সে প্রত্যাবর্তন করে না। হঠাৎ রূপবতী শুনতে পায় রাজা মদনকে ধরে নিয়ে গেছেন নরবলী দেবার উদ্দেশ্যে। এ সংবাদে বিরহকাতর রূপবতীর দুঃখ-মোচনকল্পে জেলে-গৃহিণী পুনাই নিজেই উদ্যোগী হয়ে রাজ দরবারে যায়। শেষপর্যন্ত তারই সক্রিয়তা ও সাহসিকতার ফলে বক্সী মদন কারামুক্ত হয়ে রূপবতীর সঙ্গে পুনর্বার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সুখী দাম্পত্য জীবন গ্রহণ করে। গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- রাজচন্দ্র, রাণী, রূপবতী, বক্সী মদন, পুনাই এবং পাঁচজন গণক।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'রূপবতী' পালা'টির অধ্যায় সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৭টি, কিন্তু আমার গণনায় ৬; কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্রসংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৪৯৩, কিন্তু আমার গণনায় দিশাসহ ৪৪৮। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'রাজকন্যা রূপবতী' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ২য় খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা ১২, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্রসংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৬৩৩, কিন্তু আমার গণনায় ধুয়া, দিশা ও চিতান সহ ৬৪০। দীনেশ চন্দ্রের ছত্র থেকে ১২৫টি ছত্র বাদ দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র তিনি বলেছেন ৩৩৪, কিন্তু তিনি যে ছত্রগুলোর শেষে '+' চিহ্ন দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র প্রকাশ করেছেন, আমার গণনায় তার সংখ্যা ২৯৬। এ পালায়

ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ৬টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ১২টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন, তবে ৮ম, ১১শ এবং ১২শ অধ্যায় তিনটি তিনি নতুন সংযোজন করেছেন যা দীনেশ চন্দ্রের সংকলনে ছিল না। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৩৩টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন বলে ভূমিকায় বলেছেন। কিন্তু পাদটীকার পাঠান্তরগুলো গণনা করে ৩৬টি ছত্রের পাঠান্তর পাওয়া যায়।

কঙ্ক ও লীলা- বিপ্রপুরের ব্রাহ্মণ গুনরাজ খানের পুত্র কঙ্ক জীবনস্রোতে ভাসতে ভাসতে তৃতীয়বারের মতো আশ্রয় পেল গর্গ নামে এক ব্রাহ্মণের কাছে। গর্গের একমাত্র কন্যা লীলা কঙ্কের প্রণয়াবিষ্ট হলো। এদিকে রাখালী কঙ্কের চমৎকার বাশীর সুরে মুগ্ধ হয়ে এক পীর তাকে গোপনে দীক্ষা দেয়। ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও পীরের কাছে দীক্ষা নেয়ায় এবং লীলার সাথে প্রণয়াবিষ্ট হওয়ায় গোঁড়া হিন্দুদের চাপে গর্গ কঙ্ক ও লীলাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। লীলা তা গোপনে জেনে কঙ্ককে অন্যত্র চলে যাবার পরামর্শ দিলে সে তীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে যায়। এদিকে গর্গ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে নিজ ভুল বুঝতে পেরে কঙ্কের সন্ধানে শিষ্য প্রেরণ করে। সবশেষে কঙ্ক যখন ফিরে এলো তার পূর্বেই দীর্ঘ বিচ্ছেদে লীলার অকাল মৃত্যু ঘটে। অনুশোচনায় দগ্ধ গর্গকে নিয়ে কঙ্ক নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- কঙ্ক, লীলা, গর্গ এবং যবন পীর।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'কঙ্ক ও লীলা' পালা'টি বন্দনা ছাড়া ২৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ছত্রসংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ১০১৪, কিন্তু আমার গণনায় দিশাসহ ১১১৯। বন্দনা ৩টি এবং শেষে গায়েনের নিবেদন ১টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'লীলা কন্যা কবি কঙ্ক' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা বন্দনা ছাড়া ২৫ এবং ছত্রসংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ১৪৯৮, কিন্তু আমার গণনায় ধুয়া, দিশা সহ ১৪৮৮। বন্দনা ২টি এবং শেষে গায়েনের নিবেদন ২টি। দীনেশ চন্দ্রের ছত্র থেকে ৮টি ছত্র বাদ দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র তিনি বলেছেন ৪৯২, কিন্তু তিনি যে ছত্রগুলোর শেষে '+' চিহ্ন দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র প্রকাশ করেছেন আমার গণনায় তার সংখ্যা ৪১৪। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ২৩টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ২৫টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন। কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৫৭টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন বলে ভূমিকায় বলেছেন। কিন্তু পাদটীকার পাঠান্তরগুলো গণনা করে ৬৫টি ছত্রের পাঠান্তর পাওয়া যায়। লক্ষণীয় যে, দীনেশ চন্দ্র ভূমিকায় যে ছত্র সংখ্যা উল্লেখ করেছেন ক্ষিতীশ চন্দ্র সে হিসাবে অতিরিক্ত ছত্র সংখ্যা নির্ণয় করে ভূমিকায় বলেছেন। যেমন- {১৪৯৮-(১০১৪-৮)}, (১৪৯৮-১০০৬) = ৪৯২।

কাজলরেখা- সদাগর ধনেশ্বর জুয়াখেলে সব সম্পত্তি হারালে এক সন্ন্যাসী প্রদত্ত শুক পাখীর কথামতো কাজ করে সব সম্পত্তি আবার ফিরে পেলো। শুক পাখী কন্যা কাজলরেখাকেও এক মরা স্বামীর সঙ্গে বিয়ের কথা বলে বনবাস দেয়ার পরামর্শ দিলে সাধু তাই করেন। বনাবাসে এক মন্দিরে মরা স্বামী পেয়ে তাকে জীবনদান করতে সন্ন্যাসীর পরামর্শে গাছের পাতার রস দেয়ার প্রস্তুতি নিল। কিন্তু দুর্দৈব বশত কাজটি কঙ্কনদাসী করে ফেললে সুচরাজা তার স্বামী হয়ে গেল এবং পূর্ব নির্দেশ মতো কাজলরেখা নীরবতা পালন করে স্বামীর সংসারে দাসী হয়ে সময়ের প্রতীক্ষায় থাকল। সুচরাজা দেশভ্রমণে যেতে

চাইলে কাজলরেখা তার জন্য এক ধর্মমতি শুকপাখী আনার কথা বলল। তার আচরণে সুচরাজার সন্দেহ হলেও কাজলরেখা তার প্রকৃত পরিচয় গোপন রেখে চলল। পরবর্তীতে নকল রানী এবং সুচরাজার অপর এক বন্ধুর চক্রান্তে ও শুক পাখীর পরামর্শে কাজলরেখাকে আবার বনবাসে যেতে হলো। এদিকে কাজলরেখার আপন ভাই রত্নেশ্বর বাণিজ্যে যাবার পথে তাকে পেয়ে পরিচয় না জেনে উদ্ধার করে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। এবার সময় হলে শুক পাখী কাজলরেখার আনুপূর্বিক সমস্ত পরিচয় ব্যক্ত করল। সব শুনে রত্নেশ্বর তার কাছে ক্ষমা চাইল, সুচরাজা নকল রানী কঙ্কনদাসীকে উপযুক্ত শাস্তি দিল এবং দীর্ঘ বার বছর দুঃখ ভোগের পর কাজলরেখা তার স্বামীর সঙ্গে মিলিত হলো। গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- কাজলরেখা, সন্ন্যাসী, সুচরাজা, কঙ্কনদাসী, রত্নেশ্বর এবং শুকপাখী।
এ পালাটি ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিকের সম্পদনায় নেই।

দেওয়ানা মদিনা- পালাটি পতিপ্রেমের অপূর্ব পরাকাষ্ঠামূলক গাথা। দেওয়ান সোনাফরের প্রথমা স্ত্রীর দুই পুত্র আলাল ও দুলাল বিমাতার চক্রান্ত থেকে ঘটনাক্রমে রক্ষা পেয়ে কাজলকান্দা গ্রামে হীরাধর ব্যাপারীর গৃহে বিক্রী হয়। সেখানে দুলাল হিরাধর ব্যাপারীর কন্যা মদিনাকে কিছু জায়গা জমির বিনিময়ে বিয়ে করে। তাদের সুরুজ নামে একটি সন্তানও ছিল। এদিকে আলাল পালিয়ে দেওয়ান সেকেন্দারের আশ্রয় ও সহযোগিতা নিয়ে পিতৃভিটা উদ্ধার করে পিতৃপদের অধিকারী হয়। সে সেকেন্দারের দুই কন্যার একজনকে নিজে বিয়ে করবে এবং অন্য কন্যার সঙ্গে ছোট ভাই দুলালের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করে তাকে খুঁজে বের করে। বড় ভাই আলালই দুলালকে প্ররোচিত করে তালাকনামা দিয়ে মদিনাকে ত্যাগ করে সেকেন্দারের কন্যাকে বিয়ে করতে। ফলে দুলাল পতিগতপ্রাণা মদিনাকে তালাকনামা লিখে দিয়ে দ্বিতীয় বার বিয়ে করে। ভাইয়ের মারফত মদিনা তালাকনামা পেলেও প্রকৃত ঘটনা সে বিশ্বাস করতে পারল না। কিন্তু দুলাল কর্তৃক নিজ পুত্রকে প্রত্যাখানের ঘটনায় তার আশা ভঙ্গ হলো। দীর্ঘদিন স্বামীর পথ চেয়ে শেষ পর্যন্ত হতভাগিনী মদিনা দুলালের বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে অকালমৃত্যু বরণ করে। সবশেষে দুলালকে নিজের কৃতকর্মের জন্য বিবেকের দংশনে ক্ষত বিক্ষত হতে দেখা যায়। গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- আলাল, দুলাল, মদিনা, বিমাতা এবং সোনাফর।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় *মৈমনসিংহ-গীতিকা* গ্রন্থে প্রকাশিত সর্বশেষ পালা 'দেওয়ানা মদিনা' ৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় দিশাসহ ৮২২। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি একই নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ২য় খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ১৩, কিন্তু আমার গণনায় ১৪ এবং ছত্রসংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ১০১৪, কিন্তু আমার গণনায় দিশাসহ ১০১১। কোনো বন্দনা নেই। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র তিনি বলেছেন ১৯৪, কিন্তু তিনি যে ছত্রগুলোর শেষে '+' চিহ্ন দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র প্রকাশ করেছেন আমার গণনায় তার সংখ্যা ১৭৯। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ৭টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ১৪টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন। কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৩২টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

দীনেশ চন্দ্র সেনের সম্পাদনায় *পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা* ২য় খন্ড ২য় সংখ্যাটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে। এ খণ্ডের মোট ১৪টি পালার মধ্যে ১০টি পালা ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সংকলন ও সম্পাদনা করে *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। পালাগুলো হলো ধোপার পাট, মইষাল বন্ধু, শান্তি, ভেলুয়া, কমলা রাণীর গান, মানিকতারা বা ডাকাইতের পালা, নেজাম ডাকাইতের পালা, দেওয়ান ইশা খা মসনদালি, সুরৎ জামাল ও অধুয়া এবং ফিরোজ খাঁ দেওয়ান।

ধোপার পাট- অসম প্রেমের গাথা 'ধোপার পাট'-এ ধোপার চতুর্দশী সুন্দরী কন্যা কাঞ্চনমালার রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজকুমার তাকে প্রেম নিবেদন করলে কাঞ্চনমালা পিতামাতার পরিচিত পরিবেশ ত্যাগ করে রাজকুমারের সঙ্গে গৃহত্যাগিনী হয়। তারা নিজ নিজ আপন জনদের ত্যাগ করে অন্য রাজ্যে উপস্থিত হয়ে সেই রাজ্যের রাজার ধোপার গৃহে আশ্রয় নিয়ে তার মাধ্যমে ঐ রাজ্যের রাজকন্যা রুক্মিনীর সঙ্গে পরিচিত হয়। রুক্মিনীও কৌশলে কাঞ্চনমালার কাছে থেকে রাজকুমারকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে। অবশেষে রাজকুমার কাঞ্চনমালাকে তিন মাসের জন্য বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছে বলে রুক্মিনীকে বিয়ে করে নিজ দেশে ফিরে দাম্পত্য জীবন শুরু করে। কাঞ্চনমালা রাজকুমারের আশায় পথ চেয়ে শেষে নিরাশ হয়ে পিত্রালয়ে ফিরে আসে। একদিন রাজপ্রাসাদে এসে স্বচক্ষে দেখতে পায় রাজকুমার ও রুক্মিনীর বিবাহিত জীবন। স্বামী রাজকুমারের এ বিশ্বাসঘাতকতা সে সহ্য করতে না পেরে নদীর জলে আত্মবিসর্জন দেয়। গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- কাঞ্চনামালা, রাজপুত্র, রুক্মিনী এবং তামসা গাজী।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় *ধোপার পাট* পালাটি ১৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৪৬৯, কিন্তু আমার গণানায় ধুয়াসহ ৪৭৬। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'কাঞ্চন কন্যা' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ২য় খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা ১৫, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৭৫০, কিন্তু আমার গণনায় ধুয়াসহ ৭৫৮। কোনো বন্দনা নেই। দীনেশ চন্দ্রের ছত্র থেকে ৩টি ছত্র বাদ দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র তিনি বলেছেন ২৮৪, কিন্তু তিনি যে ছত্রগুলোর শেষে '+' চিহ্ন দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র প্রকাশ করেছেন আমার গণনায় তার সংখ্যা ২৯০। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১৩টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ১৫টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন। কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৭৭টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন বলে ভূমিকায় বলেছেন। কিন্তু পাদটীকার পাঠান্তরগুলো গণনা করে ৭৯টি ছত্রের পাঠান্তর পাওয়া যায়। লক্ষণীয় যে, দীনেশ চন্দ্র ভূমিকায় যে ছত্র সংখ্যা উল্লেখ করেছেন ক্ষিতীশ চন্দ্র সে হিসাবে অতিরিক্ত ছত্র সংখ্যা নির্ণয় করে ভূমিকায় বলেছেন। যেমন- {৭৫০-(৪৬৯-৩)}, (৭৫০-৪৬৬) = ২৮৪।

মইষাল বন্ধু- 'মইষাল বন্ধু' গাথার দুটি পালায়ই কাহিনীগত ও চরিত্রগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা গেলেও মূল কাহিনী সাজুতী ও মৈষাল ডিঙ্গাধরের প্রণয়। ভাগ্য বিড়ম্বনায় গাথার নায়ক ডিঙ্গাধর ধনী মহাজন বলরামের কাছ থেকে পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য তারই গৃহে ছয় বছর মেয়াদে মহিষের রাখালীতে নিযুক্ত হয়। এখানে তার বাঁশী বাজানোতে মুগ্ধ হয়ে বলরামের কন্যা সাজুতী তার প্রেমাসক্ত

হয়। ডিঙ্গাধরের অন্যমনস্কতায় বলরামের মহিষ জমিদারের ধান খেলে তাকে বন্দি করা হয়। জরিমানা দিয়ে ডিঙ্গাধরকে মুক্ত করা হলে সে আর গৃহে না ফিরে পুবাল্যা ব্যাপারীর সহায়তায় ধনী হয়ে উঠে। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর সে ছদ্মবেশে বলরামের গৃহে ফিরে বলরামের মৃত্যু ও সাজুতীর দরিদ্র অবস্থা দেখে তাদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে এবং সাজুতীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। এদিকে মঘুয়া নামে এক ব্যাপারী নদী দিয়ে যাত্রার সময় নদীর ঘাটে সাজুতীকে দেখে কৌশলে তাকে অপহরণ করার মধ্য দিয়ে পালার শেষ হয়। দুই পালা মিলে উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- ডিঙ্গাধর, সাজুতী, মঘুয়া, কঙ্কুরাজা এবং ময়না।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় '*মইষাল বন্ধু*' ২টি পালায় ১৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা ধুয়াসহ ৮৭৫। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'মইষাল বন্ধু- সাঁজুতী কন্যার পালা' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যাও ১৫ এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৮০৬, কিন্তু আমার গণনায় ৮৪৯; কোনো বন্দনা নেই। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র তিনি বলেছেন ২০৬, কিন্তু তিনি যে ছত্রগুলোর শেষে '+' চিহ্ন দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র প্রকাশ করেছেন আমার গণনায় তার সংখ্যা ২২৬। তবে দীনেশ চন্দ্রের বেশ কিছু ছত্র ক্ষিতীশ চন্দ্র বাদ দিয়েছেন। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৬৮টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন বলে ভূমিকায় বলেছেন। কিন্তু পাদটীকার পাঠান্তরগুলো গণনা করে ৬৬টি ছত্রের পাঠান্তর পাওয়া যায়। ক্ষিতীশ চন্দ্রের পালাটি এক প্রস্থেই সমাপ্ত।

কাঞ্চনমালা- পরীরাজার অভিশাপে নায়িকা কাঞ্চনমালা ভরাই নগরে অপুত্রক সাধু সদগরের ঘরে বিশ বছরের জন্য মনুষ্য কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে। তাকে নয় বছরে বিয়ে না দিলে সদাগর তার সব সম্পদ হারাবে বলেও ফল প্রদানকারী সন্নাসীর ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এদিকে যোগ্য পাত্রের অভাবে নয় বছর পূর্ণ হতে চললে বাধ্য হয়ে এক ভিক্ষুকের ছয় মাস বয়সী অন্ধ পুত্রের সঙ্গে কাঞ্চনমালার বিয়ে দেয়া হয়। মনোকষ্টে কাঞ্চনমালা অন্ধ স্বামীকে নিয়ে গৃহত্যাগিনী হয়। বনে এক সন্ন্যাসীর দেওয়া ফল খাওয়ালে স্বামী চোখ ফিরে পায়। সন্ন্যাসীর কথা মতো সে এক কাঠুরিয়া দম্পতির গৃহে আশ্রয় নেয়। এখানেই তাদের ছয় বছর অতিবাহিত হলে একদিন সুমাই নগরের রাজা বিদ্যাধর শিকার করতে এসে ঐ অন্ধ কুমারকে বনে খেলতে দেখে ধরে নিয়ে যায় নিজ রাজ্যে এবং রাজকন্যা কুঞ্জমালার সাথে বিয়ে দেয়। এদিকে কাঞ্চনমালা স্বামীকে খুঁজতে খুঁজতে ছয় বছর পর বিদ্যাধরের রাজ্যে পৌঁছুলে কুঞ্জমালার একজন দাসী প্রয়োজন বলে কাঞ্চনমালাকেই রাখা হলো। ফুলকুমার অতি ছোট ছিল বলে কাঞ্চনমালার প্রকৃত পরিচয় না জানলেও বনবাস জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা তার মনে ছিল। কুঞ্জমালা তাকে দিয়ে কাঞ্চনমালার ছবি আঁকিয়ে রেখেছিল বলে দাসীরূপী সতীন কাঞ্চনমালাকে তার চিনতে বাকী থাকল না। ফলে কুঞ্জমালা তার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে কৌশলে তাকে আবার বনবাসে পাঠালো। বনবাসে ছয় মাস অতিবাহিত হলে পূর্বোক্ত সন্ন্যাসী তাকে দেখা দিয়ে বনে এক সমৃদ্ধ নগরী গড়ে তুলে ঘোষণা দিলেন যে, এই কন্যার গাওয়া গানের বাকী অর্ধাংশ যে পূরণ করতে পারবে কন্যা তারই পাণি গ্রহণ করবে। শেষে ঐ অন্ধ ফুলকুমারই কাঞ্চনমালার গানের অর্ধাংশ পুরণ করে স্বামীরূপে গৃহীত হয়। উভয়ে উভয়েকে চিনতে পারে। সন্ন্যাসী প্রদত্ত ফল খাওয়ালে এবং একই সাথে চিরকালের মতো স্বামীকেও ছাড়তে পারলে স্বামী ফুলকুমারের চোখ ভালো হবে- এই শর্তে কাঞ্চনমালা রাজী হল। পরে সন্নাসীর পরামর্শে মায়াকাঠি নিয়ে

পিতৃরাজ্যে ফিরে বিমাতাকে পালাতে বাধ্য করল। কিন্তু দীর্ঘদিন বাইরে থাকায় কাঞ্চনমালাকে সতীত্ব পরীক্ষার জন্য মাকড়সার সুতা ধরে শূন্যে ঝুলতে হলো। এভাবে বিশ বছর পূর্ণ করে তার দেবলোকে হারিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে পালা শেষ হয়। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হলো- কাঞ্চনমালা, অন্ধ ফুলকুমার, সাধু সদাগর, সন্নাসী, কুঞ্জলতা এবং রাজা বিদ্যাধর।
এ পালাটি ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় নেই।

শান্তি- তিল্যাম সওদাগর বা সুন্দরের সঙ্গে অতি শৈশবেই গুণধর বণিকের কন্যা শান্তির বিয়ে হলেও তখন স্বামীকে চিনে রাখার ক্ষমতা তার ছিল না। হয়ত অস্পষ্ট একটা স্মৃতি তার মনে ছিল। দীর্ঘদিন অদর্শনের পর স্বামী ফিরে এসে শান্তিকে ছলনা দ্বারা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখল সে যৌবন সীমায় উত্তীর্ণ। সুন্দর আত্মপরিচয় গোপন করে দীর্ঘ একটি বছরব্যাপী শান্তিকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে লাগল। কিন্তু সে তার সতীত্ব অটুট রেখে সুন্দরের সমস্ত প্রস্তাবই প্রত্যাখান করে চলল। শেষে শান্তি যখন তার মা-বাবার মাধ্যমে ছলনাকারীকে স্বামী বলে চিনতে পারে তখন তাদের মিলনের মধ্য দিয়ে পালাটি শেষ হয়। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্র দুটি- শান্তি এবং সুন্দর বা তিল্যাম সদাগর।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় '*শান্তি*' পালাটির কোনো অধ্যায় ভাগ নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ১২৫, কিন্তু আমার গণনায় ১১৮। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'শান্তি কন্যার হাঁহলা' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালারও কোনো অধ্যায় ভাগ নেই এবং ছত্র সংখ্যা ১৪৬। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র ২৮। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ২৫টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

নীলা- শিশুকালে নায়িকা নীলার বিয়ে দেয়া হয়েছিল গদাধরের পুত্র ও নায়ক সুন্দরের সঙ্গে। দীর্ঘদিন স্বামীর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় সে ফিরলে নীলা তাকে চিনতে পারল না। এই সুযোগে স্বামী তাকে ছলনা দ্বারা একটি বছর ধরে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু সে তার কোনো প্রস্তাবেই রাজী হয় না। শেষে নীলা মা-বাবার সহযোগিতায় ছলনাকারীকে স্বামী বলে মেনে নিলে কাহিনী শেষ হয়। পালা উল্লেখযোগ্য চরিত্র- নীলা ও সুন্দর। এ পালাটি ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় নেই।

ভেলুয়া- শঙ্খপুরের মুরাই সাধুর পুত্র মদন সাধু পিতার নির্দেশে চৌদ্দ ডিঙ্গা নিয়ে বাণিজ্যে বের হয়ে কাঞ্চননগরের ঘাটে পোঁছে। সেখানে কাঞ্চননগরের মানিক সদাগরের কন্যা ভেলুয়াকে নদীর ঘাটে দেখে অনুরাগ জন্মালে মদন সাধুর সাথে তার মিলন হয়। পরে মদন সাধু দেশে ফিরলে তার পিতা তার কাছে সব অবগত হয়ে কাঞ্চননগরে মানিক সদাগরের কাছে ভেলুয়ার জন্য ঘটক প্রেরণ করেন। কিন্তু আভিজাত্যবোধে ভেলুয়ার পিতা এ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে মদন সাধু পুনরায় কাঞ্চনগর গিয়ে ভেলুয়াকে গোপনে অপহরণ করে পিতৃগৃহে নিয়ে আসে। এ অপহরণে অসন্তুষ্ট হয়ে মুরাই সাধু ভেলুয়াসহ পুত্রকে গৃহচ্যুত করে। ফলে মদন সাধু ভেলুয়াকে নিয়ে রাংচাপুরে আবু রাজার কাছে এসে আশ্রয় নেয়। এখানে দুষ্ট আবু রাজা ভেলুয়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে পেতে নানা চক্রান্ত করে মদন সাধুকে বিদেশ যাত্রায় বাধ্য করে। মদন সাধু ভেলুয়াকে জানিয়ে যায়, বিপদে সে যেন বন্ধু হীরণ সাধুর বাড়ী জৈতাশ্বরে

পালিয়ে যায়। আবু রাজার কবল থেকে পালিয়ে ভেলুয়া কৌশলে সলুকা দাসীকে নিয়ে চলে আসে জৈতাশ্বর হীরণ সাধুর বাড়ী। এখানেও বন্ধু হীরণ সাধুর ভেলুয়ার প্রতি লোলুপদৃষ্টি পরলে তাকে বিয়ে করার প্রস্তুতি নেয়। এর পূর্বে কোনো এক সময় মদন সাধু বন্ধু হীরণ সাধুর বাড়ী এলে তার বোন মেনকা সুন্দরীকে দেখে পছন্দ করে। কিন্তু ভেলুয়ার আগমনে সব নষ্ট হয়ে যায়। মেনকার মাধ্যমে ভেলুয়াকে হীরণ সাধুর বিয়ের কথা জানালে ভেলুয়া মেনকার সহযোগিতায় সময় চেয়ে নেয়। এ সুযোগে হীরণ সাধু বাণিজ্যের ছলে মদন সাধুকে হত্যার জন্য বের হলে ভেলুয়া তা জানতে পারে। সে শারী পাখীর মাধ্যমে মদন সাধুকে এ হত্যার পরিকল্পনা জানালে মদন সাধু হীরণ সাধুর নাগাল থেকে পালিয়ে জৈতাশ্বরে চলে আসে। সে পুনরায় শারী পাখীর মাধ্যমে ভেলুয়াকে জানায় যে মদন সাধু চৌদ্দ ডিঙ্গাসহ ভাইট্যাল বাঁকে তার জন্য অপেক্ষায় আছে। খবর পেয়ে ভেলুয়া ছুটে যায় মদন সাধুর সাথে পালাবার উদ্দেশ্যে। পথে বিশাল নদীবক্ষে বিপক্ষের সব লোক জনের দ্বারা তারা আক্রান্ত হলে প্রাণ বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ দেয়। তাদের উদ্ধার করে এক ধার্মিক বৃদ্ধ বণিক। পরে বৃদ্ধ সাধুর আশ্রয় হতে আবু রাজা পুনরায় ভেলুয়া ও মেনকাকে বন্দি করে আনে। অবশেষে মদন সাধু ও ভেলুয়ার আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় সব বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে ভেলুয়াকে উদ্ধার ও আবু রাজাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান এবং দুই নায়িকা ভেলুয়া ও মেনকার সাথে মদন সাধুর সুখী দাম্পত্য জীবনে প্রবেশের মধ্য দিয়ে গাথার পরিসমাপ্তি ঘটে। দীর্ঘ এ গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- ভেলুয়া, মদন সাধু, মেনকা, সলুকা দাসী, মুরাই সাধু, মাণিক সদাগর, আবু রাজা, হীরণ সাধু এবং শুক ও শারী পাখী।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় '*ভেলুয়া*' পালাটি ১৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা দিশাসহ ১৩৪৯। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'ভেলুয়া সুন্দরী- মদন সাধুর পালা' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা ২৭, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ১৭৪০, কিন্তু আমার গণনায় ধুয়াসহ ১৭৪৬। দীনেশ চন্দ্রের ছত্র থেকে ২২টি ছত্র বাদ দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র আমার গণনায় ৩৩১। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১৩টি অধ্যায় ভেঙ্গে ২৭টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন। কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ১৩১টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন বলে ভূমিকায় বলেছেন। কিন্তু পাদটীকার পাঠান্তরগুলো গণনা করে ১৩০টি ছত্রের পাঠান্তর পাওয়া যায়।

কমলা রাণীর গান- রাণী কমলার মৃত্যুর পরও স্মরণীয় হয়ে থাকার ইচ্ছা পূরণের জন্য রাজা জানকীনাথ পুকুর খনন করান। কিন্তু শত চেষ্টাতেও পুকুরে জল উঠল না। প্রচলিত সংস্কারে এমনি অবস্থা অশুভের লক্ষণ বলে বিবেচিত হলে রাজা দুশ্চিন্তায় পড়েন। অবশেষে রাজা স্বপ্নাদিষ্ট হলেন যে রাণী ঐ পুকুরে নেমে আত্মবিসর্জন করলে পুকুর জলপূর্ণ হবে। রাজার দেখা স্বপ্নের কথা শুনে রাণী কমলা সত্যিই পুকুরে নেমে আত্মবিসর্জনের উদ্দেশ্যে জল প্রার্থনা করলে পুকুর জলে ভরে উঠল। রাণীও হারিয়ে গেলেন জলের নিচে। রাণীর মৃত্যুতে রাজা অতিশয় বিচ্ছেদকাতর হলে একদিন রাণী এসে রাজার কাছে ধরা দেয় এবং অভিশাপ মোচন হলে সে দেবপুরে চলে যায় রাজাকে ফেলে। গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্র দুটি- রাজা জানকীনাথ এবং রাণী কমলা।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় '*কমলা রাণীর গান*' পালাটি ১০টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৩৪২, কিন্তু আমার গণনায় ৩৪৬। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'কমলা রাণীর পালা' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ২য় খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা ১৩, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৬৬০, কিন্তু আমার গণনায় ৬৭৪। দীনেশ চন্দ্রের ছত্র থেকে ৪ ছত্র বাদ দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র তিনি বলেছেন ৩১৯, কিন্তু তিনি যে ছত্রগুলোর শেষে '+' চিহ্ন দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র প্রকাশ করেছেন আমার গণনায় তার সংখ্যা ৩২০। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১০টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ১৩টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন, তবে ১ম ৪টি অধ্যায় নতুন সংযোজন করেছেন যা দীনেশ চন্দ্রের সংকলনে ছিল না। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৩৮টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

মানিকতারা বা ডাকাইতের পালা- এ পালার কেন্দ্রীয় চরিত্র বাসু পিতা বিশু শীল ও চার ভাইকে হারিয়ে মাতৃ আদরে পালিত হয়ে মায়ের সইয়ের পুত্র কানাইর সংসর্গ দোষে ডাকাতি বৃত্তি গ্রহণ করে। একবার ডাকাতি করে ব্রাহ্মণ হত্যার পর লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিসহ মায়ের কাছে ফিরলে এ হত্যার সংবাদ শুনে হৃদয়ে আঘাত পেয়ে মা মৃত্যুবরণ করে। এর পরও বাসু ডাকাতি চালিয়ে যায়। কানাইর মা কানাইকে বিয়ে দিয়ে বাসুকেও বিয়ে করার পরামর্শ দেয়। বাসু পাত্রীর সন্ধানে বের হয়ে বিয়ে করে আনে সাধু শীলের সুন্দরী কন্যা মানিকতারাকে। বিয়ের পর সে স্ত্রীকে তার জীবিকার কথা বলতে দ্বিধাবোধ করলেও এক সময় ডাকাতি করার সব কথা তাকে জানায়। শুনে মানিকতারা প্রসন্ন মনে স্বামীর সব কাজে সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। অর্থাৎ বাসুর স্ত্রী মানিকতারাও ডাকাতিবৃত্তিতে স্বামীর সহযোগী হয়ে উঠে। একদিন বাসু ও কানাই দলবলসহ ডাকাতি করতে গিয়ে বাসু টাকার থলিসহ পালাতে পারলেও কানাই ধরা পড়ে যায় পরম শত্রু কালুচোরের হাতে। অবশেষে কানাইকে উদ্ধারের জন্য মানিকতারা তার পাঁচ বোনকে নিয়ে যে অভিযান চালায় সেখানেই কাহিনীর অকস্মাৎ পরিসমাপ্তি লাভ করে। গাথাটি অসম্পূর্ণ। গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- মানিকতারা, বাসু এবং কানাই।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'মানিকতারা বা ডাকাতের পালা'টি বন্দনাসহ ১০টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৮৩২, কিন্তু আমার গণনায় ধুয়াসহ ৮৪১। বন্দনা ১টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'মানিক তারা ডাকাইতের পালা' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা বন্দনা ছাড়া ১৮ এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৯৮২, কিন্তু আমার গণনায় ৯৭৭। বন্দনা ১টি। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র আমার গণনায় ১৮০। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৩৫টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন বলে ভূমিকায় বলেছেন। কিন্তু পাদটীকার পাঠান্তরগুলো গণনা করে ৩৯টি ছত্রের পাঠান্তর পাওয়া যায়। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১০টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ১৮টি অধ্যায় সাজিয়েছেন, তবে শেষের ৩টি অধ্যায় নতুন সংযোজন করেছেন যা দীনেশ চন্দ্রের সংকলনে ছিল না।

মদনকুমার ও মধুমালা- উজানী নগরের আটকুরা রাজা দণ্ডধর রানীকে এক সন্ন্যাসী প্রদত্ত আম ভক্ষণ করালে রাজপুত্র মদনকুমারের জন্ম হয়। কিন্তু করম পুরুষ রাজপুত্রের ভাগ্যের কথা রাজবাড়ীর মালিকে জানাল যে রাজা বায়ান্ন বছরের মধ্যে পুত্রের মুখ দর্শন করলে রাজা গাছ হয়ে যাবে। রাজা এ কথা জানতে পেরে মাটির নিচে পাতালপুরী তৈরি করিয়ে বারো বছরের আয়োজন সম্পন্ন করে এক দাসীসহ পুত্র মদনকুমার ও রানীকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। দৈববশত নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই রাজপুত্র পাতালপুরীর দরজা খোলা পেয়ে রাজদরবারে চলে আসলে রাজার সাথে দেখা হয়ে যায়। সাথে সাথে রাজা গাছে পরিণত হন। মন্ত্রীদের অনুরোধে রাজপুত্র মদনকুমারই হলো উজানী নগরের রাজা। এদিকে ইন্দ্রপুরীর তিন কন্যার ছোট কন্যা দেবতার অভিশাপে বারো বছরের জন্য মর্ত্যলোকে মধুমালা নাম নিয়ে রাজা হীরাধরের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে। আরো বারো বছর পর পাপমোচন হলে ইন্দ্রের সভায় সে স্থান পাবে বলে দেবতা তাকে জানিয়ে দেয়। ইন্দ্রের বাকী দুই কন্যা মধুমালা ও মদনকুমারকে এক রাত্রের জন্য মিলিত করে উভয়ের প্রতি আসক্ত করে দিয়ে আবার পৃথক করে দেয়। একদা মদনকুমার শিকারে যেয়ে কাঠুরিয়াদের সাথে মিশে রাজকন্যা মধুমালার সন্ধান পায়। মধুমালা কাঠুরিয়াবেশী মদনকুমারকে প্রণয় নিবেদন করায় ঘৃণাবশত রাজা তাদের বনবাস দেয়। বনবাসে এক ধরনের ফল খেয়ে মদনকুমার অন্ধ হয়ে যায়। ঠিক এ সময় ইন্দ্রপুরীর দুই কন্যা মধুমালাকে জানিয়ে দেয় মদনকুমারের অন্ধত্বমোচনের কৌশল। একই সাথে শর্ত জুড়ে দেয় বারো বছরের মধ্যে মধুমালা মদনকুমারের দিকে তাকালে পুনরায় মদনকুমার চিরতরে অন্ধ হয়ে যাবে। ফলে মধুমালা তার স্বামীর অন্ধত্ব মোচন করেই পানি খুঁজে আনার ছলে বারো বছরের জন্য বিদায় হয়। এভাবে বারো বছরব্যাপী বহু দুঃখ, বিপদ ও নানা উৎকট পরীক্ষার মধ্যে স্বামী মদনকুমারকে ইন্দ্রপুরীর দুই কন্যার সহযোগিতায় প্রতি ধাপে অলক্ষিতভাবে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করে দুই কন্যার সাথে মধুমালার ইন্দ্রপুরীতে ফিরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে পালা শেষ হয়। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- মধুমালা, মদনকুমার ও ইন্দ্রপুরীর দুই কন্যা।
এ পালাটি ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় নেই।

সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া- গত শতাব্দীর শেষে বঙ্গদেশের পশ্চিম সীমান্তে যে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল তা নিয়ে 'সাঁওতাল হাঙ্গামার ছাড়া'টি রচিত। সাঁওতালরা ছিল শান্তিপ্রিয় ও কৃষিজীবী; কিন্তু কিছু হিন্দু ব্যবসায়ীর অর্থলিপ্সা ও অসাধুতা এবং উদ্ধর্তন শাসনকর্তাদের অসহযোগিতার ফলে তারা প্রচণ্ড বিক্ষব্ধ হয়। ছড়ায় পাওয়া যায় শুভবাবু নামক সর্দারের নেতৃত্বে সাঁওতালরা দলবদ্ধ হয়ে অভিযান করে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়। দলবদ্ধ এ সাঁওতালরা ক্ষিপ্ত হয়ে যে যে স্থানে হামলা করেছিল ছড়ায় তার বিবরণ আছে। ছড়াটি পশ্চিমবঙ্গে রচিত এবং তাড়াহুড়ার কারণে পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে বলে সম্পাদক দীনেশ চন্দ্র সেন পালার ভূমিকায় বলেছেন।
এ পালাটি ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় নেই।

নেজাম ডাকাইতের পালা- এ পালা দুষ্কৃতিকারী নেজাম ডাকাতের সৎসঙ্গ পরিবর্তিত হবার কাহিনী। পার্বত্যাঞ্চলে নেজাম ডাকাত নামে এক ভয়ংকরদেহী ডাকাত বাস করতো। শেখ ফরিদ নামক এক ফকির ঐ বনে নেজাম ডাকাতের কবলে পড়লে সে তার চাহিদামতো টাকা দিত। তবু তার টাকার ঝোলা পূর্ণই থাকতো। এতে নেজাম ডাকাত বুঝল শেখ ফরিদ সাধারণ লোক নন। ফলে সে তাঁর কাছে দীক্ষা

নিল। শেখ ফরিদ নেজাম ডাকাতকে একটি লাঠি দিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে ঐ লাঠির মাথায় বারো বছর তাকিয়ে থাকতে বললেন। বারো বছর অতিবাহিত হলে ঐ লাঠির মাথা থেকে একটা অপরূপ লতা বের হলে সে শেখ ফরিদের সাক্ষাৎ পাবে বলে জানিয়ে বিদায় হলেন। নেজাম ডাকাত শেখ ফরিদের নির্দেশ পালন করতে লাগল। একদিন ঐ জঙ্গলে এক পাহাড়ী সর্দার কন্যা লালবাইকে দেখে কামাসক্তি চরিতার্থ করার জন্য উজীরের ছেলে জব্বর তার হাত ধরে। এতে নবাবের হুকুমে শাস্তিস্বরূপ তার কান কেটে দেওয়া হয়। ক্রমে ভীতা কন্যা লালবাই মৃত্যুবরণ করলে তাকে কবর দেয়া হয় এক মাঠে। কিন্তু জব্বর বন্ধুদের সাথে যুক্তি করে কবর খুড়ে মৃত কন্যাটিকে তুলে মনোবাসনা চরিতার্থের চেষ্টা করে। এদিকে ছয় বছর অতিবাহিত হলে সাধনারত নেজাম ডাকাত এ ঘটনা টের পেয়ে সাধনা ভঙ্গ করে জব্বর ও তার সঙ্গীদের হত্যা করে। এরপরই শেখ ফরিদ নেজাম ডাকাতের সামনে হাজির হন এবং নেজামকে আশ্রয় স্বরূপ এক পরিবারে রেখে আসেন। সেখানে থেকে নেজাম ইষ্ট জপ করত। পরে ঐ পরিবারের সহায়তায় নেজাম ডাকাত আশ্রয়লাভ করে হযরত বড় পীর শাহ সাহেবের। তাঁর সংস্পর্শে নেজাম ডাকাত আউলিয়া হয়ে উঠেন। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- নেজাম ডাকাত, শেখ ফরিদ এবং লালবাই।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'নেজাম ডাকাইতের পালা'টি বন্দনাসহ ৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় ৪৩৮। বন্দন ১টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'নেজাম ডাকাইত- পীরের কেরামতি' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা বন্দনা ছাড়া ৮ এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৫৪২, আমার গণনায়ও তাই। বন্দনা ১টি। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র তিনি বলেছেন ১০৮, কিন্তু তিনি যে ছত্রগুলোর শেষে '+' চিহ্ন দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র প্রকাশ করেছেন, আমার গণনায় তার সংখ্যা ১১৩। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ৭টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ৮টি অধ্যায় সাজিয়েছেন, কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৫৫টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদালি- ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত এ পালায় কেন্দ্রীয় নায়ক চরিত্র ঈশা খাঁর বীরত্বব্যঞ্জকতা, প্রজাবৎসলতা, মহানুভবতা প্রভৃতি গুণের সমন্বয় দেখাতে গিয়ে ঈশা খাঁর পূর্ব পুরুষদিগের পরিচয় এবং তাঁর পিতা মাতার বা কালিদাস (পরে সোলেমান) ও মমিনা খাতুনের প্রণয় ঘটনা বর্ণিত হয়েছে প্রথমাংশে। গাথার মুখ্য উপজীব্য প্রেম হলেও নায়ক ঈশা খাঁর উত্তরাধিকার নির্ণয়, দিল্লীর বাদশাহ আকবরের প্রাপ্য নির্দিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত অর্থের দাবী ঈশা খাঁ মানতে অসম্মত হলে তার বিরুদ্ধে ঈশা খাঁর বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ, কেদার রায়ের বোন সুভদ্রাকে অপহরণ করে মুসলিম বানিয়ে ঈশা খাঁর বিয়ের কারণে কেদার রায়ের প্রতিহিংসা এবং যুদ্ধের বর্ণনাই গাথায় বর্ণিত হয়েছে। কেদার রায়ের হিন্দু বোন সুভদ্রা ঈশা খাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে মুসলমান হলে নিয়ামতজান নাম ধারন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাদের সন্তান রূপে জন্ম হয় দুই পুত্র- আদম ও বিরাম। এর পর ঈশা খাঁর মৃত্যু হলে কেদার রায়ের প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্য ঈশা খাঁর পিতৃহীন দুই পুত্রকে কারারুদ্ধ করা, অতপর ঈশা খাঁর বাহিনী কর্তৃক দুই পুত্রকেই উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ এবং কেদার রায়ের দুই কন্যা কর্তৃক তাদের উদ্ধার করে বিয়ের আয়োজন চলে। কিন্তু দুই ভাই আদম ও বিরামের এ বিয়ে অস্বীকারের মধ্য দিয়ে পালা শেষ হয়। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- ঈশা খাঁ, সুভদ্রা (নিয়ামতজান) এবং কেদার রায়।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'দেওয়ান ইশা খাঁ মসনদালি' পালাটি ১১টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় দিশাসহ ৮৬৫। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'দেওয়ান ইশা খাঁর কেচ্ছা' নামে মুদ্রিত এক পুস্তিকা অবলম্বনে 'দেওয়ান ইশা খাঁর পালা' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৭ম খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যাও ১১, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় দিশাসহ ৮৫১। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র আমার গণনায় ৪। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৫৬টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

সুরৎ জামাল ও অধুয়া- বানিয়াচঙ্গে আলাল খাঁ ও দুলাল খাঁ নামে দু'ভাই দেওয়ানগিরি করত। একদা এক গণক আলাল খাঁকে জানাল সে সুদর্শন এক পুত্র লাভ করবে, তবে জন্মের বিশ বছরের মধ্যে কেউ তার মুখদর্শন করলে অপরিসীম দুঃখ ভোগ করতে হবে। ফলে গণকের কথামত আলাল খাঁ সন্তানসম্ভবা স্ত্রী ফাতেমা বিবিকে হাইলাবনে বিশ বছরের জন্য নির্বাসিত করলেন। অতিদুঃখে আলাল খাঁ ছোট ভাই দুলাল খাঁকে বিশ বছরের জন্য দেওয়ানগিরি দিয়ে মক্কায় চলে যান ফকির বেশে। এদিকে ফাতেমা বিবি জামাল নামে এক পুত্র সন্তান লাভ করে। একদিন দুলাল খাঁ চলতে গিয়ে বনের মধ্যে একটি সুন্দর বালক দেখে সন্দেহ করে যে এ তারই ভাতিজা ও ফাতেমা বিবির সন্তান। তখন তার গণকের সাবধান বাণী মনে পড়ায় দেওয়ানগিরি অক্ষুণ্ণ রাখতে তেড়া লেংড়াকে দিয়ে ফাতেমা বিবিসহ জামালকে মাটি চাপা দিয়ে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এ ষড়যন্ত্র শুনে বৃদ্ধ উজীরের পরামর্শে সে মাসহ তার পিতার হিন্দু বন্ধু দুবরাজের আশ্রিত হয়। একদিন সে পালিয়ে ছদ্মবেশে হাইলা বনে গিয়ে দেখলো তাদের বাসস্থান ভেঙ্গে তেড়া লেংড়া বসবাস করছে। এরপর পিতৃভিটা বানিয়াচঙ্গে গিয়ে দেখলো চাচা দুলালের অত্যাচার। চাচাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে জামাল ষোলো বছর বয়সে যুদ্ধ বিদ্যা পরিচালনার শিক্ষা নেয়। বিশ বছর বয়সে সে প্রথমে তেড়ালেংড়াকে বন্দি করে বানিয়াচঙ্গে এসে চাচা দুলালকে যুদ্ধে পরাজিত ও পিতৃরাজ্য উদ্ধার করে মাকেও নিয়ে আসে। এদিকে জামালের আশ্রয়দানকারী হিন্দু দুবরাজের কন্যা অধুয়া সুন্দরী জামালকে পছন্দ করে তাকে প্রেমপত্র পাঠায়। কিন্তু দুলাল তা অবগত হয়ে জামালের পিতার কাছে সংবাদ পাঠায় তার পুত্র মুসলমান হয়ে হিন্দু রমণী অপহরণের পরিকল্পনা করছে। ফলে চক্রান্তকারীদের জন্য জামালকে পিতার কুনজরে পড়ে কারারুদ্ধ হতে হয়। এরপর দুবরাজের পরামর্শে বন্দিপুত্র জামালকে পিতা আলাল খাঁ দিল্লীশ্বরের নির্দেশে দিল্লীশ্বরের হয়ে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। যুদ্ধে জামাল মৃত্যুবরণ করল। বৃদ্ধ উজীরের মুখে পিতা আলাল খাঁ তার ভাই দুলালের বিশ্বাসঘাতকতার কথা, দুবরাজের প্রতিহিংসার জন্য পুত্র হারানোর কথা শুনে নিজ ভুল বুঝতে পারলেন। সে দুবরাজের উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে অধুয়াকে ধরে আনালেন তাঁর ঘোড়ার সহিসের সাথে বিয়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু নায়িকা অধুয়া তার পূর্বেই আত্মঘাতিনী হয়। প্রবল পুত্রশোকে পুনরায় আলাল খাঁ দেওয়ানগিরি দুলালকে দিয়ে মক্কায় চলে গেলেন, দুবরাজও কন্যাশোকে মুসলমান হয়ে মক্কায় যাত্রা করে। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- আলাল খাঁ, দুলাল খাঁ, জামাল, অধুয়া সুন্দরী, দুবরাজ এবং বৃদ্ধ উজীর।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'সুরৎ জামাল ও অধুয়া' পালা'টি বন্দনা ছাড়া ১৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় দিশাসহ ৮৩৬। বন্দনা ১টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'ছুরত্ জামাল-

অধুয়া সুন্দরী পালা' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা বন্দনা এবং গান আরম্ভ নামক ভূমিকা ছাড়া ২ খণ্ডে ২০টি এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ১০১৭, কিন্তু আমার গণনায় ধুয়াসহ ১০৩১। বন্দনা ১টি এবং গান আরম্ভ নামক ভূমিকা ১টি। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র আমার গণনায় ১৪১। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১৭টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ২ খণ্ডে ২০টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন, কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৭৭টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন বলে ভূমিকায় বলেছেন। কিন্তু পাদটীকার পাঠান্তরগুলো গণনা করে ৭৬টি ছত্রের পাঠান্তর পাওয়া যায়।

ফিরোজ খাঁ দেওয়ান- ঈশা খাঁর বংশধর ফিরোজ খাঁ জঙ্গলবাড়ীতে পূর্বপুরুষের দেওয়ানগিরি করছিলেন। স্বীয় পূর্বপুরুষদিগের গৌরবে গৌরবান্বিত ফিরোজ খাঁ সিদ্ধান্ত নিলেন দিল্লীর বাদশাহকে আর খাজনা দেবেন না। এর মাঝে তার মা তাকে বিয়ের জন্য বললেন। কিন্তু দিল্লীশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিরোধে সে লিপ্ত হতে যাচ্ছে এমনি অবস্থায় পরাজিত হলে তার স্ত্রী দিল্লীশ্বরের হাতে বন্দি হবেন এই যুক্তিতে তিনি বিয়েতে মত দিলেন না। এদিকে এক ছবিওয়ালীর কাছে কেল্লাতাজপুরের দেওয়ান উমর খাঁর সুন্দরী কন্যা সখিনা সুন্দরীর ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। ইতিমধ্যে শিকারের ছলনায় ফকিরের ছদ্মবেশে সখিনাকে দেখেও এলেন। এরপর দরিয়া বান্দীকে দিয়ে ফিরোজ খাঁ দেওয়ান তার ছবি সখিনা সুন্দরীকে পাঠালে সখিনাও তা দেখে অভিভূত হয়। এবার ফিরোজ খাঁ মায়ের কাছে ঐ মেয়েকে বিয়ের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। মা প্রথমে এতে সম্মত হন নি এই কারণে যে উমর খাঁ ছোটজাত বলে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবে; যার ফলে যুদ্ধ হবে অনিবার্য। যুদ্ধে দিল্লীর ফৌজও তাদের বিরুদ্ধে যাবে। কিন্তু পুত্রের প্রবল আগ্রহে অবশেষে মা তার ইচ্ছাকে মেনে নিয়ে প্রস্তাবসহ উজীরকে পাঠালেন কেল্লাতাজপুরে উমরের কাছে। সে প্রস্তাব সত্যিই প্রত্যাখাত হলো এবং উজীরকেও অপমান করা হলো। এ খবর শুনে ফিরোজ খাঁ দেওয়ান উমর খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। যুদ্ধে উমরের পরাজয় হলে তিনি সখিনা সুন্দরীকে জঙ্গলবাড়ীতে বন্দি করে এনে বিয়ে করেন। পরাজিত উমর খাঁ দিল্লীর বাদশাহর কাছে নালিশ জানালে তার নির্দেশে যুদ্ধ ঘোষণা হলো ফিরোজ খাঁ দেওয়ানের বিরুদ্ধে। তিনদিন যুদ্ধ চলার পর ফিরোজ খাঁ আহত হয়ে বন্দি হলেন উমর খাঁর হাতে। নিজ পিতা কর্তৃক স্বামী ফিরোজ খাঁর বন্দির খবর শুনে সখিনা সুন্দরীও পুরুষের ছদ্মবেশে পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল। আড়াই দিনের যুদ্ধে সখিনার কাছে বাদশাহর সৈন্যরা পরাজিত হল এবং পিতা উমর খাঁর কেল্লাতাজপুর ভস্মীভূত হল। এরই মধ্যে সখিনা পিতার বার্তাবাহকের মাধ্যমে জানতে পারল তার স্বামী ফিরোজ খাঁ শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করে তাকে বর্জন ও তালাকনামা পাঠিয়েছে। মুহূর্তে সখিনা সংজ্ঞাহীন হয়ে ভূতলে পড়লে তার পুরুষের ছদ্মবেশ খসে পড়ল এবং সবাই তাকে চিনে ফেলল। কিন্তু ততক্ষণে সে মৃত্যুবরণ করেছে। অবশেষে সখিনার মৃত্যুর জন্য দায়ী তার পিতা উমর খাঁ ও স্বামী ফিরোজ খাঁ দেওয়ানের তীব্র অনুশোচনার মধ্য দিয়ে পালার পরিসমাপ্তি ঘটে। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- ফিরোজ খাঁ দেওয়ান, সখিনা সুন্দরী, ফিরোজ খাঁর জননী, উমর খাঁ এবং দরিয়া বান্দী।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পদনায় *পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা* ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত সর্বশেষ পালা 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' বন্দনাসহ ৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় দিশাসহ ৯৩৫। বন্দনা ১টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান সখিনা বিবির পালা' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা ১৭, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় ধুয়া, দিশাসহ ১২১৯। দীনেশ চন্দ্রের ছত্র থেকে ৭২ ছত্র বাদ দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র আমার গণনায় ৩০৪। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ৮টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ১৭টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন, কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় (৭২+৫২)= ১২৪টি ছত্রে অর্থ-তাৎপর্যে পার্থক্য ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন বলে ভূমিকায় বলেছেন। কিন্তু পাদটীকার পাঠান্তরগুলো গণনা করে ১৩৮টি ছত্রের পাঠান্তর পাওয়া যায়।

দীনেশ চন্দ্র সেনের সম্পাদনায় *পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা* ৩য় খণ্ড ২য় সংখ্যাটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে। এ খণ্ডের মোট ১১টি পালার সবগুলোই ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সংকলন ও সম্পাদনা করে *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। পালাগুলো হলো- মাঞ্জুর মা, কাফেন চোরা, ভেলুয়া, হাতী-খেদা, আয়না বিবি, কমল সদাগর, শ্যামরায়, চৌধুরীর লড়াই, গোপিনী কীর্ত্তন, সুজা-তনয়ার বিলাপ এবং বার তীর্থের গান।

মাঞ্জুর মা- এ গাথার নায়ক বৃদ্ধ মনির একজন বিখ্যাত ওঝা। সে প্রচণ্ড নারীবিদ্বেষী বলে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ও বিয়ে করেনি। নারীদেরকে সে 'নষ্টা', 'অবিশ্বাসী' বলে জেনেছে। একদিন জামালদি ফকির নামে এক ব্যক্তিকে সাপে কাটলে সে বহু চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে ব্যর্থ হয়। অক্ষমতার গ্লাণি নিয়ে জামালদির এতিম শিশুকন্যার দুঃখ কাতর হয়ে বৃদ্ধ মনির ওঝা তাকে নিজ গৃহে এনে আদর করে নাম দেয় মাঞ্জুর মা। তার আশ্রয়ে থেকে ক্রমে সে যৌবনে পদার্পণ করে। মনির ওঝার আলয়ে থাকায় সে একান্তই নিষ্কলঙ্ক বিবেচনায় কারো হাতে স্ত্রী হিসাবে তুলে দিতে সাহস না পেয়ে সে নিজেই তাকে বৃদ্ধ বয়সেও বিয়ে করে। এদিকে তিনদিনের জন্য মনির ওঝা মাঞ্জুর মাকে রেখে দূরে গেলে বৃদ্ধকে বিয়ে করায় অতৃপ্ত যৌবনের হাহাকারে মাঞ্জুর মা তার বাল্যকালের সাথী সমবয়সী যুবক হাছেনের প্রতি অনুরাগী হয়ে তার সাথে গৃহত্যাগী হয়। তিনদিন পর গৃহে ফিরে মনির ওঝা মাঞ্জুর মা কে না পেয়ে বনে জঙ্গলে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে শোকে নদীগর্ভে প্রাণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে গাথা শেষ হয়। গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- মনির ওঝা এবং মাঞ্জুর মা।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'মাঞ্জুর মা' পালাটি ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ছন্দানুযায়ী চরণ হিসাবে ভূমিকায় বলেছেন ৪৭০, কিন্তু আমার গণনায় প্রকৃত ছত্র ২৩৬। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'মণির ওঝা-মাঞ্জুর মাও পালা' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ২য় খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যাও ৬, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ২৪০, আমার গণনায়ও তাই। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র আমার গণনায় ৫। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৩৬টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন বলে ভূমিকায় বলেছেন। কিন্তু পাদটীকার পাঠান্তরগুলো গণনা করে ৩৪টি ছত্রের পাঠান্তর পাওয়া যায়।

কাফেন চোরা- লুধা গাজী নামে এক বাঁশ-বেপারী নিম্ন উপত্যকাবাসী চেউয়া পরীকে অপহরণ করে নিজ গ্রাম গজালিতে নিয়ে আসে। কিছুকাল পরে চেউয়া পরী একটি সন্তান প্রসবকালে মারা যায়। সন্তানের নাম রাখা হয় মনসুর। লুধা গাজীও মারা যায় বাঘের হাতে। কুসঙ্গে পড়ে মনসুর দুর্ধর্ষ ডাকাতে পরিণত হয়। এমনকি মৃত ব্যক্তির কাফন চুরি করে বাজারে বিক্রি করত সে। একদিন রাতে আজিম বেপারীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আয়রা বিবি শ্বশুরালয়ে যাবার সময় মনসুর তার অলঙ্কার ডাকাতি করে। ওদিকে আজিম একদিন স্ত্রী আয়রাকে একা রেখে বেপার করতে দূরে যায়। ডাকাতি করার সময় আয়রাকে দেখে মনসুর তাকে ভুলতে পারেনি। একদিন মনসুর সিঁধ কেটে আয়রার গৃহে প্রবেশ করে তাকে স্পর্শ করতে গেলে আয়রার চিৎকারে পাড়ার লোকজন এসে মনসুরকে বেধড়ক মেরে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে। মনসুর পরে সুস্থ হয়ে দড়ি খুলে পালিয়ে যায়। এদিকে আয়রা বিবি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে অবশেষে মৃত্যুবরণ করে। তাকে কবর দেয় হয় এক মাঠে। মনসুর তার কবরের কাছে যায় কাফন চুরি করতে। এমন সময় সে বেহুশ হয়ে পড়ে এবং স্বপ্নে দেখে যেন আয়রা তাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার পরামর্শ দিচ্ছে। মনসুর তাতে সম্মত হয়। এক রাতে সে ডাকাতি করতে গিয়ে ফজরের ওয়াক্ত হলে নামাজ শুরু করল। সেদিন থেকে মনসুর ডাকাত পীরে রূপান্তরিত হলো। গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- আয়রা, মনসুর, আজিম, লুধাগাজী ও চেউয়া পরী।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'কাফেন চোরা' পালাটি প্রণতি ছাড়া ১৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় ৫১১। প্রণতি ১টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি একই নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা বন্দনা ছাড়া ১১টি এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৫৩৬, কিন্তু আমার গণনায় ৫২৪। বন্দনা ১টি। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র তিনি বলেছেন ১২টি, কিন্তু তিনি যে ছত্রগুলোর শেষে '+' চিহ্ন দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র প্রকাশ করেছেন আমার গণনায় তার সংখ্যা ১৫। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১৩টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ১১টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন। কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি বা কোনো অধ্যায় বাদও দেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ২২টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

ভেলুয়া- শাফলাপুর বন্দরের মালিক মানিক সদাগরের পুত্র আমির সাধু শিকারের উদ্দেশ্যে তেলন্যা নগরে পৌঁছল। সেখানে গাছে বসে থাকা বহু কবুতরের একটি হিরণী কবুতরকে সে তীরে বিদ্ধ করে বসে। কবুতরটি ছিল ঐ নগরেরই ধনী এক সদাগর মনুহরের কন্যা ভেলুয়ার। ভেলুয়ার ছিল যুবক সাত ভাই। বোনের সখের হিরণী কবুতরকে তীরে বিদ্ধ করায় সাত ভাই আমির সাধুকে বন্দি করে কঠিন শাস্তি দিল। শাস্তিতে আমিরের চিৎকার শুনে ভেলুয়ার মা তার কাছে এসে পরিচয় পেয়ে জানতে পারলেন সে হচ্ছে শাফলা বন্দরে তার আপন বোনের পুত্র। ঐ বোনের সাথে তার ছোটবেলায় চুক্তি হয়েছিল যে তার পুত্র হলে নিজ কন্যার সাথে তার বিয়ে দেবেন। তাতে ভেলুয়ার সাত ভাই রাজি হলে উভয়ের বিয়ে হলো। বিয়ে শেষে শ্বাশুড়ীর কাছে বিদায় নিয়ে আমির সাধু স্ত্রী ভেলুয়াসহ নিজ দেশ শাফলা বন্দরে ফিরল। আমির সাধুর বিভলা নাম্নী বিশ বছর বয়সী এক অনূঢ়া বোন ছিল। সে ছিল অত্যন্ত দুষ্ট, খল প্রকৃতির ও ঈর্ষাপরায়ণ। ভেলুয়াকে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর ঐ ভগ্নী বিভলার প্ররোচনায় আমির ভেলুয়াকে রেখে বাণিজ্যযাত্রা করতে বাধ্য হয়। এই সুযোগে একাকী ভেলুয়ার চরিত্রে নানারকম দোষারোপ করে তার

ননদিনী বিভলা তাকে চরম নির্যাতনের সম্মুখীন করে। একদিন কাট্টলী নগরের ভোলা সদাগর বাণিজ্য শেষে ফেরার পথে নদীর ঘাটে পরীসদৃশ কন্যা ভেলুয়াকে দেখে বিস্মিত হয়। সে মাঝি মাল্লা নিয়ে তাকে অপহরণ করে নৌকায় উঠিয়ে কাট্টলী নগরে যাত্রা করে। পথে সে আমিরের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ দিয়ে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। ভেলুয়া সব বুঝতে পেরে ইদ্দত পালনের মিথ্যা সময় নিয়ে নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করে। এদিকে আমির সাধু দেশে ফিরে বোন বিভলার কাছ থেকে ভেলুয়া সম্পর্কে কু-মন্তব্য ও শেষে তার মৃত্যুর খবর জানল। নিজ কৌশলে সব রহস্য বুঝতে পেরে সে প্রচন্ড দুঃখে পাগল বেশে সৈয়দনগর গ্রামে এসে পৌঁছল এবং টৌনা বারই নামে এক সারিন্দাবাদকের কাছ থেকে সারিন্দা বাজানো শিখে সারিন্দা বাজাতে বাজাতে কাট্টলী নগরে গিয়ে উপনীত হলো। ভেলুয়া সারেঙ্গার সুরে ব্যাকুল হয়ে ভোলা সদাগরের বাড়ীর ছাদের উপর এসে আমির সাধুকে দেখে চিনতে পারল। উভয়ের সাক্ষাৎ হলে আমির সাধু কাট্টলী নগরের মুনাপ কাজীর কাছে স্ত্রীর বিস্তারিত ঘটনা জানিয়ে ভোলা সদাগরের বিরুদ্ধে নালিশ করে। এ সুযোগে কাজীও ভেলুয়াকে আত্মসাৎ করার চক্রান্ত করে এবং আমিরকে জোরপূর্বক বিতাড়িত করে। আমিরের কাছে এ সংবাদ পেলে তার বাবা-মা ভোলা সদাগরের কাছ থেকে ভেলুয়াকে উদ্ধারের জন্য সৈন্যসহ রণসাজে কাট্টলী নগরে চলে আসে। উভয় পক্ষের যুদ্ধে ভোলা ও কাজীর পরাজয় ঘটে। এদিকে ভেলুয়া নানা চিন্তায় কাজীর বাড়িতে রোগাক্রান্ত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছে। আমির সাধু তাকে দেশে ফিরিয়ে নিতে নৌকায় তুলে। কিন্তু নৌকা শাফলা বন্দরে পিতার দেশে পৌঁছার পূর্বেই ভেলুয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাগরের পাড়ে দেয়া ভেলুয়ার কবরের পাশেই আমির পাগল হয়ে সারাক্ষণ কাটায়। একদিন রাতে আমির দেখতে পেল সাতটি পরীর সঙ্গে ভেলুয়া উঠে আকাশে চলে গেল। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- ভেলুয়া, আমির সাধু, বিভলা, ভোলা সদাগর এবং মুনাপকাজী।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'ভেলুয়া' পালাটি ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ১১৮৭, কিন্তু আমার গণনায় দিশাসহ ১১৯৪। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধু' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা ২০, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকা বলেছেন ১২৭৪, কিন্তু আমার গণনায় দিশাসহ ১২৪৮। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র আমার গণনায় ৫৫। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১৯টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ২০টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন। কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি বা কোনো অধ্যায় বাদও দেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৫২টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

হাতী-খেদা- এ পালায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ফাঁদে ফেলে হাতী ধরার কৌশল বর্ণিত হয়েছে। এতে কোনো গল্প নেই, কোনো উল্লেখযোগ্য চরিত্রও নেই। হাতীর পরিচয়, অত্যাচার এবং হাতী ধরা সংক্রান্ত নানা তথ্য এর বিষয়বস্তু।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'হাতী-খেদা' পালাটি ১০টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় ধুয়াসহ ৪৪১টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'হাতী-খেদার গান' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশচন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা বন্দনাসহ

১১টি এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় ৪৪৭টি, বন্দনা ১টি। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র তিনি ভূমিকায় বলেছেন নেই, কিন্তু আমার গণনায় ২টি অতিরিক্ত ছত্র পাওয়া গেছে। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১০টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ১১টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন, কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি বা কোনো অধ্যায় বাদও দেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৫৮টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

আয়না বিবি- এ গাথায় নায়ক মামুদ উজ্যাল বিধবা মায়ের সংসারের দারিদ্র্য ঘুচাতে বাণিজ্য যাত্রার পথে ঘটনাচক্রে নায়িকা আয়নার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং উভয়ের ভাববিনিময় ঘটে। বাণিজ্য শেষে মামুদ উজ্যাল আয়নার গৃহে উপস্থিত হলেও আয়নার সাক্ষাৎ সে পায়নি। ভিক্ষুকের বেশে খুঁজতে খুঁজতে একদিন সে আয়নার সাক্ষাৎ পেয়ে যায় এবং তাকে নিয়ে নিজের দেশে ফিরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিছুদিন গত হলে সে পুনরায় বাণিজ্য-যাত্রায় উদ্যোগী হয়। কিন্তু বাণিজ্য থেকে সহযাত্রীদের কেউ কেউ ফিরলেও মামুদ উজ্যাল নৌকাডুবির কারণে ফিরল না। ফলে গোপনে আয়না স্বামী-সন্ধানে গৃহত্যাগী হয়। পরে সুখী দাম্পত্য জীবনের আশায় সে জীবিত স্বামীকে নিয়ে গৃহে ফিরতে পারলেও সামাজিক চাপে অসতীর মিথ্যা অভিযোগে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে হয় আয়নাকে। এদিকে মামুদ উজ্যাল পুনর্বিবাহ করে সংসার শুরু করে। দীর্ঘ তিন বছর পর কুরুঙ্গিয়া দলের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে আয়না স্বামীর গৃহে এসে দেখতে পায় স্বামীর নতুন ঘর-সংসার। আশাহতা আয়না শেষ পর্যন্ত জীবন বিসর্জন দেয় নদীতে ডুবে। মামুদ উজ্যালও তার শোকে পাগল হয়ে গৃহত্যাগী হয়। গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্র- আয়না ও মামুদ উজ্যাল।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় আয়না বিবি পালাটি ১১টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৫১১টি, কিন্তু আমার গণনায় দিশাসহ ৫১৫টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি একই নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ১ম খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশচন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা ১৫টি, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৭৫২, কিন্তু আমার গণনায় ধুয়া, দিশাসহ ৭৪৯টি। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র তিনি বলেছেন ২৩৩টি, কিন্তু তিনি যে ছত্রগুলোর শেষে '+' চিহ্ন দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র প্রকাশ করেছেন, আমার গণনায় তার সংখ্যা ২৪০টি। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১১টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ১৫টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন, তবে শুধু ১০ম এবং ১১শ অধ্যায়দ্বয় নতুন সংযোজন করেছেন যা দীনেশ চন্দ্রের সংকলনে ছিল না। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনা ১৩৯টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

কমল সদাগর- কাঁইচা নদীর পাড়ে বাসন্তী নগরে সুবিশাল বাগান বাড়ীতে সম্পদশালী কমল সদাগরের বসবাস। রূপে-গুনে অদ্বিতীয়া সুরঙ্গিনী তার প্রথমা স্ত্রী। চানমণি ও সূর্যমণি নামে তাদের দুটি সন্তান। সুরঙ্গিনীর অকাল মৃত্যুকালে সে দুই পুত্রের দায়িত্ব দিয়ে যায় বাড়ীর বিশ্বস্ত পরিচারিকা মইফুলাকে। পরবর্তীকালে প্রতিবেশী গোবর্দ্ধন ও অন্যান্যদের পরামর্শে কমল সদাগর দ্বিতীয় বিয়ে করে ধর্মমণির কন্যা সোনাইকে। কিন্তু তার আকাঙক্ষা নিবৃত্তিতে কমল সদাগর ব্যর্থ হওয়ায় সোনাই আসক্ত হয়ে পড়ে গোবর্দ্ধনের প্রতি। কৌশলে সোনাই কমল সদাগরকে বাণিজ্যে পাঠিয়ে গোবদ্ধনের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে

লিপ্ত হয়। এ অবস্থায় সোনাই সতীন পুত্রদ্বয়কে তাদের প্রণয়ে বাধা বিবেচনা করে তাদেরকে হত্যার জন্য নিযুক্ত করে দুশ্চরিত্র মাণিককে। কিন্তু পরিচারিকা মইফুলার সহায়তায় তাদের জীবন রক্ষা পায়। ঘটনাক্রমে চানমণি দক্ষিণ দেশের রাজা হয়ে যায়। আর সূর্যমণি আশ্রয়লাভ করে এক মেছোনীর গৃহে। এদিকে দীর্ঘ বারো বছর পর কমল সদাগর নিজ গৃহে ফিরে সোনাইর সব অপকর্ম বুঝতে পারে। অবশেষে দুই পুত্র ও পিতার মিলন ঘটে। সোনাইর অপকর্মের জন্য কমল সদাগর সোনাইকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে এবং নিজেও আত্মঘাতী হতে গেলে পুত্ররা বাধা দেয়। সবশেষে দুই পুত্র পিতাকে নিয়ে চানমণির নতুন রাজ্যে যায় এবং সেখানে তারা দাসী মইফুলারও সন্ধান পায়। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- সুরঙ্গিনী, কমল সদাগর, সোনাই, মইফুলা, মাণিক এবং গোবর্দ্ধন।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় ‘কমল সদাগর’ পালাটি বন্দনা ছাড়া ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৯৩২টি, কিন্তু আমার গণনায় ৮৭২টি। বন্দনা ১টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি ‘কমল সদাইগরের পালা’ নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশচন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা বন্দনা ছাড়া ২১টি এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ১০৮৪টি, আমার গণনায়ও তাই। বন্দনা ১টি। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র তিনি বলেছেন ২২০টি, কিন্তু তিনি যে ছত্রগুলোর শেষে ‘+’ চিহ্ন দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র প্রকাশ করেছেন, আমার গণনায় তার সংখ্যা ২১০টি। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১৯টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ২১টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি বা কোনো অধ্যায় বাদও দেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ১০২টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন বলে ভূমিকায় বলেছেন, কিন্তু পাদটীকার পাঠান্তরগুলো গণনা করে ১০০টি ছত্রের পাঠান্তর পাওয়া যায়।

শ্যামরায়- রাজপুত্র শ্যামরায় এক বিবাহিতা ডোমনীর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পিতা-মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সাথে ভিন্নদেশে চলে যায়। সেখানে গাবর-গোষ্ঠীর বসবাস। তার মধ্যেই সে ডোমের জীবিকা নিয়ে স্বীয় শ্রমের উপার্জন দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। এদিকে গুপ্তচর মারফত গাবর রাজা ডোমনীর আগমনের খবর শুনে রূপলালসাবশত তাকে অপহরণ করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে শ্যামরায় নিজ দেশে ফিরে ডোমনীকে উদ্ধারকল্পে গাবর রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আয়োজন করে। যুদ্ধে গাবর রাজার পরাজয় ঘটলেও শ্যামরায় বিষাক্ত তীরের আঘাতে নিহত হয়। মৃত শ্যামরায়ের সঙ্গে ডোমনীর সহমরণ-যাত্রার মধ্য দিয়ে গাথার সমাপ্তি। গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- শ্যামরায়, ডোমনী এবং গাবর রাজা।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় ‘শ্যামরায়’ পালাটি ১০টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় দিশাসহ ৪০০টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি ‘শ্যামরায়ের পালা’ নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ১ম খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশচন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা ৮টি, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ধুয়া, দোয়ারকি ছাড়া ৪১২টি, কিন্তু আমার গণনায় ধুয়া, দোয়ারকিসহ ৪৩১টি। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র তিনি বলেছেন ১৬টি, কিন্তু তিনি যে ছত্রগুলোর শেষে ‘+’ চিহ্ন দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র প্রকাশ করেছেন, আমার গণনায় তার সংখ্যা ১৩টি। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১০টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ৮টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন, কোনো নতুন

অধ্যায় সংযোজন করেননি বা কোনো অধ্যায়কে বাদও দেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৩৪টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন ।

চৌধুরীর লড়াই- রাজচন্দ্র চৌধুরী রঙ্গমালা নামক নীচু জাতের নারীর প্রেমে পড়ে ভয়ানক জ্ঞাতি-বিরোধ সৃষ্টি করেন। কুৎসিৎ, কদাকার রামগাছিয়া নরের সাথে আপ্তা নরের কন্যা রঙ্গমালার বিয়ে হলেও রঙ্গমালা তার সংসার করেনি। এমনি অবস্থায় বাবুপুরের জমিদার বংশের পুত্র রাজচন্দ্র চৌধুরী তার পরমা সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও শ্যামপ্রিয়া নাম্নী এক বৈষ্ণবীর মুখে রঙ্গমালার রূপের প্রশংসা শুনে তার প্রতি আসক্ত হন এবং প্রণয়ের প্রস্তাব করেন। রঙ্গমালার পিতার ইচ্ছায় বিশাল এক দীঘি খনন করান এবং রামগাছিয়ার বাড়ীর কাছে এক প্রকাণ্ড নহবৎখানা উঠান রাজচন্দ্র। রাজচন্দ্র-রঙ্গমালার এ অসম সম্পর্কে দুঃখিত হন রাজচন্দ্রের চাচা রাজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী। এদিকে চাচাকে রঙ্গমালার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলে রঙ্গমালার প্রতিপত্তি ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে বিবেচনা করে রাজচন্দ্র ভৃত্য ও সেনাপতি রামভাণ্ডারীকে দিয়ে নিমন্ত্রণপত্র পাঠান। এতে রাজেন্দ্র নারায়ণ ভীষণ ক্ষিপ্ত হন এবং কৌশলে রাজচন্দ্রকে তার গৃহে আনিয়ে ভাঙের সরবৎ পান করিয়ে নিদ্রামগ্ন করে রাখেন। এই সুযোগে নিচু জাতের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করার অপমানের প্রতিশোধ নিতে রাজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর সেনাপতি চাঁদভাণ্ডারী রঙ্গমালাকে হত্যা করে তার পিতার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ছিন্নমস্তক নিয়ে বাবুপুর ফিরে আসে। এর প্রতিক্রিয়ায় রাজচন্দ্র চাচা রাজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর কাছ থেকে জমিদারীর নিজের অংশ পেতে নিকটবর্তী বড় জমিদার ইঙ্গা চৌধুরীর সাথে পরামর্শের জন্য তার বাড়ীতে যান। ইতোমধ্যে এক গভীর রাতে চাঁদভাণ্ডারী ইঙ্গা চৌধুরীকে বধ করে এবং তার তিন পুত্রবধুর সঙ্গে যুদ্ধে চাঁদভাণ্ডারীর পালিয়ে আসার মধ্য দিয়ে পালা শেষ হয়। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- রঙ্গমালা, রাজচন্দ্র, রাজেন্দ্র নারায়ন, শ্যামপ্রিয়া, রামভাণ্ডারী এবং চাঁদভাণ্ডারী।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'চৌধুরীর লড়াই' পালাটি বন্দনা ছাড়া ৬টি খণ্ডে ৪২টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় ধুয়াসহ ২৮৪৯টি। বন্দনা ২টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশচন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা ৩১টি, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৩০০২টি; কিন্তু আমার গণনায় ধুয়াসহ ২৯৯৬টি। দীনেশ চন্দ্রের ছত্র থেকে ১২৫ ছত্র বাদ দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র আমার গণনায় ২৩৮টি। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ৪২টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে কোনো খণ্ড ভাগ ছাড়া ৩১টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন, কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি বা কোনো অধ্যায় বাদও দেননি। শুধু বন্দনা ২টি বাদ দিয়েছেন। দীনেশ চন্দ্র তার পালায় ১১টি স্থানে কাহিনী গদ্যে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ক্ষিতীশ চন্দ্র কোথাও গদ্যে বর্ণনা করেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ১৫২টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন বলে ভূমিকায় বলেছেন; কিন্তু পাদটীকার পাঠান্তর গুলো গণনা করে ১৫৬টি ছত্রের পাঠান্তর পাওয়া যায়।

গোপিনী-কীর্ত্তন- এ পালায় কৃষ্ণ ও রাধার প্রণয়লীলা প্রধান। পিতা বসুদেব ও মাতা দৈবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মলাভ করে। একদিন ব্রজের রাখালেরা কৃষ্ণকে গোচারণলীলার উদ্দেশ্যে মাতার কাছ থেকে

নিয়ে যায়। এতে যশোদা রাখালদের সাবধান করে দেয়। রাখালদের সাথে বনে ধেনু চরাতে গিয়ে খেলতে খেলতে কৃষ্ণ কালিদহে পড়ে যায় এবং কালিনাগের মাথায় চড়ে নৃত্য করে। নাগপত্নীগণ এতে আনন্দ পায়। রাধার সঙ্গলাভের জন্য কৃষ্ণ একদিন মথুরার পথে যমুনাঘাটে খেয়ামাঝির বেশে অবস্থান করে। পার হয়ে ফেরার পথে রাধা কৃষ্ণকে দেহদানের আশ্বাস দেয়। পরে নিকুঞ্জ বনে রাধা-কৃষ্ণের মিলন হয়। এতে রাধা সমাজে কলঙ্কিনী আখ্যা পায়। কৃষ্ণ রাধার কলঙ্ক মোচন করতে গিয়ে ব্রজকন্যাদের কারণে নৃত্য করতে বাধ্য হয়। নৃত্য করতে করতে সে মূর্ছা যায় এবং এতে সকলে ক্ষুব্ধ হয়। বৈদ্য সুস্থ করতে এসে শর্ত দেয় যে কোনো সতী রমনী যদি ফুটো কলসে পানি ভরে এনে কৃষ্ণকে তা ছিটিয়ে দিতে পারে তবে সে সুস্থ হবে। রাধা কৃষ্ণের প্রতি আত্মনিবেদন করে ছিদ্র কলসে জল আনতে যায় এবং একই সঙ্গে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে কেশ- সেতুও পার হয়। ফুটো কলসে পানি এনে কৃষ্ণের দেহে তা ছিটিয়ে দিলে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। এতে রাধার কলঙ্কভঙ্গও হয়। শ্রীকৃষ্ণের জয় ঘোষণা করে গাথা শেষ হয়। গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- কৃষ্ণ, রাধা, ব্রজরাখাল, যশোদা এবং বৈদ্য।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'গোপিনী-কীর্ত্তন' পালাটি বন্দনা ছাড়া ২০টি শিরোনামে ২০টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় দিশাসহ ৯৮৯টি। বন্দনা ১টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'মহিলা কবি সুলার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশচন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা বন্দনাসহ ১১টি এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ১০৫৭টি, কিন্তু আমার গণনায় ধুয়া, দিশাসহ ১০৮১টি। বন্দনা ১টি। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র তিনি বলেছেন ১২৪টি, আমার গণনায়ও তাই। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ২০টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ১১টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন, কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি বা কোনো অধ্যায় বাদও দেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনা ৭৮টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

সুজা-তনয়ার বিলাপ- এই ক্ষুদ্র গাথাটি মোগল সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজার কন্যার বিলাপোক্তিতে পূর্ণ। সম্পাদক দীনেশ চন্দ্র সেন প্রদত্ত পালার ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, আরাকান-রাজ সুধর্ম দিল্লী থেকে বিতারিত ও আরাকানে আশ্রিত শাহ সুজাকে তার পত্নী ও এক কন্যাসহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করে হত্যা করেন। পরে সুজার ধনভাণ্ডার লুট করে তার অপর এক কন্যাকে বলপূর্বক নিজ অন্তঃপুরে বন্দি করে রাখেন। গাথায় সুধর্মের অন্তঃপুরে বর্বর পরিবেশে সেই কন্যার দুর্দশার চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'সুজা-তনয়ার বিলাপ' পালাটির কোনো অধ্যায় ভাগ নাই এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় ধুয়াসহ ৪২টি। কোনো বন্দনা নাই। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক হুবহু দীনেশ চন্দ্রের এ পালাটিই সংকলন করে একই নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। তিনি নিজে এপালার কিছু সংগ্রহ করতে পারেননি। ক্ষিতীশচন্দ্রের পালায়ও কোনো অধ্যায়ভাগ নেই এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় ধুয়া সহ ৪২টি।

বার তীর্থের গান- পালায় দুইটি মাতৃ আজ্ঞা পালনের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। রাজা ভগদত্তের বৃদ্ধা মাতার ইচ্ছা হয়েছিল বারতীর্থে স্নান করে পূন্য সঞ্চয়ের মাধ্যমে সমস্ত পাপমুক্ত হবেন। কিন্তু পুত্র ভগদত্ত বুঝতে পারলেন যে বৃদ্ধা মাতার পক্ষে বারতীর্থে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই রাজা ভগদত্ত ছোটভাই রামচন্দ্রকে রাজ্যের দায়িত্ব দিয়ে মাতার মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য নিজেই বারতীর্থে চললেন। যাবার সময় ছোটভাইকে বলে গেলেন একটি পুকুর তৈরি করে রাখতে। তীর্থজল সংগ্রহ শেষে ভগদত্ত নিজ দেশে ফিরে সেই জল পুকুরে ঢেলে মাতার পূন্য-স্নানের ব্যবস্থা করেন। সোনা, রূপা, গরু, বস্ত্র, কড়ি দান করে মাতা পূন্যস্নান সমাপন করেন। এরপর মাতার মনে বাসনা জাগে যে এক নড়া সূতার সমান দীঘি খনন করে দিতে হবে। দীর্ঘ সূতার মাপে দীঘি খনন করতে গিয়ে রাজ্যক্ষয়ের আশঙ্কা সত্ত্বেও রাজা ভগদত্ত মাতার শেষ বাসনাও পূর্ণ করেন। দীঘিটির নাম হয় 'সূতা নড়ার দীঘি'। এরপরই ভগদত্তের মাতার মৃত্যু ও ক্রমান্বয়ে রাজ্য হারানোর মধ্য দিয়ে পালা শেষ হয়। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- ভগদত্ত, মা ও রামচন্দ্র।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় '*পূর্ববঙ্গ গীতিকা* ৩য় খণ্ড ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত সর্বশেষ পালা 'বার তীর্থের গান' এর কোনো অধ্যায় ভাগ নেই এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় ২৩৪টি। কোনো বন্দনা নেই। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'বার তীর্থের গান' বা 'রাজা ভগদত্তের পালা' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালারও কোনো অধ্যায়ভাগ নেই এবং ছত্রসংখ্যা আমার গণনায় ২৩৬টি। কোনো বন্দনা নেই। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র আমার গণনায় ২টি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৪১টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

দীনেশ চন্দ্র সেনের সম্পাদনায় *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* ৪র্থ খণ্ড ২য় সংখ্যাটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। এ খণ্ডের মোট ২০টি পালার মধ্যে ১৫টি পালা ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সংকলন ও সম্পদনা করে *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। পালাগুলো হলো- নছরমালুম, শীলাদেবী, রাজা রঘুর পালা, নুরন্নেহা ও কবরের কথা, ভারইয়া রাজার কাহিনী, আন্ধা বন্ধু, বগুলার বারমাসী, চন্দ্রাবতীর রামায়ণ, সন্নমালা, বীরনারায়ণের পালা, রতন ঠাকুরের পালা, পীর বাতাসী, মলয়ার বারমাসী, জীরালনী এবং পরীবানুর হাঁহলা।

নছর মালুম- নায়ক নছর মালুম শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে মামা হায়দরের গৃহে আশ্রয় পায়। হায়দরের একমাত্র কন্যা আমিনা খাতুন বাল্যকাল থেকেই নছরের সঙ্গী। মামা আমিনার সঙ্গে নছরের বিয়ে দেন। এরপর অর্থোপার্জনের জন্য নছর বিদেশ গিয়ে ছয় বছরেও আর ফিরে না। এদিকে ধনী এছাক আমিনার প্রতি হৃদয় দৌর্বল্য প্রকাশ করে এবং তাকে পেতে আমিনার পিতাকে বুধা গুণীনের সহায়তায় হাত করে। এখবর জানতে পেরে আমিনা পিতৃগৃহ ত্যাগ করে ইলসাখালীর গফুরের বাড়ী আশ্রয় নেয়। এদিকে গৃহত্যাগী নছর চট্টগ্রাম বন্দরের রুম-এর জাহাজের লস্কর থেকে মালুমের পদে উন্নীত হয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে দক্ষিণের অঙ্গী শহরে গিয়ে ব্যবসা শুরু করে। এখানেই নছর মাফো মাতব্বরের কন্যা এখিনের প্রেমে পড়ে বিয়ে করে। পরে নছর মাফোর অনুরোধে লাখ্যা শুটকি সংগ্রহের জন্য পরীদিয়া

দ্বীপে যায়। সেখান থেকে শুটকি বোঝাই করে নছর আমিনার খোঁজে আসে। হাটের লোকদের কাছে সে জানল দুশ্চরিত্রা আমিনা সব ফেলে অন্যত্র চলে গেছে। ফলে মনক্ষুণ্ন হয়ে নছর পুনরায় বাণিজ্য যাত্রার সিদ্ধান্ত নিল। প্রচণ্ড ঝড়ে তাদের বাণিজ্য জাহাজ গোবধ্যার চরে ঠেকে গেলে তারা হার্মাদ দস্যুদের কবলে পড়ে। দস্যুরা নছরকে ক্রীতদাস হিসাবে যার কাছে বিক্রি করে সে তাকে একটি ছোট নৌকায় হাটবাজার বয়ে আনার কাজ দেয়। এদিকে এছাক যখন জানল আমিনা গফুরের কাছে আশ্রয় পেয়েছে সে তখন আমিনার মায়ের সহযোগিতায় আমিনাকে চুরি করে নিয়ে আসে। অপরপক্ষে নছর মালিকের নৌকা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় হাট করার এক ফাঁকে নিজ দেশের উদ্দেশ্যে পলায়ন করে। সমুদ্রের প্রচণ্ড ঝড়ে নৌকা বিপদে পড়লে জেলেরা তাকে উদ্ধার করে এক ব্যক্তির কাছে জিম্মা রাখে। অঙ্গী শহরের মাফো নছরের দীর্ঘ অনপস্থিতিতে নছরের সব জিনিসপত্র বিক্রি করে এখিনকেও অন্যত্র বিয়ে দেয়। নছর জিম্মাদারের কাছ থেকে ফিরে গিয়ে দেখে এখিন অন্যের স্ত্রী। তখন সে আমিনার কাছে ফিরে গিয়ে দেখতে পায় দুষ্ট এছাক বলপূর্বক আমিনার সতীত্ব হরণে উদ্যত। নছর আমিনার সতীত্ব রক্ষা করে এবং দীর্ঘদিন পর উভয়ের মিলনের মধ্য দিয়ে পালা শেষ হয়। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- আমিনা খাতুন, নছর মালুম, এছাক এবং মাফো।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'নছর মালুম' পালাটি 'আরম্ভন' নামক বন্দনা ছাড়া ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় ধুয়াসহ ৮৫০টি। 'আরম্ভন' নামক বন্দনা ১টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'আমিনা বিবি ও নছর মালুম' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ২য় খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা বন্দনা ছাড়া ১৭টি এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৯৩৮টি, আমার গণনায়ও তাই। বন্দনা ১টি। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র তিনি বলেছেন ৮৪টি, কিন্তু তিনি যে ছত্রগুলোর শেষে '+' চিহ্ন দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র প্রকাশ করেছেন, আমার গণনায় তার সংখ্যা ৭৭টি। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১৯টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ১৭টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন। কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি বা কোনো অধ্যায় বাদও দেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ২৮টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

শীলাদেবী- জংলী মুণ্ডা ব্রাহ্মণ রাজার দেশে এসে নিজের অসহায় অবস্থা প্রকাশ করলে রাজা তাকে কোটাল নিযুক্ত করে। পাঁচ বছর বিনা পারিশ্রমিকে কর্ম সম্পাদনের পর একদিন মুণ্ডা ব্রাহ্মণ রাজাকে তার সমস্ত পাওনা বাবদ তার সুন্দরী কন্যা শীলাদেবীকে প্রার্থনা করল। এতে ব্রাহ্মণ রাজা অগ্নিশর্মা হয়ে তাকে বন্দি করে আঘাত করার নির্দেশ দিলেন। এক রাতে মুণ্ডা পালিয়ে জঙ্গলে চলে গেল। জঙ্গলে অন্যান্য জংলীদের নিয়ে কামলার বেশে সে ব্রাহ্মণ রাজার গৃহে আক্রমণ চালালে রাজা পরিবার-পরিজনসহ পালিয়ে পরগণার রাজার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। বিপদের কথা শুনে পরগণার রাজা তাকে আশ্রয় দেন। সেখানে পরগণার রাজপুত্র আশ্রিতা রাজকন্যা শীলাদেবীর প্রণয় কামনা করলে কন্যা তার প্রতি পিতার হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধারের শর্ত আরোপ করে। শর্ত শুনে পরেরদিনই লোক লস্করসহ রাজপুত্র ব্রাহ্মণ রাজার শহরে যুদ্ধযাত্রা করে এবং জংলী মুণ্ডা দস্যুকে পরাজিত করে বীরদর্পে নিজ দেশে ফেরে। বিয়ের কথাবার্তা শেষে ব্রাহ্মণ রাজা কন্যাসহ নিজ রাজ্যে ফিরে বিয়ের আয়োজনে উদ্যোগী হন। বিয়ের দিন পুনরায় মুণ্ডার দল ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণ রাজার পুরীতে আক্রমণ চালায় এবং রাজপুত্রকে নিহত

করে। শীলাদেবীও আত্মঘাতিনী হয়। এরপর ব্রাহ্মণ রাজা ত্রিপুরার রাজার শরাণাপন্ন হয়ে মুণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পান। ত্রিপুরা রাজ জংলী মুণ্ডাকে বন্দি করে উপযুক্ত শাস্তি দেন। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- শীলাদেবী, পরগণার রাজপুত্র এবং জংলী মুণ্ডা।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'শীলাদেবী' পালাটির অধ্যায় সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ১৪টি, কিন্তু আমার গণনায় ১২টি, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৫২০টি, কিন্তু আমার গণনায় দিশাসহ ৫২১টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি একই নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা ১৩টি, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৬২৮টি; কিন্তু আমার গণনায় ধুয়া, দিশাসহ ৬২৭টি। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র আমার গণনায় ১২১টি। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১২টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ১৩টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন, কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি বা কোনো অধ্যায় বাদও দেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৬১টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন বলে ভূমিকায় বলেছেন। কিন্তু পাদটীকার পাঠান্তরগুলো গণনা করে ৬৭টি ছত্রের পাঠান্তর পাওয়া যায়।

রাজা রঘুর পালা- *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা* দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যায় বর্ণিত 'কমলা রাণীর গান' পালার বাকী অংশই 'রাজা রঘুর পালা' বলে সম্পাদক দীনেশ চন্দ্র সেন মনে করেছেন। এ পালায় ধার্মিক রাজা স্ত্রী কমলা রাণীর বিয়োগের ফলে দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য দুঃখে কাতর হলে কমলা রাণীকে স্বপ্নে দেখেন। স্বপ্নের নির্দেশনুযায়ী রাজা কমলা দীঘির পারে কুটীর নির্মাণ করেন। শিশু পুত্রকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য রাণী কমলা অলৌকিকভাবে শিশু রঘুনাথকে গোপনে স্তন্যপান করান। এতে পুত্র অতি দ্রুত বেড়ে উঠতে লাগলে রাজার সন্দেহ হলো। তিনি রাণীকে চিরকালের মতো আয়ত্ত করতে গিয়ে ব্যর্থ হন এবং রাণীর শোকে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর পিতৃ-মাতৃহীন শিশুপুত্র রঘুনাথকে পাঁচ বছর বয়সে অমাত্যবর্গ রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। এদিকে জঙ্গলবাড়ীর ঈশা খাঁ তার চিরশত্রু ধার্মিক রাজার মৃত্যু সংবাদে অসহায় ও ক্ষুদ্র রঘুনাথের সুসং রাজ্য আক্রমণ করেন এবং শেষে রঘুনাথকে অপহরণ করে নিজ শহর জঙ্গলবাড়ীতে নিয়ে আসেন। এতে প্রজারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ফলে রাজভক্ত গারোরা অস্ত্রসহ শিশু রাজা উদ্ধারে ধেয়ে যায় ঈশা খাঁর রাজধানী জঙ্গলবাড়ীর দিকে। শিশু রাজাকে অপহরণের আনন্দে যখন জঙ্গলবাড়ী আনন্দিত, সেই সুযোগে তাদের বুদ্ধিমত্তার বলে শিশুপুত্র ও রাজা রঘুনাথকে উদ্ধার করে ঈশা খাঁর নৌকাতেই সুসং রাজ্যাভিমুখে যাত্রার মধ্য দিয়ে পালা শেষ হয়। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- কমলা রাণী, ধার্মিক রাজা, ঈশা খাঁ এবং গারো অধিবাসীগণ।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'রাজা রঘুর পালা'টি ৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় ১৯৮টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি একই নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৭ম খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা ৩টি, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ২১৫টি, কিন্তু আমার গণনায় ২২৯টি। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র আমার গণনায় ২৭টি। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ৮টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ৩টি অধ্যায়ে

সাজিয়েছেন, কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি বা কোনো অধ্যায় বাদও দেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ২০টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

নুরন্নেহা ও কবরের কথা- নায়ক মালেক পিতা নজু মিয়ার মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লে দেওগায়ের আজগরের সহানুভূতি লাভ করে। যদিও আজগরের সঙ্গে মালেকের পিতার বিরোধ ছিল তথাপি নজু মিয়ার মৃত্যুতে সে বিরোধ মিটে গেল। ক্রমে মালেকের সঙ্গে আজগরের কন্যা নুরন্নেহার প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরই মাঝে এক প্রচণ্ড সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে আজগর নিস্ব হয়ে স্ত্রী কন্যাসহ রংদিয়া চরে গিয়ে নতুন করে বসতি স্থাপন করল। জলোচ্ছ্বাসে মালেকও দেওগা ছেড়ে দীর্ঘ এক বছর নানা স্থানে ঘুরে অবশেষে উপস্থিত হলো রংদিয়ায়। সাক্ষাৎ হলো পূর্ব প্রণয়িনী নুরন্নেহার সঙ্গে। মালেক নুরন্নেহাদের গৃহে থাকা অবস্থায় আজগরের গৃহ হার্মাদ জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তারা টাকা-পয়সার সাথে মালেক এবং নুরন্নেহাকেও ধরে নিয়ে যায় তাদের নৌকায়। জেলেদের সহযোগিতায় তারা মুক্তি পেয়ে ফিরে আসে রংদিয়ায়। এভাবে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নুরন্নেহার সঙ্গে মালেকের প্রণয় গভীর হতে লাগল। এ সম্পর্ক জানতে পেরে নুরন্নেহার পিতা আজগর মালেককে গোপনে জানায় যে তার পিতার তালাক দেয়া স্ত্রী অর্থাৎ মালেকের মাকে আজগর বিয়ে করেছে এবং সেখানেই যেহেতু নুরন্নেহার জন্ম, তাই মালেক ও নুরন্নেহার সম্পর্ক সৎ ভাই-বোনের। কাজেই তাদের বিয়ে শাস্ত্রমতে অনুচিত। এ কথায় মালেক গভীর দুঃখে মাল্লাগিরির কাজ নিয়ে দূরে চলে যায়। এদিকে বসন্তরোগে একে একে আজগর, আজগরের স্ত্রী এবং নুরন্নেহার মৃত্যু হয়। পাঁচ বছর পর প্রভুত অর্থ আয় করে মালেক রংদিয়ায় ফিরে যখন তার প্রণয়ীর মৃত্যুসংবাদ শুনে তখন সে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। নুরন্নেহার কবরে আছড়ে পড়ে সে বিচ্ছেদ-বেদনায় পাগল হয়ে যায়। গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- মালেক, নুরন্নেহা এবং আজগর।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'নুরন্নেহা ও কবরের কথা' পালাটি বন্দনাসহ ১৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৬৩২টি, কিন্তু আমার গণনায় ধুয়াসহ ৬২১টি। বন্দনা ১টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'কবরের কান্না' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা বন্দনা ছাড়া ১৪টি এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৬৬৮টি, কিন্তু আমার গণনায় ধুয়াসহ ৬৭২টি। বন্দনা ১টি। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র আমার গণনায় ৩৩টি। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১৩টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ১৪টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন, কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি বা কোন অধ্যায় বাদও দেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ১৪টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

মুকুট রায়- এ গাথায় শিলুই রাজার সুদর্শন পুত্র মুকুট রায়ের বয়স বিশ বছর পূর্ণ হলে পিতা তার বিয়ের ব্যাপারে উদ্যোগী হলেন। রাজার নির্দেশ মতো লস্করদের আনা কোনো পাত্রীকেই সে পছন্দ করতে না পারায় রাজা তার উপর অসন্তুষ্ট হন। রাজার নির্দেশে মুকুট রায় ঘোড়ায় চড়ে পাত্রী সন্ধানে বের হয়ে এক ভয়ংকর বনে চলে আসে এবং তার নির্দেশে সঙ্গীরা তাকে ফেলে চলে যায়। সবাই চলে গেলে মুকুট রায় গহীন বনে চলতে চলতে এক হীরামন তোতা দেখে তার পিছু পিছু গিয়ে গাছের পাতা ও বাকল পরিহিত এক সুন্দর ব্যাধ কন্যাকে খুঁজে পায়। উভয়ে উভয়কে পছন্দ করে ফেলল। ব্যাধ কন্যা মুকুট রায়কে

জানাল তার ব্যাধ-বাবা যাকে দেখে তাকেই তীরবিদ্ধ করে মেরে ফেলে। তাই সে মুকুট রায়কে লুকিয়ে রাখে। একদিন সুযোগ বুঝে ব্যাধ কন্যাকে নিয়ে মুকুট রায় পালিয়ে এলো নিজ দেশে। পিতা শিলুই রাজাসহ সবাই মহাখুশী। এভাবে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখে কাটার এক পর্যায়ে আকস্মিকভাবে দুশমন বনুয়ার নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত তীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করে মুকুট রায়। এতে রাজ্যের সবাই কন্যাকে দোষ দেয় এবং মুকুট রায়ের লাশসহ শিলুই রাজা কন্যাকে সিন্দুকে ভরে ভাসিয়ে দেয়। জেলেদের জালে সেই সিন্দুক ধরা পড়লে তারা তা খোলে এবং মৃতের সাথে জীবিত কন্যাকে দেখে তারা ভয়ে পালিয়ে যায়। মৃত মুকুটকে নিয়ে ব্যাধ কন্যার ক্রন্দনে আল্লাহ বত্রিশ পয়গম্বরকে মুকুট রায়ের জীবন ফিরিয়ে দিতে আদেশ করেন। বত্রিশ পয়গম্বর কন্যার সাথে দেখা করে জানায় যে, নেয়াজা শহরের রাজা কন্যার বাবা। সে যেন তাই তার সাথে দেখা করতে যায়। কন্যা পিতার সাথে দেখা করতে নেয়াজা চলে গেলে তার অনুপস্থিতিতে বত্রিশ পয়গম্বর মুকুট রায়কে জীবিত করে। মুকুট রায় নিজ জীবন ফিরে পেয়ে পত্নীর জন্য উন্মাদ হয়। এদিকে নেয়াজা শহরে ব্যাধ কন্যাও মুকুট রায়ের জন্য অস্থির হয়ে উঠে। দীর্ঘদিন পর শিলুই রাজা আপন পুত্র মুকুট রায়কে ফিরে পেয়ে মহাখুশী। অবশেষে মুর্শীদের সহযোগিতায় মুকুট রায় ও কন্যার মিলন ঘটে আর এ ঘটনায় মুর্শীদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে নেয়াজার রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- মুকুট রায়, ব্যাধ কন্যা এবং শিলুই রাজা।
এ পালাটি ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় নেই।

ভারইয়া রাজার কাহিনী- এ পালাটি শুরু হয়েছে আদিবাসী রাজা ভারইয়া কর্তৃক সুন্দাসেতী নদীর পাড়ে অবস্থিত অন্য রাজ্যভূক্ত একটি অরণ্যকে আবাদী জমিতে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। পাশ্ববর্তী রাজা বীরসিংহ এ খবরে লোকলস্করসহ ছুটে এসে ভারইয়া রাজার বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু ভারইয়া রাজা দলের পরাজয়ের লক্ষণ টের পেয়ে তন্ত্র-মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে রাজা বীরসিংহ বন্দি হয়। খবর পাওয়া মাত্রই বীরসিংহের পুত্র দুধরাজ ছুটল ভারইয়া রাজাকে পরাজিত করে বন্দি পিতাকে উদ্ধার করতে। কিন্তু এবারেও ভারইয়া রাজার তন্ত্রমন্ত্রের গুণে বীরসিংহের পুত্র দুধরাজ বন্দি হয়। একই বন্দিখানায় পিতাপুত্র নিতান্ত মনোকষ্টে দিন কাটাতে থাকে। এক পর্যায়ে বন্দীত্ব মোচনের জন্য কূটনৈতিক কৌশল হিসেবে রাজা বীরসিংহ নিজের পুত্রের জন্য ভারইয়া রাজার কন্যা চম্পাবতীকে গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু বীরসিংহ ভারইয়া রাজার অপমান ভুলতে না পেরে পুনরায় প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে পুত্র দুধরাজকে পাঠায়। এবারও ভারইয়া রাজার তন্তমন্ত্রের কাছে তার পরাজয় ঘটে এবং দুধরাজ বন্দি হয়। ধাইর কাছে হবু স্বামীর বন্দিত্বের খবর শুনে চম্পাবতী মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। চম্পাবতী প্রহরীদেরকে অলঙ্কারাদি উপহার দিয়ে দুধরাজকে মুক্ত করলে দুধরাজ চম্পবতীর কাছে বিদায় নিয়ে নিজ দেশে চলে যায়। রাজা বীরসিংহ তন্ত্রমন্ত্র ও যাদুবিদ্যা শিখে ভারইয়া রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে। যুদ্ধে বীরসিংহের মন্ত্রের কারণে ভারইয়া রাজা পাষাণে পরিণত হয়। ফলে বীরসিংহ ভারইয়ার রাজ্য দখল করে নিলে রাজরানী ও রাজকন্যা চম্পাবতী বীরসিংহ কর্তৃক বিতাড়িত হয় এবং রাজরানী আত্মঘাতিনী ও রাজকন্যা চম্পবতী উন্মাদ হয়ে যায়। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- ভারইয়া রাজা, রাজা বীরসিংহ, দুধরাজ এবং চম্পবতী।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'ভারইয়া রাজার কাহিনী' পালাটি ১৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় ৫২৪টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'ভারইয়া রাজকন্যা চম্পাবতী' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা বন্দনা ছাড়া ১৬টি এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৬২০টি, কিন্তু আমার গণনায় ধুয়াসহ ৬১৮টি। বন্দনা ১টি। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র আমার গণনায় ১১৬টি। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১৪টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ১৬টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন, কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি বা কোনো অধ্যায় বাদও দেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৫৮টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

আন্ধা বন্ধু- সহায়-সম্বলহীন অন্ধ এক ভিখারী মনোমোহিনী সুরে বাঁশী বাজিয়ে রাজার কাছে ভিক্ষা চায়। রাজার একমাত্র কন্যা এ-সংবাদ শুনে তাকে এক পলক দেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তার ইচ্ছা পূর্ণ করা হয়। তিনি অন্ধের বাঁশী শুনে এবং রূপ দেখে তার প্রতি প্রেমাসক্ত হন। রাজাও তার দুঃখ-কষ্টের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে অন্ধকে প্রাসাদে আশ্রয় দিয়ে রাজৈশ্বর্য্য ভোগের অধিকার দেন। রাজা তাকে দায়িত্ব দেন সুন্দর বাঁশী বাজিয়ে তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করতে এবং একমাত্র কন্যাকে বাঁশী বাজানো শেখাতে। অন্ধ খুশি মনেই সে দায়িত্ব পালন করছিল। কিন্তু তার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে রাজকন্যার মনে অনুরাগের জন্ম হলে অন্ধ রাজপ্রাসাদ ও রাজ্য ত্যাগ করে। কারণ তার বিড়ম্বিত জীবনের সঙ্গে রাজকন্যার জীবন যুক্ত হয়ে নষ্ট হোক এটা সে চায় নি। এদিকে রাজকন্যাকে তার পিতা ভিনদেশী এক রাজার সাথে বিয়ে দেন। পিতৃদত্ত এই বিয়েতে রাজকন্যা সম্মত হলেও তার মনে অন্ধের প্রতি সুপ্ত অনুরাগ থেকে যায়। ভিনদেশী রাজার সঙ্গে বসবাসকালীন ঐ দেশে পরিচিত বাঁশীর মন মাতানো সুর ধ্বনিত হলে রাজকন্যা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। দেখতে পায় সেই পুরণো প্রণয়ী অন্ধ বংশীবাদককে। রাজকন্যা সুকৌশলে স্বামীর সংসার ত্যাগ করে অন্ধ বংশীবাদকের কাছে চলে আসে। অন্ধ তাকে স্বামীর সংসারে ফিরে যাবার পরামর্শ দিয়েও যখন ব্যর্থ হয় তখন সে যে বাঁশীর সুরে কন্যা মুগ্ধ ও বিচলিত হয়েছে সে বাঁশীটি নদীতে বিসর্জন দেয়। তাতেও কন্যার মন পরিবর্তন না হওয়ায় অন্ধ নিজেই নদীতে ঝাঁপ দেয়। কন্যাও ঝাঁপ দিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দেয়। গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- অন্ধ বংশীবাদক এবং রাজকন্যা।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'আন্ধা বন্ধু' পালাটি ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় ৫০৭টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি একই নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা ৯টি, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৫৯০টি; কিন্তু আমার গণনায় ধুয়া, দিশাসহ ৬৬৭টি। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র আমার গণনায় ১১৪টি। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ৬টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ৯টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন, কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি বা কোনো অধ্যায় বাদও দেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ২৯টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

বগুলার বারমাসী- নায়িকা বগুলা বাবা-মায়ের পছন্দ করা রাজার পুত্রের সাথে বিয়ে প্রত্যাখ্যান করে বণিক পুত্রকে প্রণয় নিবেদন ও পিতৃ-ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামী হিসাবে তাকে বরণ করে। বণিককুমার এক বছরের জন্য বাণিজ্যে গেলে পিতার পছন্দ করা ও বগুলার প্রণয় বঞ্চিত সেই রাজপুত্র বগুলাকে একাকী

পেয়ে প্রণয় নিবেদন করে। মিথ্যা ব্রতের ছুতা দেখিয়ে বগুলা রাজকুমারকে এক বছরের জন্য নিবৃত্ত রাখে। উভয়ের যোগাযোগ স্থাপিত হয় এক দূতী এবং কবুতরের মারফত পত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে। এক পর্যায়ে ব্যর্থ রাজপুত্র বগুলাকে জানায় যে তার স্বামীর নৌকাডুবিতে মৃত্যু হয়েছে। এরপর বগুলা পত্রের মারফত রাজপুত্রকে জানাল যে সে তার কাছে যাবে এবং এ জন্য যেন সে চৌদোলা পাঠায়। ঘটনাক্রমে সে পত্র বগুলার ননদের হাতে পড়লে সে তার চরিত্রে কলংক আরোপ করে গৃহে বন্দি করে রাখে। এদিকে এক বছর গত হলে বগুলার স্বামী বণিক পুত্র গৃহে ফিরে বগুলার পরপুরুষে নিমগ্ন হওয়ার উপযুক্ত প্রমাণস্বরূপ সেই পত্র পড়ে বগুলাকে বনে নির্বাসন দেয়। বনে নির্বাসনকালে অন্য এক রাজপুত্র বগুলার প্রণয় প্রার্থনা করে। এখানেও বগুলা কৌশলে রাজপুত্রকে জানায় তার ব্রত উদযাপনের কথা। আর এ জন্য একজন সুলক্ষণ সাধুপুত্রের প্রয়োজন বলেও সে জানায়। ফলে রাজপুত্রের হাতে বন্দি হয় বগুলার প্রকৃত স্বামী সাধুর পুত্র বা বণিক পুত্র। এক রাত্রে সাধু পুত্রের সঙ্গে বগুলার পলায়নের মধ্য দিয়ে পালা শেষ হয়। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- বগুলা, সাধুর পুত্র, রাজার পুত্র এবং অপর রাজপুত্র।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'বগুলার বারমাসী' পালাটি ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৪২৭টি, কিন্তু আমার গণনায় ৪২৪টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'সদাগর কন্যা বাগুলা' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ২য় খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা ৮টি, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৬২৭টি, আমার গণনায়ও দিশাসহ তাই। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র তিনি বলেছেন ২০২টি, কিন্তু তিনি যে ছত্রগুলোর শেষে '+' চিহ্ন দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র প্রকাশ করেছেন, আমার গণনায় তার সংখ্যা ১৯২টি। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১৯টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ৮টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন, কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেননি বা কোনো অধ্যায় বাদও দেননি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৪৮টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন বলে ভূমিকায় বলেছেন। কিন্তু পাদটীকার পাঠান্তরগুলো গণনা করে ৪৬টি ছত্রের পাঠান্তর পাওয়া যায়।

চন্দ্রবতীর রামায়ণ- এ গাথায় রামায়ণের গল্প স্থান পেয়েছে। লঙ্কাধিপতি রাবণ একে একে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল জয় করে নেয়। রাবণ পত্নী মন্দোদরী বিষ খেয়ে গর্ভ সঞ্চার করে ডিম্ব প্রসব করলে তা থেকে জন্ম নেয় সীতা। এদিকে অযোধ্যা নগরে রাজা দশরথ ও রাণী কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করে। সীতার বারমাসী বর্ণনায় বনবাসকালীন সময়ে রামের অনুপস্থিতিতে সুযোগ বুঝে লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ রাবণ যোগীবেশে সীতাকে হরণ করে লঙ্কাপুরীতে নিয়ে যায়। রাম এ খবর জানতে পেরে যুদ্ধ করে রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধার করে। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- রাম, রাবণ, সীতা, মন্দোদরী, মাধব জালিয়া, সতা জাল্যানী, রাজা দশরথ, লক্ষণ এবং রাণী কৌশল্যা।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'চন্দ্রাবতীর রামায়ণ' পালাটি ৩টি পরিচ্ছেদে ১৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় ৭৮৯টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'কবি চন্দ্রাবতী দেবী রচিত রামায়ণ' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৭ম খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের

এ পালার অধ্যায় সংখ্যা ৩ খণ্ডে ১৯টি, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় ধুয়াসহ ১৩৬৯টি। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র আমার গণনায় ৫৬৩টি। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১৬টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ১৯টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন, তবে ৩য় খণ্ডের ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম এবং ৯ম এই ছয়টি অধ্যায় তিনি নতুন সংযোজন করেছেন যা দীনেশ চন্দ্রের সংকলনে ছিল না। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ১১০টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

সন্ন মালা- রূপসী নায়িকা সন্নমালা রাজা ও রানীর বহু সাধনার ফলে জন্মগ্রহণ করে। কিছুদিন গত হলে গণকেরা জানায় এ কন্যা অলক্ষ্মীর অংশ এবং এর দ্বারা পিতা-মাতার অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই গণকের নির্দেশ মতো সন্নমালাকে বনবাসে পাঠানো হলো। এদিকে এক সাধু সদাগর দলবলসহ বাণিজ্য যাত্রাকালে ঐ বনের কাছে সপ্তডিঙ্গাসহ চরে আটকে পরে। তারা বনের মধ্যে সন্নমালাকে দেখতে পায় এবং সদাগরের ইচ্ছায় তাকে নৌকায় তুললে নৌকা চড়া থেকে মুক্তি পায়। কন্যা তার সমস্ত ঘটনা সদাগরকে জানালে সে তাকে নিজ দেশে নিয়ে যায়। সাধু সদাগরের বাড়িতে সদাগরের এক পুত্র ছিল। ক্রমে সওদাগর-পুত্রের সাথে সন্নমালার প্রণয় হয়। সন্নমালার রূপের কথা ঐ দেশের সবাই জানল, এমনকি ঐ দেশের রাজকন্যা তার রূপের কথা শুনে তাকে সখীত্বের আমন্ত্রণ জানাল। এভাবে নতুন দেশের রাজকন্যার সাথে সন্নমালার সখীত্ব গড়ে ওঠার সুযোগে সেখানকার রাজপুত্রও অর্থাৎ রাজকন্যার ভাই সন্নমালার প্রতি রূপজ মোহে আকৃষ্ট হয়। অবশ্য ইতোপূর্বেই রাজকন্যা সন্নমালার কাছ থেকে সদাগর পুত্রের সাথে সন্নমালার সম্পর্ক জেনেছিল। সন্নমালাকে লাভের উপায়স্বরূপ রাজপুত্র সর্পমণি এনে দেয়ার বায়না ধরলে সাধু সদাগরের উপর তা খুঁজে আনার ভার পড়ে। পিতার কাছে সন্নমালাকে রেখে সদাগর পুত্র নিজেই ছুটল সর্পমণি খুঁজতে। ব্যর্থ হয়ে সে একদল বাইদ্যাসহ হাজার হাজার সাপ ধরে নিয়ে এল রাজ দরবারে। রাজা ভাবলেন মণিগুলো সদাগর পুত্র গোপন করেছে। তাই ঐ সাপ দিয়েই সদাগর পুত্রকে দংশনের হুকুম হলো। সদাগর পুত্র নিহত হল সাপের কামড়ে। ভেলায় ভাসিয়ে দেয়া হলো সদাগর পুত্রের মৃতদেহ। তারপরও সন্নমালাকে রাজপুত্র নিজের করতে পারেনি। সর্পদংশনে মৃত স্বামী সদাগর পুত্রের সহগামী হয় সে। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্র মাত্র দু'টি- সন্নমালা এবং সদাগর পুত্র।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'সন্নমালা' পালাটি ৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ২৭৮টি; কিন্তু আমার গণনায় দিশাসহ ২৮৭টি, এছাড়া ১১টি জায়গায় কাহিনী গদ্যে বর্ণনা করা আছে। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'সন্নমালার পালা' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৭ম খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা ১০টি, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় ধুয়াসহ ৮৭৫টি, এ ছাড়া ৭টি জায়গায় কাহিনী গদ্যে বর্ণনা করা আছে। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র আমার গণনায় ৫৪৭টি। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ৪টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ১০টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন; তবে ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম এবং ১০ম অধ্যায় সংযোজন করেছেন যা দীনেশ চন্দ্রের সংকলনে ছিল না। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ২৮টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

বীর নারায়ণের পালা- সাধারণ প্রজা রাধারমনের কন্যা ও নায়িকা সোনা সন্ধ্যাবেলা নদীর ঘাটে কলসী ভরতে গিয়ে বৃক্ষতলে নিদ্রিত জমিদার পুত্র বীরনারায়ণকে দেখে তার প্রেমাসক্ত হয়। এ সময় নৌকাযাত্রী এক বিদেশী সাধু নদীর ঘাটে একাকী সোনাকে অসহায় অবস্থায় দেখে তাকে অপরহরণ করে নৌকায় তুলে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু নিজেকে রক্ষার আর্তচিৎকারে ঘুমন্ত জমিদারপুত্র বীরনারায়ণ উঠে সাধুর কবল থেকে তাকে উদ্ধার করে দুই প্রহর রাতে নৌকাসহ নিজঘাটে ফেরে। ক্রমে রাত হতে চললেও সোনা গৃহে না ফেরায় তার পিতা-মাতা চিন্তিত হয়। গ্রামের লোকজন তা অবগত হলে সোনাকে খুঁজতে খুঁজতে ঘাটে এসে বীরনারায়ণসহ উভয়কে নৌকায় দেখে তাদের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে সোনাকে গৃহে স্থান নিতে দেয়নি। বীরনারায়ণ এ ক্ষেত্রে সোনাকে রক্ষণশীল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রতিবেশীদের হাত থেকে রক্ষা করে নিজে বিয়ে করে নৌকায় গৃহত্যাগ করে। জমিদার পুত্র কর্তৃক সোনাকে অপহরণের অপরাধে প্রতিবেশীরা জমিদারের কাছে পুত্রের চরিত্রে দোষারোপ করে তার বিচার করতে বললে জমিদার তাকে ধরে আনতে নির্দেশ দেয়। এদিকে বীরনারায়ণ সোনাকে জীবনসঙ্গিনী করে বনবাসী জীবনযাপন শুরু করে। এক সময় সোনার অজ্ঞাতে জমিদারের লোকজন কর্তৃক ধৃত হয়ে বীরনারায়ণ সোনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে অসম্পূর্ণ গাথার সমাপ্তি ঘটে। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- সোনা, বীরনারায়ণ, সাধু এবং প্রতিবেশীগণ।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'বীরনারায়ণের পালা'টি ১০টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৫৫৭টি; কিন্তু আমার গণনায় ৪৬০টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'কুমার বীর নারায়ণের পালা' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা ১৪টি, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৬৯০টি, কিন্তু আমার গণনায় ধুয়াসহ ৬৮৭টি। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র আমার গণনায় ২৩৪টি। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১০টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ১৪টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন, তবে ১১শ, ১২শ এবং ১৪শ অধ্যায়ত্রয় তিনি নতুন সংযোজন করেছেন যা দীনেশ চন্দ্রের সংকলনে ছিল না। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৮৬টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন বলে ভূমিকায় বলেছেন, কিন্তু পাদটীকার পাঠান্তরগুলো গণনা করে ৮৮টি ছত্রের পাঠান্তর পাওয়া যায়।

মহীপালের গান- 'মহীপালের গান' নামক অতি সংক্ষিপ্ত পালায় রাজা মহীপালের প্রণয়ের আভাস পাওয়া যায়। রাজা মহীপাল নায়িকা লীলার জন্য অনেক দুঃখ ভোগ করেছিলেন। সেই লীলা পিতা-মাতার নিষেধ অমান্য করে মহীপালের কাটা দীঘিতে স্নানের জন্য নামে। এ খবর মহীপালের কাছে পৌঁছামাত্র সে দীঘির পাড়ে এসে স্নানরতা লীলার চুল টেনে ধরে রাখে। পিতা-মাতার নিষেধ অমান্য করার বিপদের ফলে লীলার বিলাপোক্তির মধ্য দিয়ে পালা শেষ হয়। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রদুটি হচ্ছে- লীলা ও রাজা মহীপাল। এ পালাটি ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় নেই।

রতন ঠাকুরের পালা- এ পালায় রাজপুত্র রতন ঠাকুর তাদেরই মালীর হাতে মালী-কন্যার সুগ্রথিত ফুলের মালা দেখে তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয় এবং মালাটি যথাযথ দামে কিনে নেয়। পরে একদিন নদীর ঘাটে মালী-কন্যাকে দেখে তার রূপমুগ্ধ হয়ে প্রণয় প্রার্থনা করে। রাজপুত্র রতন ঠাকুরের একান্ত প্রচেষ্টায় মালী-

কন্যা অবশেষে তার প্রণয় নিবেদনে সাড়া দেয়। তাদের অসম প্রেম সমাজ-বিবর্জিত বুঝতে পেরে এক পর্যায়ে মালী-কন্যা ও রতন ঠাকুর প্রতিকূল আবহাওয়ায় গৃহত্যাগী হয়ে উপস্থিত হয় পাশ্ববর্তী রাজ্য সজিন্তায়। সেখানে উভয়ে মালী ও মালিনী বলে পরিচয় দেয়। এভাবে উভয়ের দাম্পত্য জীবন সুখেই অতিবাহিত হচ্ছিল। ওদিকে দেশে রতন ঠাকুরের খোঁজ পড়লে লোকজন খুঁজতে খুঁজতে জানল সজিন্তা দেশের মালী-মালিনীই রতন ঠাকুর ও মালী-কন্যা। রতন ঠাকুরের পিতা এ খবর জানতে পেরে পুত্রের মন থেকে মালী-কন্যার প্রতি অনুরাগ দূরীভূত করতে রঙ্গিলা নাম্নী এক গণিকা নিযুক্ত করে আশ্রিত রাজ্য সজিন্তায় পাঠায়। এ খবর সজিন্তার রাজা জানতে পারলে তিনিই প্রথম গ্রাহক হন রঙ্গিলা গণিকার। রাজা তাকে যে মালাটি দিয়ে সন্তুষ্ট করেন রঙ্গিলা সেই মালাকরকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার আগ্রহ প্রকাশ করলে পরদিনই রতন ঠাকুর তার সাথে সাক্ষাৎ করে। রতন ঠাকুর রঙ্গিলার রূপে মুগ্ধ হলে রঙ্গিলা সেই সুযোগে রতন ঠাকুরকে নিয়ে তার পিতার কাছে ফিরে আসে। সজিন্তার রাজা এ সংবাদে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে রতন ঠাকুরের প্রণয়িণীকে তার অন্দরে বন্দি করতে হুকুম দেন। রতন ঠাকুরের অবর্তমানে সজিন্তার রাজার হুকুমে তার অন্তঃপুরবাসিনী হওয়ার আত্মধিক্কারে মালী-কন্যা আত্মবিসর্জন দেয়। এদিকে রতন ঠাকুর রঙ্গিলার মোহ কাটিয়ে মালী-কন্যার আকর্ষণে সজিন্তায় ফিরে যখন তার প্রণয়িণীর আত্মবিসর্জনের সংবাদ জানতে পারল তখন শোকে, দুঃখে পাগল হয়ে দেশ দেশান্তরে তার ঘুরে বেড়ানোর মধ্য দিয়ে পালা শেষ হয়। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- রতন ঠাকুর, মালী-কন্যা এবং রঙ্গিলা গণিকা।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'রতন ঠাকুরের পালা'টি ১০টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ২৬২টি, কিন্তু আমার গণনায় ২৭৪টি। এ ছাড়া ৩টি স্থানে কাহিনী গদ্যে বর্ণিত হয়েছে। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি একই নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৭ম খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যাও ১০টি, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৩৩২টি, কিন্তু আমার গণনায় ধুয়াসহ ৩৫০টি। কোথাও গদ্যে বর্ণনা নেই। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র আমার গণনায় ৬৪টি। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১০টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে আবার ১০টিতেই সাজিয়েছেন, তবে ৯ম অধ্যায়টি তিনি সংযোজন করেছেন যা দীনেশ চন্দ্রের সংকলনে ছিল না। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৭৩টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

পীর বাতাসী- নায়ক বিনাথ শৈশবেই পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে গ্রামের ধনাঢ্য ব্যক্তি চাঁদ মোড়লের গৃহে রাখালীর কাজ নেয়। এ সময় চাঁদ মোড়ল বিনাথকে নিয়ে বাণিজ্য যাত্রা করে। বাণিজ্য যাত্রায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে মৃতপ্রায় বিনাথ কংশ নদীর জলে ভাসতে ভাসতে ঐ নদীর পাড়ে বসবাসরত সুমাই ওঝার পালিতা কন্যা বাতাসীর নজরে পড়ে। তার ইচ্ছায় সুমাই ওঝা বিনাথকে নদী থেকে তুলে তন্ত্রমন্ত্রের গুণে বাঁচিয়ে তোলে। ক্রমান্বয়ে বিনাথের সঙ্গে বাতাসীর প্রণয় হয়। এদিকে বিনাথ সুমাই ওঝার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তার কাছ থেকে নানা মন্ত্রতন্ত্র আয়ত্ত্ব করে এক সময় তার পরিচিতিকে অতিক্রম করে যায়। বিনাথের এ জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে সুমাই ওঝা তাকে হত্যার উদ্যোগ নেয়। বাতাসীর মাধ্যমে এখবর জেনে বিনাথ পালিয়ে উপস্থিত হয় নিজ গ্রামে চাঁদ মোড়লের গৃহে। চাঁদ মোড়লের পুত্র কুশাই সর্পাঘাতগ্রস্ত হলে বিনাথ তাকে বাঁচিয়ে দেয়। ফলে চাঁদ মোড়ল তার কন্যা সুজন্তীকে বিয়ে দেন

বিনাথের সঙ্গে। কিন্তু সুজন্তী পর পুরুষগামী বলে তাদের দাম্পত্য জীবন স্থায়ী হয়নি। সুমাই ওঝার সঙ্গে চক্রান্ত করে সুজন্তী বিনাথের কাছ থেকে সমস্ত মন্ত্র কৌশল হরণ করে। ফলে বিনাথ পুনরায় পূর্বের জীবন রক্ষাকারিণী প্রণয়িণী বাতাসীর সন্ধানে যাত্রা করে। এদিকে সুমাই ওঝা বাতাসীকে অন্যত্র বিয়ে দিলেও বিনাথকে সে ভুলতে পারেনি। তাই এক সময় সে বিনাথকে পেয়ে তার সঙ্গে গৃহত্যাগী হয়ে এক জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। বাতাসীকে না পাওয়ায় সুমাই ওঝা বিনাথকে সন্দেহ করে তার প্রাণ সংহারের জন্য সর্প চালনা করে। শেষ পর্যন্ত সুমাই ওঝা বিনাথকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। সর্প দংশনেই মৃত্যু ঘটে বিনাথের। অবশেষে বিনাথের মৃতদেহের সাথে বাতাসীর নদীজলে আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে গাথা শেষ হয়। গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- বিনাথ, বাতাসী, সুজন্তী ও সুমাই ওঝা।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'পীর বাতাসী' পালাটি বন্দনা ছাড়া ১৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় ৫৩৯টি। বন্দনা ১টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'পীর-বাতাসী কন্যা' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ২য় খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যাও বন্দনা ছাড়া ১৫টি এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৬১৯টি, কিন্তু আমার গণনায় ধুয়াসহ ৬২৪টি। বন্দনা ১টি। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র আমার গণনায় ১১১টি। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৪১টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

রাজা তিলক বসন্ত- ধার্মিক রাজা তিলক বসন্ত করমপুরুষের কৃপায় ধনী হয়ে অহঙ্কারী হয়ে উঠলেন। তাই একদিন গভীর রাতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে রাজদরবারে অন্ন প্রার্থনা করে না পেয়ে করমপুরুষ অসন্তুষ্ট হলেন। করম পুরুষ রাজাকে স্বপ্ন দেখালেন যে রাজ্য থেকে অতিথি বিমুখ হওয়ায় সে সব ধন সম্পদ হারাবে। ঘুম থেকে জেগে রাজা সুলা রানীকে এ স্বপ্নের কথা জানিয়ে সেই রাতেই নিজ রাজ্য ছেড়ে রানীসহ বনবাসে গেলেন। বনের কাঠুরিয়া ও কাঠুরানীরা সব ঘটনা জেনে রাজা ও রানীকে পাতার কুটির তৈরি করে দিলে রাজা ও রাণী সেখানে কাঠ কেটে জীবন কাটাতে লাগলেন। একদিন রাজা তিলক বসন্ত কাঠ বিক্রি করে অনেক অর্থ পাওয়ার আনন্দে সুলারানী কাঠুরিয়াদের নিমন্ত্রণ করে অনেক কিছু রান্না করলেন। রানী নদীতে স্নান করতে গেলে দেখলেন এক সাধু মহাজন নৌকাভর্তি ধন নিয়ে যাচ্ছে। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তার কাছে কিছু ধন চাইলে সাধু না দেয়ায় তার চৌদ্দ ডিঙ্গা চরে আটকে গেল। তখন করমপুরুষ সাধুকে জানাল যে এক সতী নারী নৌকা স্পর্শ করলে নৌকা ছাড়া পাবে। সাধু রানীকে কাঠুরিয়াদের সঙ্গে ঘাটে দেখে তাকে নৌকা স্পর্শ করতে বললে রাণী নৌকা স্পর্শ করায় নৌকা ভেসে উঠল। মাঝি মাল্লাদের পরামর্শে এবার সাধু রানীকে জোর করে নৌকায় তুলে নিল। তখন সুলারানী করম ঠাকুরকে স্মরণ করে জানাল তার দেহে যেন কুষ্ঠ হয় যাতে সে মুক্তি পায় এবং নৌকাও যেন বিপদে পড়ে। করমঠাকুরের কৃপায় হলোও তাই, নৌকা চরে আটকে গেল ও সুলারানীরও কুষ্ঠ হলো। সাধু ও মাঝি মাল্লারা রানীকে ভয়ংকর কিছু ভেবে আরেক বনে ফেলে গেল। এদিকে তিলক বসন্ত সন্ধ্যাবেলা গৃহে ফিরে রানীকে না দেখে কাঠুরিয়াদের কাছে সব শুনে মনের দুঃখে সে নিরুদ্দেশ হয়ে অপর এক রাজ্যে গিয়ে রাজার মালীর কাজ করতে লাগলেন। সে দেশের রাজার এক কন্যা (পবনকুমারী) ও সাত পুত্র ছিল। কন্যা পবনকুমারীর যোগ্য পাত্র না পাওয়ায় রাজা সিদ্ধান্ত নিলেন সকালে উঠে যাকে দেখবেন

তার সাথেই কন্যার বিয়ে দেবেন। ফলে নতুন মালী তিলকবসন্ত অতি সকালে রাজার গৃহে হাজির হলে রাজার ইচ্ছায় পবনকুমারীর সাথে তার বিয়ে হলো। রাজা আদেশ দিলেন নতুন মালীর গৃহে ধন-দৌলত দিতে যাতে সে গরীবদের বিতরণ করতে পারে। এতে সাত পুত্রের ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগলে রাজভাণ্ডারে তালা পড়ল। একদা কন্যা পবনকুমারীর গৃহে এক অন্ধ ভিক্ষাশূর বামুন এসে ধনরত্নের পরিবর্তে দুটি চোখ ভিক্ষা চাইল। মালী তিলকবসন্ত করমপুরুষকে স্মরণ করে নিজের দুচোখ তুলে অন্ধ ভিক্ষাশূরকে দিলে সে চলে গেল। এবার মালীর বদলে কন্যা নিজেই রাজার গৃহ ঝাড়ু দিতে লাগল। এতে সাত ভাইয়ের স্ত্রীরা খুব হাসল। কন্যার দেহে ছেড়া বস্ত্র দেখেও রানী সাত পুত্রের ভয়ে কিছু করতে পারলেন না। একদিন রাজার সাতপুত্র শিকারের প্রস্তুতি নিলে অন্ধ মালী তিলকবসন্তও শিকারে যেতে চাইল। সে রাজকন্যাকে রাজার কাছ থেকে একটি ধনু ও একটি শব্দভেদী বান এনে দিতে বলল। কন্যার শত নিষেধ উপক্ষো করে ধনু ও শব্দভেদী বান নিয়ে অন্ধ মালী বহু কষ্টে গভীর বনে হাজির হল। অন্ধভাবে হাটতে হাটতে হঠাৎ তার পায়ে কিছুর স্পর্শ লাগলে তার চোখ ভালো হয়ে গেল। চোখ খুলেই সে দেখতে পেল তার সুলারাণীকে। স্বামীর স্পর্শে সুলারানীরও কুষ্ঠ দূর হলো। বারো বছর পর উভয়ের সাক্ষাত হলে সুলা রানী সব ঘটনা খুলে বলল। এদিকে রাজার সাত পুত্র শিকার না পেয়ে ঘুরতে ঘুরতে সাতটি হরিণসহ অন্ধ মালীকে সুলারানীর সঙ্গে দেখতে পেল। সাত ভাই কুবুদ্ধি করে অন্ধ মালী তিলকবসন্তকে হত্যা করে হরিণগুলো নিতে চাইল। কিন্তু তিলকবসন্ত তাদের পরাজিত করে নিজের ছিরি আঙ্গুট দিয়ে দেশে তাদের বোন পবনকুমারীকে দিতে বলল এবং জানাতে বলল এ আঙ্গুটই তার পরিচয় বলবে। নিজ দেশে ফিরে সাত ভাই পবনকুমারীকে ছিরি আঙ্গুটটি দিয়ে জানাল অন্ধ মালীকে বাঘে খেয়েছে। ছিরি আঙ্গুট পবনকুমারীকে জানাল যে অন্ধ মালী আসলে রাজা তিলক বসন্ত। এ কথায় কন্যা প্রায় উন্মাদ হয়ে রাজ্য ছেড়ে তিলক বসন্তের রাজ্যে গিয়ে রাজার ধোপার আশ্রয় লাভ করল। ধোপার ধুয়ে রাখা রানীর কাপড়ের ভাজের মধ্যে পবনকুমারী সেই ছিরি আঙ্গুটটি গোপনে রেখে ধোপানীকে দিয়ে রাণীর কাছে পাঠাল। রানী কাপড়ের মধ্যে সেই আঙ্গুট পেয়ে তা রাজা তিলক বসন্তকে দেখালে সে ধোপানীর কাছ থেকে তার গৃহে আশ্রিত কন্যা পবনকুমারীর কথা জানল। সে দোলা পাঠিয়ে কন্যাকে নিজ অন্দরে আনাল। রাজা তিলকবসন্ত এবার সুলারানীকে পবনকুমারীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে দুই সতীনের মিলন হলো। পবনকুমারীর পিতা এ খবর শুনে তার অর্ধেক রাজত্ব তিলক বসন্তকে দেয়ার মধ্য দিয়ে পালা শেষ হয়। পালা উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে- তিলকবসন্ত, সুলারানী, পবনকুমারী এবং করমপুরষ।
এ পালাটি ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় নেই।

মলয়ার বারমাসী- নবরঙ্গপুরের বিত্তবান, প্রতাপশালী ও সওদাগর নিতিমাধবের কন্যা মলয়ার নয় বছর বয়স হলে পিতা তার বিয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হন এবং উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে ছয় বছর ভ্রমণ করেন। এদিকে সওদাগরের অনুপস্থিতিতে হার্‌য়া ডাকাত মলয়াকে অপহরণ করে পাইলা বনের কুটিরে আটকে রেখে পরম যত্নে লালন করতে থাকে। একদিন হার্‌য়া ডাকাতের অনুপস্থিতিতে মলয়া কুটির থেকে বনে বের হলে শিকারের উদ্দেশ্যে আগত ভূমা রাজার পুত্র থলবসন্তের সঙ্গে তার দেখা হয়। থলবসন্ত মলয়ার সব ঘটনা জেনে তাকে উদ্ধার করে পিতা-মাতার নিকট পৌঁছে দেয়। পরে থলবসন্তের পিতা ভূমা রাজা মলয়ার পিতা নিতিমাধব সওদাগরের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলে নিতিমাধব তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে ভূমা রাজার নির্দেশে নিতিমাধবকে বেঁধে রাখা হয়। থলবসন্ত মলয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে গেলে তাকে

বাঁচাতে স্ত্রীরূপে মলয়া তার কাছে চলে আসে। এবার ভূমা রাজা পুত্রের বিয়ের আয়োজন করে বহু রাজাকে নিমন্ত্রণ করে আনেন। তাদের মধ্যে তার গোপন শত্রু বলাই রাজাও ছিলেন। তার নেতৃত্বে নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গ দীর্ঘদিন বনবাসের কারণে মলয়ার সতীত্ব পরীক্ষার অযৌক্তিক দাবি তোলেন। দুঃসাধ্য শর্ত পালন করে মলয়া সতীত্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারায় তাকে বনবাস দেয়া হয়। বনবাসে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় হার্যা ডাকাতের সাথে তার দেখা হয়। পরে থলবসন্ত কর্তৃক হার্যা ডাকাতকে বন্দি করে রাজসভায় আনীত হওয়ার মধ্য দিয়ে অসমাপ্ত গাথা শেষ হয়। গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে-মলয়া, থলবসন্ত, হার্যা ডাকাত এবং বলাই রাজা।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'মলয়ার বারমাসী' পালাটি বন্দনাসহ ১১টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় ৪৩৩টি। বন্দনা ১টি, তবে নামোল্লেখ করেননি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'মলয়া কন্যার পালা' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যাও বন্দনা ছাড়া ১১টি এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৮৫৪টি, আমার গণনায়ও তাই। বন্দনা ১টি। দীনেশ চন্দ্র অপেক্ষা অতিরিক্ত ছত্র আমার গণনায় ৪১৪টি। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১১টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে আবার ১১টিতেই সাজিয়েছেন, তবে ৯ম, ১০ম এবং ১১শ অধ্যায় তিনটি তিনি নতুন সংযোজন করেছেন যা দীনেশ চন্দ্রের সংকলনে ছিল না। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৯২টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন বলে ভূমিকায় বলেছেন; কিন্তু পাদটীকার পাঠান্তরগুলো গণনা করে ১০২টি ছত্রের পাঠান্তর পাওয়া যায়।

জীরালনী- নয়াগঞ্জের রাজা চক্রধর একদিন শিকারে গিয়ে স্বর্ণবর্ণ এক হরিণের সাক্ষাত পান। তিনি হরিণটি ধরে এনে একমাত্র কন্যা মেঘমতি বা জীরালনীকে উপহার দেন। একদিন জীরালনী হরিণটিকে গোসল করাতে গিয়ে তার দুই শিংয়ের মধ্যে একটি তাবিজ দেখে তা খুলতেই সে এক সুন্দর রাজকুমারের রূপ ধারণ করে। তার কাছ থেকে কন্যা জানতে পারে দণ্ডপুরের রাজা ও রাজকুমারের পিতা দণ্ডপতির দুই স্ত্রীর এক স্ত্রী সতীন পুত্রের প্রতি ঈর্ষাবশত বনজ ঔষধের তাবিজ দিয়ে তাকে হরিণ করে রেখেছে। একইভাবে জীরালনীর কাছ থেকে রাজকুমারও জানতে পারল রাজা চক্রধরের দুই রাণীর বড় জনের একমাত্র কন্যা সে। কিন্তু ছোট রানীর চক্রান্তে তার মাতা বা বড় রানী নির্বাসিত। এমনকি বিমাতা পুত্র দুলাই কর্তৃক তাকে বিয়ে করার চক্রান্তও সে জানায় রাজকুমারকে। উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয় এবং গোপনে তাদের বিয়েও হয়। তাবিজের গুণে দিনে হরিণ ও রাতে রাজকুমার - এভাবে কাটে। একদিন রাজকুমারের তাবিজ জীরালনী হারিয়ে ফেললে স্থায়ী মানুষরূপী রাজকুমারকে রাজ্যবাসীর ভয়ে পালিয়ে যেতে হয়। এদিকে জীরালনীর বিমাতাপুত্র দুলাই তাকে বিয়ে করার ষড়যন্ত্ররূপে তার পিতা-মাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করে বসে জীরালনীর সঙ্গে তার বিয়ে না হলে সে প্রাণত্যাগ করবে। সৎভাই-বোনের বিয়ের কথায় জীরালনী আত্মবিসর্জনের উদ্দেশ্যে জলে ঝাপ দেয়। কিন্তু এক জেলের জালে ধরা পড়ে সে পুনর্জীবন পায়। পরে জীরালনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে এক ধনী সওদাগরপুত্র তাকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে জেলে-জেলেনীর কাছ থেকে কিনে নেয়। জীরালনীর ইচ্ছানুসারে কোন্ রাজকুমার একদা হরিণ হয়েছিলেন এ সংবাদ জানার জন্য সওদাগর পুত্র চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজিয়ে জীরালনীসহ দেশ- দেশান্তরে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু অতল সমুদ্রে চৌদ্দ ডিঙ্গা ঝড়ে পড়ে সওদাগরপুত্র ও জীরালনীর ভেসে যাওয়ার মধ্য

দিয়ে অসমাপ্ত গাথা শেষ হয়। গাথার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে-জীরালনী, রাজকুমার, দুলাই এবং সওদাগর পুত্র।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় 'জীরালনী' পালাটি ১৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৫১০টি, কিন্তু আমার গণনায় ৫৫৭টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক এ পালাটি 'হরিণকুমার জিরালনী কন্যার পালা' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৭ম খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা ১৬টি, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ৯৩৪টি; কিন্তু আমার গণনায় ধুয়াসহ ৯৩৩টি। দীনেশ চন্দ্রের ছত্র থেকে ২টি ছত্র বাদ দিয়ে অতিরিক্ত ছত্র আমার গণনায় ৩৮৭টি। এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ১৩টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ১৬টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ, ১৫শ এবং ১৬শ অধ্যায় নতুন সংযোজন করেছেন যা দীনেশ চন্দ্রের সংকলনে ছিল না। এ পালায় দীনেশ চন্দ্রের তুলনায় ৭৮টি ছত্রে পাঠান্তর ঘটেছে যা তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

পরীবানুর হাঁহলা- লড়াইয়ে পর্যুদস্ত ও রাজ্যহারা সুজা বাদশাহ স্ত্রী পরীবানু ও দুই কন্যাসহ নিরুদ্দেশ যাত্রার পথে আশ্রয় পেলেন রোসাঙ্গের রাজার কাছে। হঠাৎ একদিন রোসাঙ্গরাজ সুজার পত্নী পরীবানুর রূপৈশ্বর্য দেখে মুগ্ধ হলেন এবং তাকে পেতে চাইলেন। রোসাঙ্গ রাজের হাত থেকে বাঁচতে সুজা পরীবানুকে নিয়ে সকাল হবার পূর্বেই সমদ্রতীরে উপস্থিত হলেন পালাবার উদ্দেশ্যে। একটি ছোট নৌকায় উঠে তারা সমুদ্র যাত্রা করলেন। কিন্তু সমুদ্রের প্রচণ্ড ঢেউয়ে ছোট নৌকা ডুবতে গেলে উভয়ে একসঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে রোসাঙ্গরাজের হাত থেকে নিস্কৃতি লাভ করলেন। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে-সুজা, পরীবানু এবং রোসাঙ্গরাজ।

দীনেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় *পূর্ববঙ্গ-গীতিকা ৪র্থ* খণ্ড ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত এবং ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত সর্বশেষ পালা 'পরীবানুর হাঁহলা' ৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা আমার গণনায় ধুয়াসহ ১৯১টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক হুবহু দীনেশ চন্দ্রের এ পালাটিই সংকলন করে 'পরীবানু বেগমের পালা' নামে তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে স্থান দিয়েছেন। ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার অধ্যায় সংখ্যা ৩টি, কোনো বন্দনা নেই এবং ছত্র সংখ্যা তিনি ভূমিকায় বলেছেন ১৯২টি, কিন্তু আমার গণনায় ধুয়াসহ ১৯১টি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক নিজে এ পালার কিছু সংগ্রহ করতে পারেন নি। তবে এ পালায় ক্ষিতীশ চন্দ্র দীনেশ চন্দ্রের ৫টি অধ্যায়কে ভেঙ্গে ৩টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন, কোনো নতুন অধ্যায় সংযোজন করেন নি বা কোনো অধ্যায় বাদও দেননি। দীনেশ চন্দ্রের পালার সাথে ক্ষিতীশ চন্দ্রের এ পালার শুধু বানানের কিছু পার্থক্য ছাড়া অন্য কোনো পার্থক্য নেই।

সোণারায়ের জন্ম- পালাটির কাহিনী সম্পর্কে সম্পাদক দীনেশ চন্দ্র সেন ভূমিকায় যা বলেছেন চরিত্রের নামগুলো ছাড়া তার সাথে মূল পালার তেমন মিল পাওয়া যায় না। মূল পালায় পীরের বরে চাঁদ রায়ের ছেলে সোনারায়ের জন্ম হয়। বড় হয়ে সে একদিন শিকারে গিয়ে এক গহীন বন কেটে সোনাপুরী নামে এক নগর বানায়। এরপর সোনারায় বিয়ে করে নৌকায় বাড়ি ফিরতে গেলে পীরের নির্দেশে ঝড় ওঠে এবং নৌকা ডুবে ভেসে ভেসে সোনারায় ঘোড়াঘাট শহরে ফুল বেগম সাহেবের ঘাটে গিয়ে পৌছে। পীর

সেই শহরে সোনারায়কে বন্দি করে রাখেন এবং ফুল বেগমের সাথে বিয়ের পর পীরের সহযোগিতায় সে চৌদ্দ ডিঙ্গায় নিজ দেশে ফেরে। পরবর্তীকালে তলাপাত্র নামীয় এক ব্রাহ্মণ এবং খাজা নামে এক ব্রাহ্মণীর সোনারায় নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সবশেষে খাজনা পরিশোধজনিত সমস্যার বিবরণ এবং সোনারায় সে দেশের রাজা হওয়ার মধ্য দিয়ে অসমাপ্ত পালাটি শেষ হয়। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হচ্ছে-সোনারায়, ফুল বেগম এবং পীর সাহেব।
এ পালাটি ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় নেই।

সোণাবিবির পালা- এ পালা সম্পর্কে দীনেশ চন্দ্র সেন পালার ভূমিকায় বলেছেন যে এটি ৫৫০টি ছত্রে রচিত। তবে দুই স্থান থেকে মাত্র ৮২টি ছত্র প্রকাশ করেছেন। প্রকাশিত অংশটুকুতে নায়ক মামুদ তার স্ত্রী সোনাবিবির জন্য উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল। কিন্তু সোনাবিবির প্রতি আসক্ত মামুদের নৌকাডুবি হলে নিজ প্রাণের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশের পরিবর্তে তার বিচ্ছেদে সোনাবিবির কি পরিণতি হবে সে ভাবনায় রত। পালার উল্লেখযোগ্য চরিত্র শুধুই মামুদ।
এ পালাটিও ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় নেই।

ভরার মেয়ের গান- ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে 'ভরার মেয়ের গান' নমে তিনটি ছুটাগান এবং একপালা বারমাসী গান সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন যা দীনেশ চন্দ্র সেনের সংকলনে নেই। এর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এই:

প্রাচীনযুগে বর্ষাকালে এক শ্রেণির ঘটক বড় বড় বজরা নৌকা নিয়ে দূরদেশের কুলীন কন্যার খোঁজে বের হতেন। ঘটকদের এ বজরা নৌকাকেই 'ভরা' বলা হয়। কুলীন ঘরে যেসব কন্যার বিয়ে দেয়া অভিভাবকের সামর্থের বাইরে ছিল তাদের অভিভাবক বজরা নৌকার ঘটকের নির্দেশ মতো ভরার নৌকায় মেয়েগুলো এনে তুলে দিতেন। ভরার ঘটক ভরা বোঝাই এ মেয়েগুলোকে বহু দূরদেশে নিয়ে অকুলীন সমাজে অল্প পণে বিয়ে দিতেন। এরকম ভরার মেয়েদের বিলাপ বা আক্ষেপমূলক তিনটি ছুটাগান এবং ভরার মেয়ের একপালা বারমাসী স্থান পেয়েছে এ-পালায়।

বাইন্যা বউ- লক্ষ্মীর ঝাঁপি পালা- ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে 'বাইন্যা বউ- লক্ষ্মীর ঝাঁপি পালা' নামে একটি পালা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন যা দীনেশ চন্দ্র সেনের সংকলনে নেই। এর কাহিনী সংক্ষেপে এই:

পুরুষানুক্রমে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত এক বেণে বাণিজ্যে গিয়ে নৌকা ডুবিতে পড়ে। তার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী পুত্র-কন্যা চরম আর্থিক দৈন্যের শিকার হয়। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ বারো বছর পর বেণের ডিঙ্গা থেকে ভেসে আসা লক্ষ্মীর ঝাঁপির ধন দৌলত তাদের আর্থিক অনটন দূর করে। বেণের পুত্র পিতার ঐতিহ্য বজায় রাখতে বাণিজ্য করা শুরু করে। অবশেষে বেণের স্ত্রীর স্বামী বিচ্ছেদ কাতরতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে পালা শেষ হয়। পালার চরিত্র দুটি- বেণে এবং বেণে বউ।

বাল্যস্মৃতি স্মরণে উদ্‌বাস্তুর কান্না- ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক তাঁর *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা* গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে 'বাল্যস্মৃতি স্মরণে উদ্‌বাস্তুর কান্না' নামে একটি পালা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন যা দীনেশ চন্দ্র সেনের সংকলনে নেই। এ পালাটি কোনো এক উদ্‌বাস্তুর শৈশব স্মৃতিমূলক বিলাপ। যার নিবাস ছিল পদ্মাতীরবর্তী কোনো এক গ্রামে। যে কোনো কারণে সে উদ্‌বাস্তু হয়ে ভিন্ন দেশে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

দীনেশ চন্দ্র সেন এবং ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিকের লোকগীতিকা সংগ্রহ ও প্রকাশের পর বাংলা একাডেমী ফোকলোর উপবিভাগ ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে নিয়োজিত ও অনিয়োজিত সংগ্রাহকদের মাধ্যমে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানসহ ১৮০টি লোকগীতিকা সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে মাত্র ৫৪টি গীতিকা বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। মোট ১৩ জন সংগ্রাহক এগুলো ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, মৌলভীবাজার, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরে বয়াতী, জারিয়াল, গাইন, কিচ্ছাদার এবং প্রবীণাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে ময়মনসিংহ, রংপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ফরিদপুর অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গীতিকাই বেশি।

বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত ও অনিয়োজিত ১৩ জন সংগ্রাহক হচ্ছেন: ১. এস এম সামীযূল ইসলাম-৫৬টি ২. এম সাইদুর-৩৫টি ৩. চৌধুরী গোলাম আকবর-২৮টি ৪. আবদুস সাত্তার চৌধুরী-২৬টি ৫. মোঃ নূরুল হক মোল্লা-২৩টি ৬. আবদুর রহমান ঠাকুর-৪টি ৭. মোঃ আমজাদ হোসেন-২টি।

এছাড়া ৮. শ্রী চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস ৯. কাজী সাহাব উদ্দিন ১০. জিয়াউদ্দিন আহমদ ১১. নূরুন্নবী মোঃ আমিন ১২. মমতাজ আহম্মদ এবং ১৩. রিয়াজ উদ্দিন আহমদ প্রত্যেকে ১টি করে গীতিকা সংগ্রহ করেন।

এঁদের সংগৃহীত ১৮০টি গীতিকার নাম: ১. সৈয়দ আমিন বাদশার পালা ২. ফরিদ মৌলভীর পালা ৩. ছায়েদ কুমার ও মনকেলাজীর পালা ৪. সূর্যমণি কন্যার পালা ৫. কালদুলাই ৬. লায়লী মজনুর পালাগান ৭. দেলবর কুমারের পালা ৮. রূপচাঁদ আর কাঞ্চন (১ম খণ্ড) ৯. রূপচাঁদ আর কাঞ্চন (২য় খণ্ড) ১০. গুনো বিবির পালাগান ১১. হেকমত তৌলের পালাগান ১২. দিদার কুমারের পালাগান (১ম খণ্ড) ১৩. দিদার কুমারের পালাগান (২য় খণ্ড) ১৪. সকিসোনা আর রেমানিকের পালা ১৫. জামাল আর জরিনার পালাগান ১৬. সোনাই কন্যার পালা (১ম খণ্ড) ১৭. সোনাই কন্যার পালা (২য় খণ্ড) ১৮. সোনাই কন্যার পালা (৩য় খণ্ড) ১৯. ছয়ফুল মুল্লুক (২য় খণ্ড) ২০. ছয়ফুল মুল্লুক (৩য় খণ্ড) ২১. ছয়ফুল মুল্লুক (৪র্থ খণ্ড) ২২. ছয়ফুল মুল্লুক (৫ম খণ্ড) ২৩. খুলানা কন্যার পালা (প্রথমাংশ) ২৪. খুলানা কন্যার পালা (দ্বিতীয়াংশ) ২৫. খুলানা কন্যার পালা (শেষাংশ) ২৬. সৎ মায়ের পালাগান ২৭. গফুর বাদশার পালাগান (প্রথম খণ্ড) ২৮. গফুর বাদশার পালাগান (২য় খণ্ড) ২৯. রূপসী কন্যার পালাগান (১ম খণ্ড) ৩০. রূপসী কন্যার পালাগান (শেষাংশ) ৩১. দুঃখরাজ ও সুখরাজের পালাগান ৩২. গদাই বাদশার পালাগান ৩৩. বদিউজ্জামালের পালাগান (১ম খণ্ড) ৩৪. বদিউজ্জামালের পালাগান (২য় খণ্ড) ৩৫.

পাঁচতোলা কন্যার পালা ৩৬. সোনাই বিবির পালা ৩৭. ভেলুয়া সুন্দরীর পালাগান ৩৮. মানিক সদাগরের পালাগান (প্রথমাংশ) ৩৯. মানিক সদাগরের পালাগান (দ্বিতীয়াংশ) ৪০. লালবানু ও শাহ্জামালের পালাগান (১ম খণ্ড) ৪১. লালবানু ও শাহ্জামালের পালাগান (২য় খণ্ড) ৪২. মালেন্চা সোন্দরীর পালাগান ৪৩. নূরজাহানের পালাগান ৪৪. আছফা কন্যার পালা ৪৫. আফান দুলালের পালাগান ৪৬. সুফিয়া কন্যার পালাগান ৪৭. কমলা সোন্দরীর পালাগান (১ম খণ্ড) ৪৮. জ্ঞান-চৌতিষার পালা ৪৯. গোরপ বাদশার পালাগান (প্রথমাংশ) ৫০. মোনাই ও তোনাইর পালাগান (১ম খণ্ড) ৫১. মোনাই ও তোনাইর পালাগান (দ্বিতীয়াংশ) ৫২. রাজুবালা সুন্দরীর পালাগান ৫৩. পালাগান (জারি-যাত্রা) ৫৪. সিরাজ উল্লার গীত ৫৫. বাইদ্যার পালাগান ৫৬. আবদুল বাদশা ও আতসজান কন্যার পালাগান (১ম খন্ড) ৫৭. পৈলান খাঁ ও অরণ সোনার পালাগান (১ম খণ্ড) ৫৮. পৈলান খাঁ ও অরণ সোনার পালাগান (২য় খণ্ড) ৫৯. চন্দ্রামুখী কইন্যার পালাগান ৬০. আজকন্যা আর মধুমালার পালাগান (১ম খণ্ড) ৬১. আজকন্যা আর মধুমালার পালাগান (২য় খণ্ড) ৬২. আদম খাঁ দেওয়ানের গীত ৬৩. আজিভান কইন্যার *পালাগান ৬৪. সোনামতি কন্যার গীত ৬৫. মানিক পাল আজার পালাগান ৬৬. জয়নব বাদশার* পালাগান ৬৭. হাপ-বেংগোর গীত ৬৮. মইরামতি কন্যার পালাগান ৬৯. চান খাঁ মোন্ডোলের পালাগান ৭০. আলম'শার পালাগান ৭১. মইধর বাদশার পালাগান ৭২. বানু কইন্যার পালা ৭৩. বলাই ভুদাইর গীত ৭৪. ফুলে ফুলে কইন্যার পালাগান ৭৫. হলুদ বাদশার পালাগান ৭৬. মাধব-মালঞ্চ কন্যারপালা ৭৭. তোতা মিয়ার পালা ৭৮. চাঁদমনি কইন্যার পালা (১ম খণ্ড) ৭৯. চাঁদমনি কন্যার পালা (২য় খণ্ড) ৮০. চাঁদমনি কন্যার পালা (৩য় খণ্ড) ৮১. চাঁদমনি কন্যার পালা (৪র্থ খণ্ড) ৮২. চাঁন খাঁ মোন্ডোলের পালাগান ৮৩. জমীর সদাগরর গীত ৮৪. চান্দ রাজার গীত ৮৫. সোনাই বিবির পালাগান ৮৬. তায়জল মুল্লুকের পালাগান ৮৭. ভাসান গান (বিয়ের পালা) ৮৮. বীরাগুরু তৃষ্ণাপতি কন্যার পালাগান ৮৯. গকুলচান ও আইধর চানের পালাগান ৯০. ছোক্রা নাচা গানের পালা (১ম খণ্ড) ৯১. ছোক্রা নাচা গানের পালা (২য় খণ্ড) ৯২. ন্যাকবিবির গান (ছোক্রা নাচা পালাগান ১ম খণ্ড) ৯৩. ন্যাকবিবির গান (ছোক্রা নাচা পালাগান ২য় খণ্ড) ৯৪. ন্যাকবিবির গান (ছোক্রা নাচা পালাগান ৩য় খণ্ড) ৯৫. জসমত খাঁর পালা ৯৬. আটকুরা গিরোছ ৯৭. ঈসা খাঁ দেওয়ানের পালাগান ৯৮. মনোয়ার খাঁ দেওয়ানের পালাগান (১ম খণ্ড) ৯৯. মনোয়ার খাঁ দেওয়ানের পালাগান (২য় খণ্ড) ১০০. জসমত খাঁর পালাগান ১০১. তিলাই রাজার গীত ১০২. খান্কীর গীত ১০৩. চিনু-মিনুর পালাগান ১০৪. অসমনি কন্যার পালা (১ম খণ্ড) ১০৫. অসমনি কন্যার পালা (২য় খণ্ড) ১০৬. কাঞ্চনমালার পালাগান ১০৭. ঈশা খাঁ দেওয়ান (১ম খণ্ড) ১০৮. ঈশা খাঁ দেওয়ান (বিরহ খণ্ড, শেষাংশ) ১০৯. জেলকদ বাশশার পালা (১ম খণ্ড) ১১০. জেলকদ বাদশার পালা (২য় খণ্ড) ১১১. লালপরীর পালাগান ১১২. পবোন-মেহেরী কইন্যার পালাগান ১১৩. কাজভান আজার পালা ১১৪. অওশন কইন্যার পালাগান ১১৫. অবং দুলাল পালাগান (১ম খণ্ড) ১১৬. অবং দুলাল পালাগান (২য় খণ্ড) ১১৭. অবং দুলাল পালাগান (৩য় খণ্ড) ১১৮. হেংগার গীত ১১৯. ফুলমতির পালাগান ১২০. মনাবিবির পালাগান ১২১. জুলমত খাঁর পালাগান ১২২. সুতমনি আর কাপাসপতির পালাগান ১২৩. হাকয়ালী পালাগান ১২৪. শাহেবান বাদশা আর সুখ-সারীর পালা ১২৫. সোনার বিনোদ পালাগান (১ম খণ্ড) ১২৬. সোনার বিনোদ পালাগান (শেষাংশ) ১২৭. তোতা মিয়ার পালাগান (প্রথমাংশ) ১২৮. তোতামিয়ার পালাগান (শেষাংশ) ১২৯. তোতামিয়ার পালাগান ১৩০. মিয়াজী খন্কারের গীত ১৩১. হীরামনি কইন্যার পালাগান ১৩২. মোড়ল কাজীর গীত ১৩৩. আলীপজান

সুন্দরীর গীত ১৩৪. হারুন বাদশা ও সুরজুমতি কইন্যার পালাগান (১ম খণ্ড) ১৩৫. হারুন বাদশা ও সুরজুমতি কইন্যার পালাগান (২য় খণ্ড) ১৩৬. কলি আজার পালাগান ১৩৭. চানমনি-সূর্যমনির পালাগান ১৩৮. মছতই সদাগরের গীত ১৩৯. ফরাদ বাত্শার পালাগান ১৪০. নূর হোচেন ও গোলেনূরীর পালাগান (১ম খণ্ড) ১৪১. নূর হোচেন ও গোলেনূরীর পালাগান (২য় খণ্ড) ১৪২. আরোন খাঁ দেওয়ানের গীত ১৪৩. ইচাবর আচার পালাগান ১৪৪. আলম সাধু ও সুন্দর বানুর পালাগান (১ম খণ্ড) ১৪৫. আলম সাধু ও সুন্দর বানুর পালাগান (২য় খণ্ড) ১৪৬. ধরমী রাজার গীত ১৪৭. ফিরোজ দেওয়ানের গীত ১৪৮. তালুকদারের গীত ১৪৯. এঁয়াতারা জুরর জন্মকথা (সংস্কারমূলক পালাগান) ১৫০. কইন্যা আনোয়ারের কলি ১৫১. ফরেক বাশ্শার পালাগান ১৫২. ব্যালোমতি কইন্যার পালাগান ১৫৩. হান্মাম বাশ্শার পালাগান ১৫৪. শ্যামপরীর পালা ১৫৫. মালেকা সুন্দরীর পালাগান ১৫৬. পাচ হাতনোর গীত ১৫৭. জামাল বাদশা ও ভানুমতির পালাগান ১৫৮. ছুরতজান বিবির পালাগান ১৫৯. কাননমালার পালাগান (১ম খণ্ড) ১৬০. কাননমালার পালাগান (২য় খণ্ড) ১৬১. চান্দবী সোন্দরীর পালাগান ১৬২. নিমচান বাশ্শা ও সোনাই বিবির পালাগান ১৬৩. মছমত আলী দেওয়ানের পালাগান ১৬৪. রংগমালার গীত ১৬৫. হুরমুজ বাত্শার পালাগান ১৬৬. মরগমতি কন্যা ১৬৭. গফুর রাজার পালা ১৬৮. সৎমায়ের পালাগান ১৬৯. সাগরভাসা ১৭০. লাল বানু ও শাহজামালের পালাগান (১ম খণ্ড) ১৭১. লালবানু ও শাহজামালের পালাগান (২য় খণ্ড) ১৭২. অল্লাজাল ও ললিতার পালাগীত ১৭৩. দুব্লা কন্যা ১৭৪. নিলভানু কন্যার পালাগান ১৭৫. কুসুম কামিনী কইন্যা ১৭৬. আজ কইন্যা মধুমালার পালাগান (২য় খণ্ড) ১৭৭. গাজীর বিদায়ের পালাগান ১৭৮. পালাগান (গীত) ১৭৯. গাজীর গীতের পালাগান এবং ১৮০. পালাগান (গীত)।

বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত *বাংলা একাডেমী ফোকলোর আরকাইভস্ মৌখিক সাহিত্যের তালিকা ও সূচির* চতুর্থ খণ্ডে (আবদুল হাফিজ ১৯৯৪) নিয়োজিত ও অনিয়োজিত সংগ্রাহকদের সংগৃহীত ১৮০টি গীতিকার যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো থেকে নিম্নোক্ত ৮৭ জন গাইন, কথক বা বয়াতীর নাম পাওয়া যায়:

১. গৌরাঙ্গ জলদাস গাইন ২. কালা মিয়া গাইন ৩. ওয়ার উল্লা গাইন ৪. আমান উল্লা ৫। সুলতান আহমদ ৬. আছর উদ্দিন ৭. আবদুর রাজ্জাক মিয়া ৮. বালা বিশ্বাস ৯. করমত সোনার ১০. মোশারফ গীদাল ১১. মধু গীদাল ১২. ধুতু গীদাল ১৩. আবদুস সামাদ দরজি ১৪. ধুর মহম্মদ ১৫. মৌরবানু ১৬. আলিম উদ্দিন আহমদ ১৭. রাজচন্দ্র গাইন জলদাস ১৮. আবদুল ফকির ১৯. মোঃ হেলাল উদ্দিন ২০. হীরু মিয়া ২১. কালু মিয়া ২২. ইছমাইল মিয়া ২৩. ভাসান মাতব্বর ২৪. মোঃ আনছার উদ্দিন ২৫. ইয়াজ মামুদ ২৬. আবদুল মাজেদ ২৭. আবদুল মান্নান মিয়া ২৮. মোঃ ইব্রাহিম মিয়া ২৯. মোঃ দবির উদ্দিন ৩০. আবু শ্যামা খাঁ ৩১. তালেব আলী মাতব্বর ৩২. উছেন আলী মিয়া ৩৩. ফজর আলী মিয়া ৩৪. আজিদ আলী ৩৫. জাফর উদ্দিন ৩৬. মোঃ রিয়াজুল হক ৩৭. নওশের আলী ৩৮. মোঃ আজিজুল হক ৩৯. সাবাজ উল্লা ৪০. মিয়া হোসেন ভূঁইয়া ৪১. জালেক গায়েন ৪২. আকমল হোসেন ৪৩. আকমল শেখ ৪৪. সিরাজ পাগলা ৪৫. আবদুল শেখ ৪৬. খোয়াজ উদ্দিন বয়াতী ৪৭. রমিজ উল্লা ৪৮. হাবিবুর রহমান ৪৯. আবদুল জলিল ৫০. আবদুল জব্বার মিয়া ৫১. আজিরুদ্দিন শেখ ৫২. গফুর উদ্দিন শেখ

৫৩. ছায়েদ আলী মিয়া ৫৪. শ্রী শুকলাল মোহান্ত৫৫. জাফর উদ্দিন ৫৬. মিয়া হোসেন মিয়া ৫৭. আবদুল জব্বার ভূঁইয়া ৫৮. আবদুর রউফ ৫৯. মানিকল্লা শেখ ৬০. আরজিদ খাঁ ৬১. আবদুল মালিক ৬২. সোনা উল্লা ৬৩. ছাদক মাং ৬৪. আলম উল্লা ৬৫. মোঃ তছলিম উদ্দিন ক্বারী ৬৬. আবদুল মন্নাছ ৬৭. আবদুর রশিদ খাঁ ৬৮. রেবতী ভট্টাচার্য ৬৯. ইকরামউল্লা ফকির ৭০. মোঃ আকালু শেখ ৭১. সোনাউল্লা মাতব্বর ৭২. আতিয়ার বয়াতী ৭৩. মুনির উদ্দিন চৌধুরী ৭৪. লাছু মিয়া ৭৫. আজগাইরা শিকদার ৭৬. আবদুস সাত্তার বয়াতী ৭৭. হীরেন্দ্রলাল চাকমা ৭৮. আহম্মদ আলী শিকদার ৭৯. হোছেন আলী ভূঁইয়া ৮০. আজেফর আলী ৮১. মুর্শিদ আলী শিকদার ৮২. মোঃ তোতা মিয়া ৮৩. জহির উদ্দিন ৮৪. বগদুল শেখ ৮৫. দবির উদ্দিন ৮৬. বাবু কেশবলাল ভক্ত ৮৭. কাঙ্গালী গায়েন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা গীতিকায় প্রতীক

বাংলা লোকগীতিকায় চাঁদ, সূর্য, তারা, সোনা, আগুন, মণি-মুক্তা, প্রাণ, ধন, পাহাড়, পাথর ইত্যাদি শব্দ তাদের আভিধানিক অর্থ অতিক্রম করে প্রতীকী ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। এ সমস্ত শব্দ প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে রচয়িতাদের মানসিক অবস্থা ও তৎকালীন সমাজ-মানসের প্রকৃতি পরিস্ফুট করেছে।

গীতিকায় প্রাপ্ত প্রতীকগুলোর শ্রেণিবিন্যাসে প্রথম হচ্ছে নৈসর্গিক প্রকৃতি আশ্রয়ী প্রতীক। বাংলা গীতিকায় নিসর্গই হচ্ছে প্রতীকের প্রধান উৎস। এর মধ্যে রয়েছে চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র, তারা, মেঘ, পাহাড়-পর্বত, নদী-জল, ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতীক হচ্ছে বস্তু আশ্রয়ী প্রতীক। এর মধ্যে রয়েছে সোনা, রূপা, মণি-মুক্তা, হীরা-মতি, পাথর, ধন, ধনু, অলংকার, বিষ ইত্যাদি।

তৃতীয় শ্রেণির প্রতীক হচ্ছে প্রাণী আশ্রয়ী প্রতীক। এর মধ্যে রয়েছে পশু-পাখি, সরীসৃপ ইত্যাদি।

চতুর্থ শ্রেণির প্রতীক হচ্ছে কাল্পনিক জীব-জন্তু ও দেব-দেবী আশ্রয়ী প্রতীক। এর মধ্যে রয়েছে যম-যমরাজ, রাক্ষস, পরী, রাম, রাবণ, সরস্বতী, লক্ষ্মী, ইন্দ্র, কার্ত্তিক, কল্পতরু ইত্যাদি।

পঞ্চম শ্রেণির প্রতীক হচ্ছে সংস্কার আশ্রয়ী প্রতীক। এর মধ্যে প্রাপ্ত সবগুলো প্রতীকই অমঙ্গল বিষয়ক। যেমন-কাক, চিলের ডাক, টিকটিকির ডাক, কোকিলের কু ডাক, তেলী ও গর্ভবতী শিয়ালী দর্শন, হাঁচির শব্দ, প্রেত-পিশাচ, অপুত্রক বা আটকুরে, পিতৃ-মাতৃহীন শিশু বা খাকুরা ইত্যাদি।

ষষ্ঠ শ্রেণির প্রতীক হচ্ছে বিবিধ বিষয়ক প্রতীক। এর মধ্যে রয়েছে আগুন, পাগল, কাল, নিশা-যামিনী, শ্মশান, প্রাণ, নৌকা, নয়নতারা, ঝিলিমিলি, ক্ষীর ইত্যাদি।

নৈসর্গিক প্রকৃতি আশ্রয়ী প্রতীক

চাঁদ

বাঙালী জীবন ও সাহিত্যে চাঁদ সৌন্দর্যের প্রতীক রূপে অতুলনীয়। গীতিকায় প্রাপ্ত সর্বাধিক সংখ্যক প্রতীকও চাঁদকে নিয়ে। গীতিকাগুলো লোকজীবনকেন্দ্রীক। তাই ঐ সময়ের গ্রামীণ সমাজে অন্ধকার রাত্রিতে চাঁদের আলোর প্রয়োজনীয়তা এবং এর দুর্লভতাজনিত ভাবাবেগ প্রভৃতি কারণে প্রতীক হিসাবে চাঁদ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। গীতিকায় মানবদেহের সৌন্দর্য, দেহের উজ্জ্বলতা, দুর্লভ সৌন্দর্য বা দুর্লভ সামগ্রী, মুখেরসৌন্দর্য প্রভৃতি নির্দেশ করার জন্য চাঁদের বিভিন্ন প্রতীকী ব্যবহার লক্ষ করা যায়। চাঁদের অবস্থান মর্ত্য থেকে অনেক উপরে। এ কারণে এর সৌন্দর্য দুর্লভ, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাই কখনো

কখনো সুন্দর চাঁদ উচ্চ বর্ণের শাসকশ্রেণির আভিজাত্যেরও প্রতীক হয়ে উঠেছে। নিম্নোদ্ধৃত সবগুলো প্রতীকেরই বিষয় গাথার নায়িক বা নায়িকার দেহসৌন্দর্য বর্ণনা :

১.

চান্দ-সুরজ যেন ঘোড়ায় চড়িল।
চাবুক খাইয়া ঘোড়া শণেতে উড়িল॥
['মহুয়া , মৈগী ১, ২ : ২৬]

'মহুয়া' গাথায় নদের চাঁদ ও নায়িকা মহুয়ার নবজীবনের সূচনায় পিতৃ আলয়ের প্রতিকূল অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে ঘোড়ায় আরোহন এবং ঘোড়ার পিঠে মহুয়ার অবস্থান দেহসৌন্দর্যের দিক থেকে চাঁদের প্রতীকে প্রকাশিত।

২.

ভিন দেশী পুরুষ দেখি চান্দের মতন।
লাজ-রক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৫৪]

'মলুয়া' গাথায় পুকুরঘাটে নিদ্রারত নায়ক চান্দ বিনোদ কৃষকপুত্র হয়েও দেহ সৌন্দর্যে চাঁদের প্রতীকে প্রকাশিত।

৩.

সুলক্ষণা কন্যা তার নামটী কমলা।
চান্দের পসরে যেমন ঘর হইল উজলা॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১২৩]

'কমলা' গাথায় নায়িকা কমলার দেহরূপ চাঁদের আলোর প্রতীকে প্রকাশ পেয়েছে।

৪.

সন্ধ্যাকালের তারা কিম্বা নিশাকালের চান্দ।
লক্ষ্মীরে জিনিয়া রূপ দেইখ্যা লাগে ধন্দ॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১৪৮]

একই গাথায় মইষালের গৃহে নায়িকা কমলাকে নায়ক প্রদীপকুমারের কাছে চাঁদের মত মনে হয়েছে।

৫.

দেখিতে সোনার নাগর গো চান্দের সমান।
সুবর্ণ কার্ত্তিক যেমন গো হাতে ধনুকবান॥
['দেওয়ান ভাবনা', মৈগী ১, ২ : ১৭৮]

'দেওয়ান ভাবনা' গাথায় নায়ক জমিদারপুত্র মাধবের দৈহিক রূপসৌন্দর্য চাঁদের প্রতীক রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

৬.

পালঙ্কে ঘুমায় কন্যা চান্দের সমান।
দেখিয়া সুন্দর কন্যা মায়ের কান্দিল পরাণ॥
['রূপবতী', মৈগী ১, ২ : ২৪৯]

'রূপবতী' গাথায় নায়িকা রূপবতীর দৈহিক লাবণ্যকে চাঁদের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

৭.

চান্দের ছুরত কুমার তোমার কাম-তনু।
মেঘের ঢাকিয়া যেমন প্রভাতের ভানু॥
['কাজলরেখা', মৈগী ১, ২ : ৩২৩]

'কাজলরেখা' গাথায় মৃত নায়ক রাজপুত্র সুঁচরাজার রম্যদেহ প্রকাশের প্রতীক হয়েছে চাঁদ।

৮.

সেইত দীঘল কেশ সনকাঁইচ বরণ।
সাম্‌নে খাড়া সুন্দর কন্যা চন্দ্রের মতন॥
['ভেলুয়া', মৈগী ১, ২ : ১৭৪]

'ভেলুয়া' গাথায় দীর্ঘাঙ্গী কেশের অধিকারিণী নায়িকা ভেলুয়ার সুন্দর দেহের প্রতীক হয়েছে চাঁদ।

৯.

উবুরায় ডাকুইন রাজাগো শিয়রে বসিয়া।
চান্দের সমান রাণী আছুইন শুইয়া॥
['কমলা রাণীর গান', পূগী ২, ২ : ২১২]

'কমলা রাণীর গান' পালায় নায়িকা কমলা রানীর দেহ সৌন্দর্য চাঁদের প্রতীকে প্রকাশিত।

১০.

ছাওয়ালের রূপ যেন কোটি কোটি চান।
শুভক্ষণে জনমিলা পূর্ণ ভগবান॥
['গোপিণী-কীর্ত্তন', পূগী ৩, ২ : ৪৫১]

'গোপিণী-কীর্ত্তন' পালার এ উদ্ধৃতিটি প্রতীকের জগতে এক নতুন ও অভিনব সৃষ্টি। এখানে শিশু শ্রীকৃষ্ণের দেহ সৌন্দর্যকে কোটি কোটি চাঁদের প্রতীকে দেখানো হয়েছে। শিশুর রূপকে একটি চাঁদের প্রতীকে প্রকাশ করলে তার সৌন্দর্য যেন পুরোটা প্রকাশিত হয় না। তাই রচয়িতা এখানে কোটি কোটি চাঁদের প্রতীক নিয়ে শিশুর দেহসৌন্দর্যকে অধিক মাত্রায় আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

১১.

রাবণের কেলিগৃহ গো তাহার মাঝখানে।
চান্দেরে বেড়িয়া যেন গো শোভে তারাগণে॥
['চন্দ্রাবতীর রামায়ণ', পূগী ৪, ২ : ২৩৬]

আলোচ্য উদ্ধৃতিটি কোনো ব্যক্তির উপর আরোপিত প্রতীক নয়। এখানে 'চন্দ্রাবতীর রামায়ণ' গাথায় রাবণের কেলীগৃহকে চাঁদের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে। ঐ গৃহের চারপাশে আরো অনেক গৃহকে মনে হচ্ছে যেন তারকাপুঞ্জ। চাঁদকে ঘিরে এ তারকাপুঞ্জ শোভা পাচ্ছে।

১২.

পাটেতে সাজতী কইন্যা বইসা করে ছান।
সুরূপ সুন্দরী কন্যা পূন্নিমাসীর চান॥
['মইষাল বন্ধু', পূগী ২, ২ : ৫৩]

সাধারণ চাঁদের পাশাপাশি দেহসৌন্দর্যর পূর্ণতার প্রতীক হিসাবে পূর্ণিমার চাঁদও ব্যবহৃত হয়েছে কোথাও কোথাও। সাধারণ চাদ ও পূর্ণিমার চাঁদের পার্থক্য বিস্তর। চাঁদ বলতে যে রূপ প্রকাশ পায়, পূর্ণিমা চাঁদ বলতে তার রূপের দীপ্তি আরো বেশি প্রকাশ পায়। 'মইষাল বন্ধু' গাথায় নায়িকা সাজুতী কন্যার স্নানের দৃশ্যে তাকে পূর্ণিমা চাঁদের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে আলোচ্য উদ্ধৃতিতে।

১৩.

জলেতে ভাসিয়া যায় পুন্নমাসীর চান।
কন্যারে দেখিয়া সাধু হারাইল জ্ঞান॥
['ভেলুয়া', পূগী ২, ২ : ১৪৭]

'ভেলুয়া' গাথায় নায়িকা ভেলুয়ার স্নানের দৃশ্যে পূর্ণিমা চাঁদকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিটিসহ এখানে উভয়ের দেহসৌন্দর্যকে বর্ণনা করতে পূর্ণিমার পূর্ণ সৌন্দর্যসমৃদ্ধ চাঁদই যথার্থ প্রতীক হয়ে উঠেছে।

১৪.

মাণিক সদাইগরের বেটা আমির সাধু নাম।
দেখিতে সোন্দর যেন পুন্নিমার চান॥
['ভেলুয়া', পূগী ৩, ২ : ৮৩]

একইভাবে 'ভেলুয়া' গাথার নায়ক মাণিক সওদাগরের পুত্র আমির সাধুর দেহের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়েও রচয়িতা পূর্ণিমার চাঁদকেই প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

গীতিকায় চাঁদ কখনো কখনো নায়ক বা নায়িকার দেহের উজ্জ্বলতার প্রতীক হিসাবেও ব্যবহৃত হয়েছে। নির্মেঘ আকাশে উজ্জ্বলতার গুণে চাঁদ সর্বত্রই দৃশ্যমান। তাই চাঁদের উজ্জ্বলতা মানবদেহে আরোপিত হলে এর সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা যেন আরো বৃদ্ধি পায়। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলোয় মানবদেহের উজ্জ্বলতার প্রতীক হিসাবে চাঁদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় :

১৫.

নবীন বয়স কন্যা প্রথম যৌবন।
রূপেতে রোসনাই করে চন্দমা যেমন॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১৩০]

'কমলা' গাথায় নায়িকা কমলার প্রথম যৌবনে দেহের উজ্জ্বলতা চাঁদের আলোর প্রতীকে প্রকাশিত।

১৬.

নাকের নিশ্বাসে তার বায়ুতে সুবাস।
চান্দের কিরণ যেমন অঙ্গে পরকাশ॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১৩০]

একই গাথায় নায়িকা কমলার দৈহিক উজ্জ্বলতা পুনরায় চাঁদের আলোর প্রতীকে প্রকাশিত।

১৭.

আচানক পুরুষ এক সঙ্গে তার নারী।
জিনিয়া চান্দের ছটা যেন হুরপরী॥

['রূপবতী', মৈগী ১, ২ : ২৫৪]

'রূপবতী' গাথায় নায়ক মদনের সাথে নায়িকা রূপবতীর দেহ ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পেয়েছে চাঁদের আলোর প্রতীকে।

১৮.

গর্ভেতে মরিয়া শিশু দেবতার বরে।
চন্দ্রসম সেই শিশু দিনে দিনে বাড়ে॥
['কাজলরেখা', মৈগী ১, ২ : ৩৪৫]

'কাজলরেখা' গাথায় মাতৃগর্ভ থেকে সূঁচরাজা মৃত ভূমিষ্ট হলে সন্ন্যাসীর কথায় তার সমস্ত শরীরে সূঁচ বিধিয়ে জঙ্গলের এক মন্দিরে রেখে আসা হলে দেবতার অনুগ্রহে ঐ মৃত শিশু নির্জন মন্দিরে দিনে দিনে যেভাবে বেড়ে উঠছে এবং তার দেহের সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা-ই প্রকাশ পেয়েছে চাঁদের প্রতীকে। প্রথম দিনের চাঁদ যেমন প্রতিদিন অল্প অল্প করে বেড়ে ওঠে ও তার লাবণ্যের বৃদ্ধি ঘটে, মৃত শিশুটির ক্ষেত্রেও তাই ঘটছে।

১৯.

দেখিতে শুনিতে কন্যা আস্‌মানের তারা।
পুরীমাঝে জ্বলে কন্যা চান্দের পশরা॥
['মইষাল বন্ধু', পূগী ২, ২ : ৩৭]

'মইষাল বন্ধু' গাথায় ধনী মহাজন বলরামের কন্যা নায়িকা সাজুতীর দেহ উজ্জ্বলতার প্রতীক হয়েছে চাঁদের আলো।

২০.

তার মধ্যে অধুয়া যে দেখিতে কেমন।
তারার মধ্যেতে যেন চান্দের কিরণ॥
['সুরৎজামাল ও অধুয়া', পূগী ২, ২ : ৪১৬]

'সুরৎ জামাল ও অধুয়া' গাথায় সুরৎ জামালের দর্শন লাভার্থে সুন্দরী পঞ্চভাবী ও দাসী-বাদীসহ ঘাটে আসা সজ্জিত কন্যাদের মধ্যে নায়িকা অধুয়া সুন্দরীর দেহ-উজ্জ্বলতা বর্ণিত হয়েছে চন্দ্রকিরণের প্রতীকে। এখানে স্বভাবতই সব রমণীর মধ্যে অধুয়ার স্থিতি অসংখ্য তারার মধ্যে চাঁদের আলোর প্রতীকে প্রকাশিত।

২১.

চান্দের সমান পুরী ঝিলমিল করে।
যেই জন দেখে পুরী বাখানে সাধুরে॥
['ভেলুয়া', পূগী ২, ২ : ১৪৩]

'ভেলুয়া' গাথায় কাঞ্চননগরের ধনী ব্যবসায়ী মানিক সওদাগরের সুবৃহৎ পুরীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবে। তার সোনার বান্ধা ঘরগুলোর বায়ান্নটি দরজা অভ্র দ্বারা ছাউনী দেওয়া। তার মধ্যে আবার মণিমুক্তা বসান। এমন পুরীটিকেই চাঁদের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে, যা ঝিলমিল করে উজ্জ্বলতার প্রকাশ ঘটিয়েছে।

২২.

সভা কইরিয়া বইস্যা আছে ঠাকুর নদ্যার চান।
আস্‌মানে তারার মধ্যে পূর্ণ মাসীর চান॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ৭]

'মহুয়া' গাথায় বামনকান্দা গ্রামের এক সভার মধ্যে ব্রাহ্মণ জমিদারের পুত্র নায়ক নদের চাঁদের অবস্থান বর্ণনায় একই সাথে দেহসৌন্দর্য ও দেহের উজ্জ্বলতা প্রকাশ করতে পূর্ণ চাঁদের প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রাম্য সভায় উপস্থিত অন্যান্যদের তুলনায় নদের চাঁদের অসামান্য সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা প্রকাশ পেয়েছে এখানে।

২৩.

এই রূপ দেখিয়া বিনোদ হইল পাগল।
চান্দের সমান রূপ করে ঝলমল॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৬৯]

'মলুয়া' গাথায় নায়িকা মলুয়ার দৈহিক সৌন্দর্য ও দেহের উজ্জ্বলতা প্রকাশের প্রতীক হয়েছে চাঁদ।

২৪.

দেখিতে সুন্দর নাগর চান্দের সমান।
ঢেউয়ের উপর ভাসে পুন্নমাসীর চান॥
['চন্দ্রাবতী', মৈগী ১, ২ : ১১৮]

'চন্দ্রাবতী' গাথায় নায়ক জয়ানন্দের ভাসমান মৃতদেহের সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতার বর্ণনায়ও পূর্ণিমাচাঁদ প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যে চন্দ্রাবতী বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তার প্রণয়ী জয়ানন্দের শেষ সাক্ষাতের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে তার কাছেই আবার তার জলে ভাসমান মৃতদেহ প্রতিভাত হয়েছে জলে প্রতিবিম্বিত পূর্ণিমার চাঁদ বলে। কারণ আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের সৌন্দর্যের চেয়ে জলে বিম্বিত সেই চাঁদের লাবণ্য ও সৌন্দর্য অনেক বেশি। নদীজলে ভাসমান জয়ানন্দের দেহও তদ্রুপ।

চাঁদের অবস্থান মর্ত্য থেকে অনেক উপরে। তাই চাঁদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের শাসক শ্রেণির আভিজাত্যেরও প্রতীক হয়ে উঠেছে। নবাব, রাজা, রাজপুত্র, রাজকন্যা, জমিদারপুত্র, জমিদারকন্যা সবারই সামাজিক অবস্থান সাধারণের ঊর্ধে। মর্ত্যের মানুষ যেমন আকাশের চাঁদ ছুঁতে পারে না, তেমনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে উচ্চবিত্ত জমিদার-পরিবারের সম্পর্কও অবাস্তব। তাই নিম্নোদ্ধৃত প্রতীকগুলোতে চাঁদ হয়ে উঠেছে দুর্লভ সৌন্দর্য বা দুর্লভ সামগ্রীর প্রতীক :

২৫.

আশমানের চান্দ যেমন জমিনে পড়িয়া।
নিদ্রা যায় নদীয়ার চান্‌ অচৈতন্য হইয়া॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ২৪]

'মহুয়া' গাথায় নায়ক নদের চাঁদ একজন সম্পন্ন জোতদার; তাই সে সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে এরই প্রকাশ চাঁদের প্রতীকে।

২৬.

চান্দ সূরুজ ডুবুক আমার সংসারে কাজ নাই।

জ্ঞাতি বন্ধু জনে আমি আর ত নাই চাই॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৯৮]

'মলুয়া' গাথায় নায়িকা মলুয়ার আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে ভাঙ্গা নৌকায় নদীতে যাত্রার প্রাক্কালে তার স্বামীর নিঃসঙ্গ জীবনের আর্তি ফুটে উঠেছে চাঁদের প্রতীকে।

২৭.

দেখহ আমার রূপ চান্দের কিরণ।
আমারে ভোগিতে নাই মানুষ এমন॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১৩৩]

'কমলা' গাথায় নায়িকা কমলা নিজের রূপকে নিজেই চাঁদের আলোর প্রতীকে প্রকাশ করে দুর্লভ করে তুলেছে।

২৮.

এক চান্নি উঠে যেন আছমানর উপরে।
আজু কেন দেখি চান দরেয়ার কিনারে॥
['ভেলুয়া', পূগী ৩, ২ : ১১৫]

'ভেলুয়া' গাথায় কারকুন নিদানের প্রেমপত্রের উত্তরে ভেলুয়া চিকন গোয়ালিনীকে রহস্য করে জানায় সে দেবলোকে মদনের রতি, অর্থাৎ চন্দ্রকিরণের মতো দুর্লভ। যে কেউ এ দুর্লভ সৌন্দর্য উপভোগের ক্ষমতা রাখে না। নায়িকা ভেলুয়াকে নদীর তীরে দেখে তার রূপশ্রীতে মুগ্ধ হয়ে ভোলা সওদাগরের মনে হলো যেন আকাশের চাঁদ। তার ধারনায় চাঁদ আকাশেই শোভা পায়, কিন্তু সেই দুর্লভ সৌন্দর্যসম্পন্ন অন্য কোনো বস্তু কিভাবে সে নদীতীরে দেখছে। তাই তার দৃষ্টিতে ভরদুপুরেও ভেলুয়া হয়ে উঠেছে দুর্লভ সৌন্দর্যের প্রতীক চাঁদ।

২৯.

বল বল বল বিবি নিকলি যায় জান।
হাতে লাগত পাইয়ম কখ্খন আছমানের চান॥
['ভেলুয়া', পূগী ৩, ২ : ১২০]

একই গাথায় ভোলা সওদাগর কর্তৃক নৌকায় অপহৃত নায়িকা ভেলুয়া যে আকাশের চাঁদের মতো দুর্লভ তা প্রতীয়মান হয় ভোলা সওদাগরের এ-উক্তি থেকে। সে ভেলুয়াকে আকাশের চাঁদের প্রতীকে প্রকাশ করেছে। চাঁদ যেমন দুর্লভ, অপরের বিবাহিত স্ত্রীও যেন তার কাছে ঐরূপ দুর্লভ সামগ্রী।

৩০.

বেহেস্ত পরীর রাজা যেমন অগ্নির সমান জ্বলে।
চান্দ জন্মিল যেমুন জমিনের কোলে॥
['মুকুটরায়', পূগী ৪, ২ : ১৩৩]

'মুকুটরায়' গাথায় শিলুই রাজার পুত্র নায়ক মুকুটরায়ও আকাশের চাঁদের মতো দুর্লভ বলে তার জন্মও চাঁদের প্রতীকে প্রকাশিত। কারণ চাঁদের অবস্থান ঊর্ধাকাশে, রাজপুত্রও তাই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

৩১.

সাধু কহে পত্যয় না করি তোমার কথা।

ভাঙ্গা ঘরে চান্দের আলো দিয়াছে বিধাতা॥
['জীরালনী', পূগী ৪, ২ : ৪৪৪]

'জীরালনী' গাথায় দুর্লভ সৌন্দর্যের অধিকারী এক রাজকন্যা নায়িকা জীরালনীর রূপও চাঁদের আলোর প্রতীকে প্রকাশিত। চন্দ্রালোক দুর্লভ সৌন্দর্য, যা আশ্রয়দানকারী জেলে-জেলেনীর ভাঙ্গা ঘরে কল্পনার অতীত।

৩২.

চান্দ হইয়া কেন জমিনে বাড়াও হাত।
লোকে যে বলিবে মন্দ শুনিয়া পরছাৎ॥
['ধোপার পাট', পূগী ২, ২ : ৫]

'ধোপার পাট' গাথায় ধোপার কন্যা নায়িকা কাঞ্চনমালার প্রতি রাজপুত্রের প্রেম প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে দুর্লভ চাঁদের প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। আকাশের চাঁদ কখনো ভূমি স্পর্শ করতে পারে না। রাজপুত্রও তেমনি যেন চাঁদের মতো দুর্লভ বস্তু হিসাবে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাই তার ধোপার কন্যার সাথে যেন সম্পর্ক না করে কাঞ্চনমালার এ অভিমত।

৩৩.

পূর্ণিমার চান্দ যেমন দেখি মায়ের কোলে।
সর্ব্বদুঃখ দূর হইল জনমের কালে॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১৫৪]

'কমলা' গাথায় ধনী মানিক চাকলাদারের ছোটপুত্র সুধনকে দুর্লভতার প্রতীক হিসাবে পূর্ণিমা চাঁদের তুলনায় প্রকাশ করা হয়েছে।

৩৪.

সাতনা বচ্ছরের সুনাইগো মুখে মধুর হাসি।
মায়ের কোলে উঠে সুনাইগো পুন্নিমার শশী॥
['দেওয়ান ভাবনা', মৈগী ১, ২ : ১৭৩]

'দেওয়ান ভাবনা' গাথায় নায়িকা সুনাইকে অধরা ও দুর্লভতার প্রতীক হিসাবে পূর্ণিমা চাঁদের তুলনায় প্রকাশ করা হয়েছে।

৩৫.

রাজার ছাওয়াল বন্ধুরে পুন্নুমাসীর চান
আস্মান ছাইড়া কেন বন্ধু জমিনে বিছান রে বন্ধু।
['শ্যামরায়', পূগী ৩, ২ : ২৭৮]

'শ্যামরায়' গাথায় নায়ক রাজপুত্র চাঁদের চাঁদের মতোই দুর্লভ। রাজপুত্ররা সবার উর্দ্ধে অবস্থান করে। তাই এরা শুধু চাঁদ নয়, একেবারে পূর্ণিমা চাঁদের প্রতীকে প্রকাশিত।

৩৬.

ভাঙ্গা ঘরের চান্দের আলো আন্ধাইর ঘরের বাতি।
তোমারে না ছাইড়া থাকিবাম এক দিবারাতি॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৯৮]

'মলুয়া' গাথায় নায়িকা মলুয়া যখন আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে ভাঙ্গা নৌকায় চেপে নদীতে যাত্রা করল তখন শাশুড়ীর নিকট সে হয়ে উঠেছে চাঁদের মতো দুর্লভ।

৩৭.

শয্যাতে শুইয়া কন্যা ভাবে মনে মন।
কোথায় তনে আইল পুরুষ চান্দের মতন॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৫৭]

একই গাথার প্রথমে নায়ক চান্দ বিনোদের সাথে নায়িকা মলুয়ার পরিচয়ের পর নিজগৃহে শুয়ে শুয়ে মলুয়া চান্দবিনোদের কথা ভেবে একই সাথে তার দেহ সৌন্দর্য ও দুর্লভ সৌন্দর্য হিসাবে চাঁদের প্রতীক ব্যবহার করেছে।

৩৮.

আমার সোয়ামী যেমন আসমানের চান।
না হয় দুষমন কাজী নউখের সমান॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৭৬]

একই গাথায় আবার নায়িকা মলুয়া নিজ স্বামী চান্দবিনোদকে আকাশের চাঁদের প্রতীকে প্রকাশ করে দুষমণ কাজীর কাছে দুর্লভ করে তুলেছে। কাজী নেতাই কুটনীকে দিয়ে মলুয়ার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে প্রতি-উত্তর হিসাবে মলুয়া স্বামীকে চাঁদের প্রতীকে প্রকাশ করে অধরা হিসাবে তুলে ধরেছে।

৩৯.

সুনাইরে দেখিয়া ভাবনা হইল অজ্ঞান।
দেখিতে যৈবতী কন্যা পূর্ণিমার চান॥
['দেওয়ান ভাবনা', মৈগী ১, ২ : ১৮৯]

'দেওয়ান ভাবনা' গাথায় নায়িকা সুনাই রূপ, গুণ ও ব্যক্তিত্বে সাধারণের উর্ধে। তাই তার দেহ সৌন্দর্য ও দুর্লভতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে পূর্ণিমা চাঁদ। পূর্ণিমা চাঁদ যেমন ভরা যৌবনের অধিকারী, সুনাইর যৌবনও তেমনি।

৪০.

খসিয়া আস্‌মানের চান্দ ভূঁয়েতে পড়িল।
কেউ বলে বনের লক্ষ্মী বনবাসে আইল॥
['কাঞ্চনমালা', মৈগী ২, ২ : ৯৫]

চাঁদ সর্বদাই স্নিগ্ধ, সুন্দর ও দুর্লভ। 'কাঞ্চনমালা' গাথায় নায়িকা কাঞ্চনমালার দুর্লভ সৌন্দর্যের প্রতীক হয়েছে তাই চাঁদ। চাঁদ সদৃশ এই কাঞ্চনমালাই যেন স্থান পরিবর্তন করে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত।

৪১.

করিয়া শনির পূজারে সাধু পাইল এক ধন
মদন তাহার নাম যেন পুন্নমাসীর চান।
['ভেলুয়া', মৈগী ২, ২ : ১৪২]

'ভেলুয়া' গাথায় নায়ক মদনসাধু বহু সাধনার ফলে জন্মগ্রহণ করে। তাই সে দুর্লভ, আবার তার দৈহিক সৌন্দর্যও চোখে পড়ার মতো। তাই সে পূর্ণিমা চাঁদের প্রতীকে প্রকাশিত।

৪২.

কতদূরে যাইয়া দেখে চরের উপরে।
চান্দ সুরুজ খইস্যা যেন পরছে বালুর চরে॥
['ভেলুয়া', পূগী ২, ২ : ১৮৮]

একই গাথায় নায়িকা ভেলুয়ার সাগরের চরে পড়ে থাকাকে চাঁদের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে। চাঁদের মতো দুর্লভতার কারণে ভেলুয়াকে তার পিতা, পাঁচ ভাই, আবুরাজা, হিরণসাধু, ধনঞ্জয় সাধু কেউ ধরতে পারেনি। নিজেকে রক্ষা করে চাঁদের মতো সে সবার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়ে আত্মবিসর্জনের উদ্দেশ্যে নদীতে ঝাপ দিয়ে দুর্লভতার পরিচয় দিয়েছে। তার দেহসৌন্দর্যও ছিল চাঁদের অনুরূপ। তা-ও একই প্রতীকে প্রকাশিত।

৪৩.

আমার আছমানে তুমি পুন্নিমার চান।
যৌবন দিয়া ঠাণ্ডা কর আসকের পরাণ॥
['কাফেন-চোরা', পূগী ৩, ২ : ৬১]

'কাফেন-চোরা' গাথায় নায়িকা আয়রাবিবিকে দেহসৌন্দর্য ও দুর্লভতার কারণে পূর্ণিমা চাঁদের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে। সর্দারপত্নী আয়রাবিবির রূপলাবণ্য মনসুর ডাকাতের কাছে যেমন দুর্লভ তেমনি তার দেহসৌন্দর্যও পূর্ণিমা চাঁদের মতো। এক প্রতীকেই নায়িকার দ্বিবিধ পরিচয় বিদ্যমান।

মুখের সৌন্দর্য বর্ণনায়ও কখনো কখনো চাঁদ প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। চাঁদের বৃত্তাকৃতি কিংবা উজ্জ্বলতা সবারই মন কাড়ে। এ কারণে মানবদেহের সৌন্দর্য বর্ণনায়, বিশেষত মুখের সৌন্দর্য বর্ণনায় চাঁদের প্রতীক দুর্লভ নয়। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলোর সবই মুখের সৌন্দর্য বর্ণনা এবং তা চাঁদের প্রতীকে প্রকাশিত :

৪৪.

চান্দের সমান মুখ করে ঝলমল।
সিন্দুরে রাঙ্গিয়া ঠুট তেলাকুচ ফল॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১২৫]

'কমলা' গাথায় নায়িকা কমলার সুন্দর মুখের প্রতীক হয়েছে চাঁদ।

৪৫.

চান্দের সমান কন্যা চন্দ্রমুখখানি।
না হইবা হাড়ী-ডোম মনে মনে মানি॥
['কাজলরেখা', মৈগী ১, ২ : ৩৪১]

'কাজলরেখা' গাথায় নায়িকা কাজলরেখার সুন্দর মুখকেও চাঁদের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

৪৬.

শুকাইয়া গেলরে তার সোনার যৌবন।
শুকাইয়া গেলরে তার ও চান বদন॥
['কাফেন-চোরা', পূগী ৩, ২ : ৬৩]

'কাফেন-চোরা' গাথায়ও নায়িকা আয়রা বিবির সুন্দর মুখের প্রতীক হয়েছে চাঁদ।

৪৭.

চান্নির মতন মুখ করে ঝলমল।
রাঙা ঠোঁট যেন তার তেলাকুচি ফল॥
['ভেলুয়া', পূগী ৩, ২ : ৯০]

'ভেলুয়া' গাথায় চাঁদকে উজ্জ্বলতার প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে নায়িকা ভেলুয়ার মুখের উপর তার সৌন্দর্য আরোপ করা হয়েছে।

৪৮.

ফরে কাঠ বিকাইয়া খায় তারা।
হাসি খুসি মুখখানি, যেন পুন্নিমার চান্নি,
সুখে ঘর করে স্বামীপুত্র লইয়া॥
['কাঞ্চনমালা', পূগী ২, ২ : ৯৪]

'কাঞ্চনমালা' গাথায় এক কাঠুরিয়া দম্পতির সুখী জীবনের বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর হাসি-খুশী মুখের সৌন্দর্য বর্ণনায় পূর্ণিমা চাঁদের প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে।

৪৯.

মুখের গঠন মাইয়ার পুন্নিমার শশী।
বচন কোকিলার বোল কানুর হাতর বাঁশী॥
['নেজাম ডাকাইতের পালা', পূগী ২, ২ : ৩৩৫]

'নেজাম ডাকাইতের পালা'য় পাহাড়ী সর্দার কন্যা নায়িকা লালবাইর সুন্দর মুখের গঠন যেন পূর্ণিমার চাঁদের মতো গোল ও পূর্ণ বিকশিত। তাই এখানে পূর্ণিমা চাঁদ হয়ে উঠেছে ঐ কন্যার মুখের গঠনের প্রতীক।

৫০.

মুখখান যেমন তার পুন্নমাসীর চান।
চৌক্ জিনিয়া যেন মিড়কের নয়ান॥
['দেওয়ান ইশা খাঁ মসনদালি', পূগী ২, ২ : ৩৫৩]

'দেওয়ান ইশা খাঁ মসনদালি' পালায় নায়িকা মমিনা খাতুনের বিবাহপূর্ব রূপ বর্ণনায় মুখের সৌন্দর্য প্রকাশেও প্রতীক হয়েছে পূর্ণিমা চাঁদ।

চন্দ্রকলা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে চাঁদের ষোলো ভাগের এক ভাগ। চাঁদের সেই একাংশ নিম্নের উদ্ধৃতিটিতে নায়িকা মলয়ার নবম বর্ষীয় রূপ বর্ণনায় মুখের সৌন্দর্যের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়ে

প্রতীকের ক্ষেত্রে এক নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে। চাঁদের প্রতীক বহুবার বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু মুখের সৌন্দর্য বর্ণনায় প্রতীক হিসাবে চন্দ্রকলার ব্যবহার এখানে অভিনব:

৫১.

মুখখানি দেখি কন্যার যেন চন্দ্রকলা।
কার গলে দিব কন্যা আপন বিয়ার মালা॥
['মলয়ার বারমাসী', পূগী ৪, ২ : ৪০৭]

নিম্নোদ্ধৃত চাঁদের প্রতীকটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রতীক। কারণ এখানে চাঁদকে পবিত্রতা ও শুভ্রতার প্রতীক হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

৫২.

কুলে শীলে তুমি ঠাকুর চন্দ্রের সমান।
না দেখি এমন বংশ এথায় বিদ্যমান॥
['চন্দ্রাবতী', মৈগী ১, ২ : ১০৮]

'চন্দ্রাবতী' গাথায় বংশ গৌরবের পরিচয়দান প্রসঙ্গে চাঁদের এ-প্রতীকটি ব্যবহৃত হয়েছে। চাঁদ যেমন তার সৌন্দর্য, অবস্থান, রং, আকৃতি সর্বদিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ; একই সাথে সে যেমন পবিত্রতা ও শুভ্রতারও প্রতীক, ঠিক সেই প্রতীকই ব্যবহার করা হয়েছে গাথার নায়িকা চন্দ্রাবতীর পিতা বংশীদাসের উপর। একজন ঘটক চন্দ্রাবতীর পিতা বংশীদাসের বাড়ি এসে কন্যা সম্পর্কে পিতার কুল ও বংশের প্রশংসায় চাঁদের প্রতীকেই প্রকাশ করেছে। বংশগৌরবে সে যেন সর্বগুণে ভূষিত ঐ চাঁদের মতো।

চাঁদ সৌন্দর্য, স্বচ্ছতা ও শুভ্রতার প্রতীক হলেও নিম্নের উদাহরণে চাঁদ ব্যবহৃত হয়েছে ক্রমবর্ধমানতার প্রতীক হিসাবে :

৫৩.

মায়ের অঞ্চলের নিধি গো মায়ের পরাণী।
দিন দিন বাড়ে যেমন চাঁদের লাবণী॥
['দস্যু কেনারামের পালা', মৈগী ১, ২ : ১৯৪]

'দস্যু কেনারামের পালা'য় নায়ক কেনারামের জন্ম-পরবর্তী অবস্থায় মাতৃক্রোড়ে দৈহিক বৃদ্ধিকে চাঁদের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা জানি কেনারামের গায়ের রং ছিল কালো। তাই এখানে এ-অর্থে চাঁদ ব্যবহৃত হয়নি যে চাঁদের মতো কেনারামের রূপলাবণ্য বৃদ্ধি পেতে লাগল। বরং চন্দ্র উদিত হলে যেমন প্রতিকলায় বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণিমায় পূর্ণতা লাভ করে, কেনারামের দৈহিক গড়নও যেন সেরূপ বৃদ্ধি পেয়ে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে যা প্রকাশ পেয়েছে ক্রমবর্ধমান চাঁদের প্রতীকে।

দ্বিতীয়ার চাঁদ সূক্ষ্ম, ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ীত্বের প্রতীক। তা-ই ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নের উদাহরণটিতে :

৫৪.

আলৃগে থাকি চান্দ ভাঁড়ালী নজর করি চায়।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন পালঙ্কে দেখা যায়॥
['চৌধুরীর লড়াই', পূগী ৩, ২ : ৪০৬]

এখানে পালঙ্কে শুয়ে থাকা নায়িকা রঙ্গমালার রূপবর্ণনায় দ্বিতীয়ার চাঁদের প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। সে যেন চিন্তায় চিন্তায় ক্ষীণ ও স্থূলকায় হয়ে এসেছে। ক্ষণিক বাদেই যেন সে তার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলবে।

ভাদ্রের আকাশ তথা শরতের আকাশ থাকে মেঘমুক্ত ও স্বচ্ছ। এ কারণে ঐ সময়ের চাঁদের অবস্থানও থাকে স্পষ্ট। চাঁদের স্বচ্ছ আলোতে নদীর তলদেশ পর্যন্ত যেন দেখা যায়। তাই ভাদ্রের চাঁদকে নিম্নের উদাহরণটিতে স্বচ্ছতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে :

৫৫.

ভাদ্র মাসের চান্নি যেমন দেখায় গাঙ্গের তলা।
বৃক্ষতলে গেলে কন্যা বৃক্ষতল আলা॥
['কঙ্ক ও লীলা', মৈগী ১, ২ : ২৭০]

এখানে নায়িকা লীলার দৈহিকসৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ভাদ্র মাসের চাঁদের প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে; তার দেহের শুভ্রতা ও স্বচ্ছতায় বনও আলোকিত হয়ে যায়। ভাদ্রের জ্যোৎস্না যেমন নদীর তলদেশ পর্যন্ত প্রকাশ করে, লাবণ্যময়ী নায়িকা লীলার রূপদ্যূতিও যেন তেমনি রূপ রহস্যের অতল পর্যন্ত প্রসারিত।

সূর্য

চাঁদের তুলনায় লোকগীতিকাগুলোতে সূর্যের প্রতীক কম। নারী কমণীয়তার প্রতীক। কিন্তু সূর্য তেজ ও দীপ্ততার প্রতীক। তাই নারী বর্ণনায় রচয়িতারা সূর্যকে ব্যবহার করা থেকে বিরত থেকেছেন। গাথায় যে কয়েকটি সূর্যের প্রতীক পাওয়া যায় তার বেশিরভাগই নায়কের তেজস্বীতা বা ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত। সূর্যরশ্মিতে সবগুলো রং বিদ্যমান। তাই একে সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে কোথাও কোথাও নায়িকার দেহসৌন্দর্যে উজ্জ্বলতা বা দীপ্তির প্রতীক হিসাবেও ব্যবহার করা হয়েছে। যেমনঃ

৫৬.

চান্দ-সুরজ যেন ঘোড়ায় চড়িল।
চাবুক খাইয়া ঘোড়া শূণেতে উড়িল॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ২৬]

'মহুয়া' গাথায় নদের চাঁদ মহুয়াকে নিয়ে নবজীবনের সূচনায় পিতৃ-আলয়ের প্রতিকূল অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে ঘোড়ায় উঠেছে অজানার উদ্দেশ্যে। এই ঘোড়ার পিঠে নায়ক নদের চাঁদের দেহ সৌন্দর্যকে সূর্যের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে। নিজ প্রণয়িণীকে নিয়ে ঘোড়ায় আরোহন যেন সূর্যের মত ক্ষমতাধর নায়কের পক্ষেই সম্ভব। এখানে নায়কের সৌন্দর্য ও ক্ষমতা দুটোরই প্রতীক হয়েছে সূর্য।

৫৭.

চান্দ সূরুজ ডুবুক আমার সংসারে কাজ নাই।
জ্ঞাতি বন্ধু জনে আমি আর ত নাই চাই॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৯৮]

'মলুয়া' গাথার শেষ দৃশ্যে নায়িকা মলুয়া যখন আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে ভাঙ্গা নৌকায় চেপে নদীতে যাত্রা করল তখন তার স্বামী চান্দ বিনোদের কাছে মলুয়া হয়ে উঠেছে সব হারানো ও আসন্ন অন্ধকারের প্রতীক অস্তাচলগামী সূর্যস্বরূপ।

৫৮.

সূর্য্যের সমান রূপ বংশের দুলাল।
সুখেতে থাকিব কন্যা জানি চিরকাল॥
['চন্দ্রাবতী', মৈগী ১, ২ : ১০৯]

'চন্দ্রাবতী' গাথায় জনৈক ঘটক নায়ক জয়চন্দ্রের রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে সূর্যের প্রতীক ব্যবহার করেছে এভাবে।

৫৯.

কতদূরে যাইয়া দেখে চরের উপরে।
চান্দ সুরুজ খইস্যা যেন পরছে বালুর চরে॥
['ভেলুয়া', পূগী ২, ২ : ১৮৮]

'ভেলুয়া' গাথায় জলে ঝাপ দেওয়া ভেলুয়ার সাথে হিরণ সাধুর বোন মেনকার দেহসৌন্দর্যকে সূর্যের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

৬০.

বাহিরে যাইয়া দাসী দেখে সদাইগরে।
সূরুয যেন উডিয়াছে আছ্মানর উপরে॥
['ভেলুয়া', পূগী ৩, ২ : ৯৬]

'ভেলুয়া' গাথার নায়ক সওদাগর আমির সাধুর দেহসৌন্দর্যও সূর্যের প্রতীকে প্রকাশিত। এখানে নায়িকা ভেলুয়ার হিরণী কবুতর তীরে বিদ্ধ করায় তাকে ভেলুয়ার সাত ভাই বন্দি করলে ভেলুয়া দাসী পাঠিয়ে সওদাগরের আঙ্গুল কেটে আনার হুকুম করে। দাসী আমির সাধুর কাছে গিয়ে তার যে রূপ ও সাজ দেখল তাতে তাকে সূর্যের প্রতীকে প্রকাশ করাই যথার্থ।

৬১.

আবে করে ঝিলিমিলি সোণার বরণ ঢাকা।
প্রভাতকালে আইল অরুণ গায়ে হলুদ মাখা॥
['চন্দ্রাবতী', মৈগী ১, ২ : ১০৫]

'চন্দ্রাবতী' গাথায় নায়ক জয়ানন্দের মনে নায়িকা চন্দ্রাবতীর প্রতি অনুরাগ জন্মাবার পরের দিন প্রভাতে চন্দ্রাবতীর প্রতীক্ষারত জয়ানন্দের অনুরাগরঞ্জিত মনের চিত্রটি প্রভাত সূর্যের প্রতীকে প্রকাশিত। প্রভাতে উদিত সূর্যের শরীর যেমন হলুদরঞ্জিত, ঐদিন সকালে চন্দ্রাবতীও যেন হলুদ দ্বারা স্নাত হয়ে উদিত হয়েছে।

৬২.

চান্দের ছুরত কুমার তোমার কাম-তনু
মেঘেতে ঢাকিয়া যেমন প্রভাতের ভানু॥
['কাজলরেখা', মৈগী ১, ২ : ৩২৩]

'কাজলরেখা' গাথার নায়ক রাজপুত্র সূঁচরাজার দেহসৌন্দর্যও প্রভাতসূর্যের প্রতীকে প্রকাশিত। প্রভাতের সূর্যকে যেমন মেঘে ঢেকে রাখলেও তার চারপাশ দিয়ে হলুদ আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে, তেমনি যেন সূঁচ বিধানো মৃত রাজপুত্রের সৌন্দর্যও প্রকাশিত হচ্ছে।

৬৩.

প্রভাতের ভানু জিনি ছুরত সুন্দর।
একে একে দেখে কন্যা সর্ব্ব কলেবর॥
['কাজলরেখা', মৈগী ১, ২ : ৩২৭]

একই গাথায় নবজীবনপ্রাপ্ত নায়ক সূঁচরাজার দেহসৌন্দর্যও জন্মের প্রতীকরূপে প্রভাত সূর্যের সৌন্দর্যে প্রকাশিত।

৬৪.

অপরূপ রূপ তার রে দেখিতে সুন্দর,
কাঞ্চা সোনার তনু পরভাত কালের ভানু,
নাম তার মদন সদাগর রে।
['ভেলুয়া', পূগী ২, ২ : ১৪২]

'ভেলুয়া' গাথায় নায়ক মদন সাধুর রূপ বর্ণনাও প্রকাশিত হয়েছে প্রভাত সূর্যের প্রতীকে।

প্রভাতের সূর্য হলুদ রঞ্জিত এবং তা জন্মের প্রতীক। কারণ তার আগমনে ধরণী আলোকিত হয় এবং সবকিছু যেন প্রাণ পায়। আর তাই পূর্বোক্ত চারটি উদ্ধৃতিতেই প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে প্রভাতের সূর্য।

নক্ষত্র

বাংলা লোকগীতিকায় প্রতীক হিসাবে চাঁদ ও সূর্যের পাশাপাশি তারা বা নক্ষত্রের ব্যবহারও দেখা যায়। তারা উজ্জ্বলতা বা সৌন্দর্যের প্রতীক। তাই গীতিকায় নায়ক-নায়িকার রূপবর্ণনা বা দেহ সৌন্দর্য বর্ণনায়ও প্রতীক হিসাবে তারা ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নের উদাহরণগুলোয় প্রতীক হিসাবে তারার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় :

৬৫.

হেও বাক ফিরাইয়া অন্য বাকে যায়।
নৈক্ষত্র ছুটিল দেখা যায় বা না যায়॥
['ভেলুয়া', পূগী ২, ২ : ১৮৫]

আকাশের গ্রহ-নক্ষত্ররাজী এত দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে যা সাধারণ চোখে দেখাই কষ্টকর। এই নক্ষত্রের দ্রুততার প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে 'ভেলুয়া' গাথায় পেছন থেকে স্বজনদের তাড়া খাওয়া নায়ক-নায়িকার নৌকার গতিবেগ বর্ণনায়। নক্ষত্রের স্থানচ্যুতি যেমন মূহুর্তেই ঘটে থাকে, মদন সাধুর ডিঙ্গাখানিও তেমনি যেন ভেলুয়াকে নিয়ে নিরাপদ গন্তব্যের প্রত্যাশী। এখানে নক্ষত্রের স্থান পরিবর্তনের দ্রুততাই হয়ে উঠেছে নৌকার গতিবেগ প্রকাশের অনুষঙ্গ।

৬৬.

মেঘের সমান কেশ তার তারার সম আঁখি।
এই দেশেনি উইড়া আইছে আমার তোতা পাখী॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ২০]

'মহুয়া' গাথায় নদের চাঁদ কর্তৃক নায়িকা মহুয়ার অনুসন্ধানে তার পরিচিতি ও রূপ বর্ণনায় চোখকে তারার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

৬৭.

জলের না পদ্মফুল শুকনায় ফুটে রইয়া।
আসমানের তারা ফুটে মঞ্চেতে ভরিয়া॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৫৩]

'মলুয়া' গাথায় চান্দ বিনোদ নায়িকা মলুয়ার অখণ্ড দেহরূপকে আকাশের তারার প্রতীকে প্রকাশ করেছে। তার দৃষ্টিতে আকাশের মিট মিট করা তারা যেন পৃথিবী ভরে ফুটে রয়েছে।

৬৮.

দেখিতে শুনিতে কন্যা আস্মানের তারা।
পুরীমাঝে জ্বলে কন্যা চান্দের পশরা॥
['মইষাল বন্ধু', পূগী ২, ২ : ৩৭]

'মইষাল বন্ধু' গাথায় নায়িকা সাজুতীর রূপ বর্ণনায় দেহের উজ্জ্বলতা প্রকাশে আকাশের তারার প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে।

৬৯.

ঝলমল করে যেমন আসমানের তারা।
কি সুন্দর পুত্র অইল মায়ের কোল জোড়া॥
['দেওয়ান ইশা খাঁ মসনদালি', পূগী ২, ২ : ৩৭২]

'দেওয়ান ইশা খাঁ মসনদালি' পালায় ইশা খাঁর পুত্র আদম খাঁ মসনদালির রূপ বর্ণনায়ও দেহের উজ্জ্বলতা প্রকাশে আকাশের তারার প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে।

৭০.

সিঁথিতে সিঁথানি কন্যা তারা যেন জলে।
বাহার করিয়া সাড়ী তুলিল কাঁকালে॥
['মুকুটরায়', পূগী ৪, ২ : ১৪৪]

'মুকুটরায়' গাথায় নায়িকা বনচারিণী ব্যাধকন্যাকে সভ্যসমাজের অলঙ্কারে ভূষিত করায় তার যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে তার অংশস্বরূপ মাথার চুলের সিঁথিতে উজ্জ্বলতার প্রতীক হিসাবে তারার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পেয়েছে আলোচ্য প্রতীকাশ্রয়ী চিত্রকল্পটিতে।

৭১.

আসমান হইতে জলে তারা যেন খসে।
জোয়ারিয়া গাঙ্গের ডেউয়ে সাপল ফুল ভাসে॥
['আন্ধাবন্ধু', পূগী ৪, ২ : ২০৭]

'আন্ধাবন্ধু' গাথায় নায়ক বংশীবাদক ও নায়িকা রাজকন্যার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর উভয়ের ভাসমান অখণ্ড দেহরূপে তারকার উজ্জ্বলতা দৃষ্ট হওয়ায় উভয়ের দেহসৌন্দর্য তারার প্রতীকে প্রকাশিত।

৭২.

অতিদীর্ঘ জটাভার গো পড়ে ভূমিতলে।
ললাটে চন্দন তিলা গো তারা যেন জ্বলে॥
['চন্দ্রাবতীর রামায়ণ', পূগী ৪, ২ : ২৪৯]

'চন্দ্রাবতীর রামায়ণ' গাথায় এক মুণির দেহ বর্ণনায় কপালের একটি বিশেষ পরিচিতিমূলক তিলকে প্রতীক হিসাবে আকাশের তারার ঔজ্জ্বল্যের অনুষঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে। মুণির কপালের বিশেষ চন্দনতিলাটিকে মনে হয় যেন নির্মেঘ আকাশে তারা জলজল করছে।

৭৩.

দুই নয়ানে দুই মণি যেন কালা তারা।
ফুলের উপর মধু খায়া ঘুমায় ভোমরা॥
['সোণারায়ের জন্ম', পূগী ৪, ২ : ৪৭৪]

'সোণারায়ের জন্ম' গাথায় নায়িকা ফুল বেগমের রূপবর্ণনায় চোখের মণির উজ্জ্বলতা প্রকাশে কালো তারার প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। তবে কালো তারার ব্যবহার এখানে অভিনব।

৭৪.

সন্ধ্যাকালের তারা কিম্বা নিশাকালের চান্দ।
লক্ষ্মীরে জিনিয়া রূপ দেইখ্যা লাগে ধন্দ॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১৪৮]

এখানে 'কমলা' গাথায় নায়িকা কমলার দেহসৌন্দর্য সন্ধ্যাতারার প্রতীকে প্রকাশিত।

৭৫.

সেজুতিয়া তারা যেমুন জ্বলে দুই আঁখি।
রাঙ্গা রাঙ্গা দুই ঠোঁট সিন্দূরেতে মাখি॥
['জীরালনী', পূগী ৪, ২ : ৪৩০]

'জীরালনী' গাথায়ও রূপসী নায়িকা জীরালনীর প্রথম যৌবনের রূপবর্ণনায় চোখের সৌন্দর্য সন্ধ্যাতারার প্রতীকে প্রকাশিত।

৭৬.

সাজুতীয়ার তারা যেমন লীলার দুটী আঁখি।
কোঠরে বসিল চক্ষু দেখি বা না দেখি॥
['কঙ্ক ও লীলা', মৈগী ১, ২ : ৩০৯]

একইভাবে 'কঙ্ক ও লীলা' গাথার নায়িকা লীলার দুচোখের বর্ণনায়ও সন্ধ্যাতারার প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এখানে রূপবর্ণনার বিপরীত অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে। যার চোখ ছিল সন্ধ্যাতারার মতো উজ্জ্বল ও জলজলে, কঙ্কের দুঃসংবাদে ও বিরহে সেই সন্ধ্যাতারার সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যেতে বসেছে। সন্ধ্যাতারা সন্ধ্যায় ক্ষণিকের জন্য উঠে দর্শককে আকৃষ্ট করে আবার হারিয়ে যায়। তাই সন্ধ্যাতারা ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে পূর্বোক্ত তিনটি উদ্ধৃতিতেই।

মেঘ

মেঘ একই সঙ্গে কালো রং এবং গতিশীলতার প্রতীক। মেঘের বরণ কালো হওয়ায় নিম্নের উদাহরণ দুটোয় মেঘ হয়েছে কালোর প্রতীক :

৭৭.

মেঘের সমান কেশ তার তারার সম আঁখি।
এই দেশেনি উইড়া আইছে আমার তোতা পাখী॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ২০]

'মহুয়া' গাথায় নিরুদ্দেশ হওয়া মহুয়ার সন্ধানে নদের চাঁদ তার রূপের বর্ণনায় মহুয়ার কালো চুলকে মেঘের প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

৭৮.

শ্রাবণ মাসেতে যেন কাল মেঘ সাজে।
দাগল-দীঘল কেশ বায়েতে বিরাজে॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১২৫]

'কমলা' গাথায় নায়িকা কমলার রূপবর্ণনায়ও তার সুদীর্ঘ কালো চুলের গাঢ়তা প্রকাশ করতে শ্রাবণ মাসের মেঘের প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে।

নিম্নের উদাহরণটিতে কালমেঘ ব্যবহৃত হয়েছে বিশাল ও ভয়ংকর অবস্থার প্রতীক হিসাবে :

৭৯.

পাহাড়িয়া দেহ যেন কাল মেঘের সাজ।
যমদূতগণ সঙ্গে যেন যমরাজ॥
['দস্যু কেনারামের পালা', মৈগী ১, ২ : ১৯৯]

বৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তে আকাশ কালো করে যে মেঘের আয়োজন চলে তা বিশাল ও ভয়ংকর। 'দস্যু কেনারামের পালা'য় দ্বিজ বংশীদাসের সম্মুখে দণ্ডায়মান দস্যু কেনারামের দেহও যেন তাই কালো মেঘের প্রতীকে প্রকাশিত।

৮০.

মাও নাই বাপও নাই গর্ভসোদর ভাই।
আসমানের মেঘ যেমন ভাসিয়া বেড়াই॥
['কাজলরেখা', মৈগী ১, ২ : ৩২৮]

আকাশের মেঘ সর্বদা ভেসে বেড়ায়, কোথাও তার স্থিতি নেই এবং তার গন্তব্যও উদ্দেশ্যহীন। 'কাজলরেখা' গাথায় সূচ রাজার নিকট কাজলরেখা তার পরিচয় প্রসঙ্গে নিজেকে গন্তব্যহীন হিসাবে নিরুদ্দিষ্টতার প্রতীক স্বরূপ মেঘের প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

৮১.

আসমানেতে কালমেঘ চান্দে ঢাইক্যা রাখে।
ভাঙ্গা কেশ পড়ে যখন রে সুন্দর কন্যার মুখে॥
['ভেলুয়া', পূগী ২, ২ : ১৪৪]

'ভেলুয়া' গাথায় নায়িকা ভেলুয়ার রূপবর্ণনায় তার সুন্দর মুখের উপর পতিত ভাঙ্গা কেশের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে কালোমেঘ।

বিজলী

মেঘের ঘর্ষণে বিজলীর সৃষ্টি হয় যা মুহূর্তের জন্য সব আলোকিত করে আবার হারিয়ে যায়। তাই বিজলী উজ্জ্বলতা, আকস্মিকতা ও ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যের প্রতীক। প্রতীক হিসাবে বাংলা লোকগীতিকায় বিজলীর বিভিন্ন ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় :

৮২.

হাসিতে ঝলকে যেন বিজলির রেখা।
মুখেতে মুক্তার ছড়া জুড়ে যায় দেখা॥
['কাফেন-চোরা', পূগী ৩, ২ : ৫৫]

'কাফেন-চোরা' গাথায় অনিন্দ্যসুন্দরী আয়রাবিবির হাসিতে দাঁতের ক্ষণিক প্রকাশে উজ্জ্বলতা ও ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবে বিজলীর সৌন্দর্য ব্যবহৃত হয়েছে।

৮৩.

হাসিতে বিজলী ঝরে অতি চমৎকার।
চাচর চিকন কেশ পায়ে পড়ে তার॥
['ভেলুয়া', পূগী ৩, ২ : ৯০]

'ভেলুয়া' গাথায়ও নায়িকা ভেলুয়ার হাসিতে দাঁতের উজ্জ্বলতা ও ক্ষণস্থায়ীত্বকে বিজলীর প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

৮৪.

পাল্‌কি হৈতে বাহির হৈল বিজলীর কণা।
ভেলুয়ারে দেখি কাজির হইল ভাবনা॥
['ভেলুয়া', পূগী ৩, ২ : ১৩২]

একই গাথায় নায়িকা ভেলুয়ার পাল্‌কি থেকে নির্গমনকে দুষ্ট কাজীর কাছে ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যের প্রতীক বিজলীর মতো মনে হয়েছে।

৮৫.

আড় নয়ানে চাইল কৈন্যা আড় নয়ানে চাইল।
বিজলী চমকি যেন মেঘের কোলে ধাইল॥
['নুরন্নেহা ও কবরের কথা', পূগী ৪, ২ : ১০৩]

'নুরন্নেহা ও কবরের কথা' গাথায় নায়িকা নুরন্নেহার আড় নয়নে তাকানোর ব্যাখ্যায় বিজলীর প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। নুরন্নেহার চোখ এবং তার ক্ষণিক দৃষ্টিপাত যেন বিজলীর চকিত আলোকরশ্মির ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য বহন করেছে এখানে।

৮৬.

মেঘের অঙ্গেতে যেমন গো বিজলীর ঝলা।
চলিছে সোণার মৃগ গো বন করি উজলা॥
['চন্দ্রাবতীর রামায়ণ', পূগী ৪, ২ : ২৫৭]

'চন্দ্রাবতীর রামায়ণ' গাথায় একটি প্রতীকী হরিণকে বিজলীর প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

৮৭.

কোপালেতে ভাগ্যরেখা চমকে বিজুলি।
কুষ্ঠির মাঝে লেখা আছে রাজা হৈব বুলি॥
['কমল সদাগরের পালা', পূগী ৩, ২ : ২২৫]

'কমল সদাগরের পালা'য় কমল সওদাগরের বড়পুত্র চানমণির কপালের ভাগ্যরেখা ক্ষণিকের জন্য তার সমৃদ্ধিময় ভবিষ্যতকে যেন বিজলীর উজ্জ্বলতার প্রতীকে দেখিয়ে দিয়ে গেল।

৮৮.

কর্‌সাত কি বলিব বিজলীর মত।
মইফুলা আসি ধরে মাণিকের হাত॥
['কমল সদাগরের পালা', পূগী ৩, ২ : ২৪৬]

একই গাথায় কমল সওদাগরের দ্বিতীয় স্ত্রী সোনাই মাণিক সওদাগরের মাধ্যমে তার সতীন পুত্রদ্বয়কে হত্যা করতে গেলে দাসী মইফুলা তার তলোয়ারশুদ্ধ হাত আকস্মিকভাবে চেপে ধরে যেভাবে পুত্রদ্বয়কে রক্ষা করল তা-ই বর্ণিত হয়েছে বিজলীর প্রতীকে। এখানে দাসী মইফুলার মাতৃহৃদয়ের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

বজ্র

বজ্রপাত হঠাৎ বিপদ, ধ্বংস ও প্রচণ্ডতার প্রতীক। কারণ এগুলো প্রচণ্ড বেগে হঠাৎ পতিত হয় এবং বৃক্ষাদি ও মানবদেহ পুড়ে ছাই করে দিয়ে যায়। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলোয় তাই প্রতীক হিসাবে বজ্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়:

৮৯.

শিরেতে পড়িল বাজ মঠের মাথায় ফোড়।
পুরীর যত বাদ্যভাণ্ড সব হৈল দূর॥
['চন্দ্রাবতী', মৈগী ১, ২ : ১১৩]

৯০.

ধূলায় বসিল ঠাকুর শিরে দিয়ে হাত।
বিনা মেঘে হইল যেন শিরে বজ্রাঘাত॥
['চন্দ্রাবতী', মৈগী ১, ২ : ১১৩]

'চন্দ্রাবতী' গাথার পূর্বোক্ত দুটি উদ্ধৃতিতেই দুঃসংবাদের কারণে নায়িকা চন্দ্রাবতীর বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার হঠাৎ বিপদকে বজ্রের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ চন্দ্রাবতীর সাথে নায়ক জয়চন্দ্রের বিয়ের সমস্ত

আয়োজন যখন সম্পন্নপ্রায় তখন হঠাৎ শোনা গেল জয়চন্দ্র এক মুসলমান কন্যাকে বিয়ে করে জাতিনাশ করেছে। ফলে বিয়ে বাড়ীর সমস্ত আয়োজন বন্ধ হয়ে গেল।

৯১.

কপাটে আঘাত করে শিরে দিয়া হাত।
বজ্রের সমান করে বুকেতে নির্ঘাত॥
['চন্দ্রাবতী', মৈগী ১, ২ : ১১৭]

একই গাথার শেষে নায়ক জয়চন্দ্র প্রবল প্রেমের আকর্ষণে যখন চন্দ্রাবতীর বন্ধ মন্দির দ্বারে বসে বুক চাপড়ে বিলাপ করতে থাকে তখন আঘাতের প্রচণ্ডতাই প্রকাশ পেয়েছে বজ্রের প্রতীকে।

৯২

গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে জিল্কি ঠাডা পড়ে।
অভাগী জননী দেখ ঘরে পুইরা মরে॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৫০]

বিদ্যুৎ চমকের পর বজ্রপাত যেমন হঠাৎ বিপদের প্রতীক তেমনি ভয়ংকর ও দুর্ঘটনারও প্রতীক। তাই 'মলুয়া' গাথায় লক্ষ করা যায় একমাত্র পুত্র বিনোদের অনুপস্থিতিতে বৃদ্ধা মাতার অবলম্বনহীন জীবনের উৎকণ্ঠিত রূপ প্রকৃতির ভয়ংকর অবস্থার মধ্য দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য এখানে বজ্রপাতের বিদ্যুৎদহন নয়, শিকারের উদ্দেশ্যে যাত্রারত পুত্রের জীবনে দুর্ঘটনা কল্পনা করে বৃদ্ধা মাতার মনে দুশ্চিন্তার অগ্নিদহনের বিষয়টি প্রতীকায়িত হয়েছে বজ্রপাতের প্রতীকে।

মেঘের গর্জন

মেঘের গর্জনে প্রকৃতি এক ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। মনে হয় যেন এক অজানা ক্রোধে মেঘেরা ডাকছে। তাই ভয়ংকর ও ক্ষিপ্ত বা ক্রোধের প্রতীক হিসাবে মেঘের গর্জন ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নের উদ্ধৃতি দুটোয় :

৯৩.

আক্ষিতে জালিছে তার জ্বলন্ত আগুনি।
নাকের নিশ্বাস তার দেওয়ার ডাক শুনি॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ৩৯]

৯৪.

গর্জিয়া উঠে কালা দেওয়া হাতে লইয়া ছুরি।
মহুয়ার হাতেতে দিল বিষলক্ষের ছুরি॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ৪০]

প্রথম উদ্ধৃতিতে হুমরা বেদে নদের চাঁদের প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে মহুয়ার হাতে বিষলক্ষের ছুরি দিয়ে তাকে হত্যা করতে বলার সময়ে হুমরার ক্রোধান্বিত মানসিক অবস্থার বর্ণনায় তার নাকের নিঃশ্বাসকে মেঘের গর্জনের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে একই গাথায় হুমরার পছন্দের ব্যক্তিকে মহুয়া প্রত্যাখ্যান করায় হুমরার ক্রোধান্বিত অবস্থা কালো মেঘের গর্জনের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

৯৫.

পূবেতে উঠিল ঝড় গর্জিয়া উঠে দেওয়া।
এই সাগরের কূল নাই ঘাটে নাই খেওয়া॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৯৯]

মেঘের গর্জন ভয়ংকর বা ক্রোধের প্রতীক হলেও 'মলুয়া' গাথার এ উদ্ধৃতিতে তা ব্যবহৃত হয়েছে ভিন্ন অর্থের প্রতীক হিসাবে। সমাজের নানা প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম করে ক্লান্ত মলুয়া সীমাহীন ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে আত্মবিসর্জনে উদ্যোগী হয়। তাই এখানে ধাবমান ঝড় ও মেঘের গর্জন সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ অনুশাসনের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়ে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে।

শেওলা

পানির স্রোতে অনিশ্চিত গন্তব্যের উদ্দেশ্যে শেওলা সর্বদা ভাসতে থাকে। আর তাই ছিন্নমূল, অসহায় ও অনিশ্চিত জীবনের প্রতীক হিসাবে গীতিকায় শেওলার নিম্নোক্ত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় :

৯৬.

নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভ সুদর ভাই।
সুতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ১১]

৯৭.

নাহি পিতা নাহি মাতা নাহি সোদর ভাই।
জলের শেওলা-সম ভাসিয়া বেড়াই॥
['রূপবতী', মৈগী ১, ২ : ২৫৪]

৯৮.

মাতা নাই সে পিতা নাই সে আমার গর্ভ সোদর ভাই।
সোতের শেওলা হইয়া ভাসিয়া বেড়াই॥
['কাঞ্চনমালা', পূগী ২, ২ : ৯৫]

৯৯.

মাও নাই সে বাপ নাই সে রে আমার গর্ভ সোদরার ভাই।
পানির মুখে সেওলার মত আমি ভাসিয়া বেড়াই রে॥
['আয়নাবিবি', পূগী ৩, ২ : ২১০]

দেখা যাচ্ছে যে, 'মহুয়া', 'রূপবতী', 'কাঞ্চনমালা' ও 'আয়নাবিবি' গাথায় নায়িকারা নিজ নিজ জীবনের অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছে স্রোতের শেওলার প্রতীকে।

১০০.

সুতের সেওলা হৈয়া ভাসিয়া বেড়ায়।
তৃতীয় বারেতে পুন হারাইলা মায়॥
['কঙ্ক ও লীলা', মৈগী ১, ২ : ২৭০]

'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় নায়ক কঙ্ক ছয় মাস বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন হলে যার কাছে সে আশ্রয়লাভ করে সে-ই মৃত্যুবরণ করে। ফলে কঙ্কও স্রোতের শেওলার মতো গন্তব্যহীন ও অসহায়।

১০১.

সুতের সেওলা যেমন সুতে করে ভর।
তোমারে হারাই পাছে তেই সে মোর ডর॥
['রাজা তিলকবসন্ত', পূগী ৪, ২ : ৩৯৪]

'রাজা তিলকবসন্ত' গাথায় অন্ধ নায়ক তিলকবসন্ত শিকারে যেতে চাইলে নায়িকা ভবিষ্যত অসহায়ত্বের আশঙ্কায় তাকে যেতে নিষেধ করে জানায় স্রোতকে অবলম্বন করে যে শেওলার অস্তিত্ব, তিলকবসন্তকে অবলম্বন করে তারও সেই অস্তিত্ব। অতএব তাকে হারালে নিজে যে অসহায় অবস্থায় পতিত হবে তাকেই সে স্রোতের শেওলার প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

১০২.

পরের লাগিয়া সাধু কপালের ফেরে।
স্রোতের সেওলা হইয়া ভাসিল সায়রে॥
['ভেলুয়া', পূগী ২, ২ : ১৯৩]

'ভেলুয়া' গাথায় নায়ক মদন সাধু নায়িকা ভেলুয়ার রূপৈশ্বর্যের কারণে তাকে নিয়ে যাযাবরের মতো অনিশ্চিত গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যেভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে তা-ই প্রকাশ করা হয়েছে শেওলার প্রতীকে।

পাহাড়-পর্বত

শ্রেষ্ঠতা, সমুচ্চতা, বিশালতা, অটল-অনড়তা ও মৌনতার প্রতীক হিসাবে পাহাড়-পর্বতের ব্যবহার পাওয়া যায় নিম্নের উদ্ধৃতিগুলোয় :

১০৩.

আমার সোয়ামী সে যে পর্ব্বতের চূড়া।
আমার সোয়ামী যেমন রণ-দৌড়ের ঘোড়া॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৭৫]

'মলুয়া' গাথায় নায়িকা মলুয়া দুষ্ট কাজীর কু-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তার তুলনায় নিজ স্বামী চান্দ বিনোদকে শ্রেষ্ঠত্ব বা সমুচ্চতায় পর্বতচূড়ার প্রতীকে প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ এখানে মলুয়ার নিজ হৃদয়ে স্বামীর অবস্থান প্রকাশ পেয়েছে পর্বতের চূড়ার প্রতীকে।

১০৪.

কৃষ্ণবর্ণ দেহ তার পর্ব্বতপ্রমাণ।
রাবণের মত হৈল অতি বলবান॥
['দস্যু কেনারামের পালা', মৈগী ১, ২ : ১৯৭]

'দস্যু কেনারামের পালা'য় কেনারাম ডাকাত দলের সাথে থেকে থেকে মস্তবড় ডাকাত হলে তার দেহের বিশালতা ও ভয়ঙ্কর রূপ বর্ণিত হয়েছে পর্বত বা পাহাড়ের প্রতীকে।

১০৫.

পাহাড়িয়া দেহ যেন কাল মেঘের সাজ।
যমদূতগণ সঙ্গে যেন যমরাজ॥
[‘দস্যু কেনারামের পালা’, মৈগী ১, ২ : ১৯৯]

একই গাথায় ডাকাত কেনারাম গায়ক বংশীদাসকে ডাকাতির উদ্দেশ্যে দলবলসহ আক্রমণ করলে পুনরায় তার দেহের বিশালতাকে প্রকাশ করা হয়েছে পাহাড়ের প্রতীকে।

১০৬.

সাইগরের জানোয়ার পাহাড়ের সমান।
‘হুমাহুমি’ শব্দ করে যেনরে তুয়ান॥
[‘নছর মালুম’, পূগী ৪, ২ : ৩৯]

‘নছর মালুম’ গাথায় সাগরের উত্তাল অবস্থার বর্ণনা স্থান পেয়েছে পাহাড়ের প্রতীকে। কারণ সাগরের ঢেউ হচ্ছে সেই জানোয়ারস্বরূপ যে শক্তি, ক্ষমতা ও বিশালতায় পাহাড়ের সমতুল্য।

রংধনু

রংধনুতে বহু রংয়ের সমাবেশ, এর আকৃতিও অর্ধবৃত্তাকার। তাই কখনো কখনো বহু রং বা বক্রতার প্রতীক হিসাবে রংধনু ব্যবহার করা হয়েছেঃ

১০৭.

পুব পাহাড়ের শালধা কাঠে বড়া বড়া ঠুনি
ও ভাই বড়া বড়া ঠুনি।
রাজ্যের যত মাছুয়ারাঙ্গা মারিয়া দিছে ছানি॥
দূরণ বাক্যা নজর করলে বাইরা মালুম হয়।
মেঘের উপরে যেমুন রামধনুর উদয়॥
[‘জীরালনী’, পূগী ৪, ২ : ৪২৭]

১০৮.

জোড় মাণিকে গড়ছে তার দুই নয়নের তারা।
রাম ধনুকে গড়ছে ভাই তার দুই ভুরা রে॥
[‘সোণারায়ের জন্ম’, পূগী ৪, ২ : ৪৬৭]

প্রথম উদ্ধৃতিতে ‘জীরালনী’ গাথায় কুশাই নদীর তীরে পূর্ব পাহাড়ের এলাকায় প্রতাপশালী রাজা চক্রধরের ঘরের চালি দেওয়া হয়েছে মৃত মাছরাঙ্গা পাখীর পালক দিয়ে। বহু রংয়ের মিশ্রণে গঠিত মাছরাঙ্গার পালক দিয়ে ঘরের চালি দেওয়ায় দূর থেকে মেঘের উপর রংধনুর আবির্ভাব বলে মনে হয়। এখানে রংধনুকে ব্যবহার করা হয়েছে বহু রংয়ের প্রতীক হিসাবে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে ‘সোণারায়ের জন্ম’ গাথায় চাঁদ রায়ের ছেলে ও নায়ক সোণারায়ের রূপবর্ণনায় চোখের দুই ভ্রুকে বক্রতার প্রতীক হিসাবে রংধনুর প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

পানি, নদী, সমুদ্র

নদীতে জোয়ারের পানি প্রবেশ করলে বাঁধভাঙ্গা স্রোতে যেন কূল ছাপিয়ে পানি উছলে ওঠে। তাই গীতিকায় ভরা যৌবনকে জোয়ারের পানির প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছেঃ

১০৯.

শুন শুন শুন ওগো চিকন গোয়ালিনী।
তোমার ত যৌবন ছিল জোয়ারের পানি॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১২৮]

'কমলা' গাথায় বৃদ্ধ গোয়ালিনীর প্রথম যৌবনের রূপবর্ণনায় জোয়ারের পানির প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে।

১১০.

বেশের নাহি আদর-যতন কেশের বন্ধনী।
কোথা হইতে আইল পাগল জোয়ারের পানি॥
['কঙ্ক ও লীলা', মৈগী ১, ২ : ২৭২]

'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় নায়িকা লীলার অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা যৌবনকে জোয়ারের পানির প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

আষাঢ়-শ্রাবণ আমাদের দেশে ঘন বর্ষার সময়।এ সময়ের নদী থাকে পানিতে থৈ থৈ। তাই গীতিকায় আষাঢ় বা শ্রাবণের নদী ব্যবহৃত হয়েছে কখনো বাঁধভাঙ্গা স্রোতের উন্মত্ততার প্রতীক হিসাবে, আবার কখনো নায়িকার যৌবন বর্ণনার প্রতীক হিসাবেঃ

১১১.

আষাইঢ়া নদীরে যেমন পাগল হইয়া যায়।
মনেরে বোঝাইয়া বন্ধু রাখা নাহি যায়॥
['ধোপার পাট', পূগী ২, ২ : ৬]

'ধোপার পাট' গাথায় নায়িকা কাঞ্চনমালা নায়ক রাজপুত্রের প্রণয়াকর্ষণে যেভাবে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তাকে প্রকাশ করা হয়েছে আষাঢ়ে নদীর প্রতীকে।

১১২.

রাত্র যায় দিনরে আসে বাম হইয়াছে বিধি।
পাগল হইয়া ছুটে কন্যা যেমন শাঙন মাইস্যা নদী॥
['কাঞ্চনমালা', পূগী ২, ২ : ১১০]

'কাঞ্চনমালা' গাথায় নায়ক ফুলকুমার নায়িকা কাঞ্চনমালাকে বনে নির্বাসন দিলে সে বনের মধ্যে যেভাবে উন্মত্ত হয়ে ছুটতে লাগল তাকে প্রকাশ করা হয়েছে শ্রাবণের নদীর প্রতীকে।

১১৩.

শাউনিয়া নদী যেমন কূলে কূলে পানি।
অঙ্গে নাহি ধরে রূপে চম্পকবরণ॥
['কঙ্ক ও লীলা', মৈগী ১, ২ : ২৭০]

'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় নায়িকা লীলার যৌবন বর্ণনায় প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে শ্রাবণের নদী। এখানে শ্রাবণের নদীর প্লাবনবেগ যৌবনগর্বিতা নায়িকার পরিচয় বাহক।

নায়িকা মহুয়া ও নায়ক নদের চাঁদের দাম্পত্য জীবন গড়ে ওঠার পথে মহুয়ার পিতাই কেবল অন্তরায় নয়, সামাজিক অন্তরায়ও এখানে প্রবল। তাই দুর্গম ও প্রবল স্রোতসম্পন্ন পাহাড়ী নদী এই সামাজিক অন্তরায়ের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নের উদ্ধৃতিটিতে :

১১৪.

বিস্তার পাহাড়ীয়া নদী ঢেউয়ে মারে বাড়ি।
এমন তরঙ্গ নদীর কেমনে দিবাম পারি॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ২৬]

পিতার আদেশ লঙ্ঘন করে মহুয়া নদের চাঁদকে হত্যা না করে বরং তার সঙ্গে নিরুদ্দেশযাত্রী হতে গিয়ে এক তরঙ্গক্ষুব্ধ পাহাড়ী নদীর সম্মুখীন হয়। সেখানে তাদের হুমরা-ভীতির পরিবর্তে সামাজিক ও প্রকৃতি ভীতিই যে প্রবল হয়ে উঠেছিল, তা-ই দুর্গম পাহাড়ী নদীর প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

'মলুয়া' গাথায় নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামে ক্লান্ত নায়িকা মলুয়া সীমাহীন ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে আত্মবিসর্জনের উদ্দেশ্যে ভাঙ্গা নৌকায় আরোহন করে। এমনি মানসিকতায় মলুয়ার অভিমানাহত ব্যর্থতাক্লিষ্ট জীবনের অসীম শূন্যতাকে কূলহীন সমুদ্রের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে নিম্নের উদাহরণটিতেঃ

১১৫.

পূবেতে উঠিল ঝড় গর্জিয়া উঠে দেওয়া।
এই সাগরের কূল নাই ঘাটে নাই খেওয়া॥
ডুবুক ডুবুক ডুবুক নাও আর বা কত দূর।
ডুইব্যা দেখি কতদূরে আছে পাতালপুর॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৯৯-১০০]

ব্যর্থতাবোধ শুধু মানুষের জীবনকে নৈরাশ্যমগ্নই করে না বরং তাকে নিম্নগামিতা থেকে উত্তরণের পথে বিচ্যুত করে দিয়ে অসফলতার অতল জলে নিমজ্জিত করে। তা-ই বর্ণিত হয়েছে এ প্রতীকটিতে।

পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে গঙ্গাজলের ব্যবহারও বাদ পড়েনি গীতিকায়ঃ

১১৬.

আছিল গঙ্গার জল অপবিত্র হইল।
বিধাতা সাধিছে বাদ সব নষ্ট হইল॥
['চন্দ্রাবতী', মৈগী ১, ২ : ১১৬]

'চন্দ্রাবতী' গাথায় চন্দ্রাবতীর পূজার জন্য নিবেদিত ফুল পবিত্র জিনিস। তাই তা গঙ্গাজলের পবিত্রতার প্রতীকে প্রকাশিত। কিন্তু পূজার ঐ মন্দির ধর্মান্তরিত জয়ানন্দ স্পর্শ করায় তা অপবিত্র হলো।

১১৭.

দেবপূজার ফুল তুমি তুমি গঙ্গার পানি।
আমি যদি ছুই কন্যা হইবা পাতকিনী॥
['চন্দ্রাবতী', মৈগী ১, ২ : ১১৭]

একই গাথার শেষে নায়ক জয়ানন্দ নিজের ভুল বুঝতে পেরে নায়িকা চন্দ্রাবতীকে পবিত্রতার চিহ্নকে গঙ্গাজলের প্রতীকে প্রকাশ করেছে। যত অপবিত্র কর্ম সবই সম্পাদিত হয়েছিল জয়ানন্দের দ্বারা। অথচ চন্দ্রাবতী ছিল একনিষ্ঠ ও সত্যের উপাসক।

১১৮.

আমিত চণ্ডাল কন্যা তুমি গঙ্গার পানি।
না ধরিব না ছুঁইব তোমার চরণখানি॥
['রূপবতী', মৈগী ১, ২ : ২৫৩]

'রূপবতী' গাথায় নায়িকা ও রাজকন্যা রূপবতীর বিয়ে হল নিজ বাড়ীর অতি সাধারণ কর্মচারী বক্সী মদনের সাথে। তার পক্ষে রজকন্যার স্বামী হওয়া ছিল স্বপ্নেরও অতীত। তাই সে নিজের তুলনায় রূপবতীকে পবিত্র হিসাবে গঙ্গাজলের প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

ক্ষণস্থায়ীত্বের প্রতীক হিসাবে পদ্মপাতার জল ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নের উদাহরণটিতে :

১১৯.

মানুষের ভাগ্যে সুখ যেমন পদ্মপাতার জল।
এই আছে এই নাই করে টলমল॥
['কাঞ্চনমালা', পূগী ২, ২ : ১০৯]

'কাঞ্চনমালা' গাথায় প্রতিনায়িকা ও কাঞ্চনমালার সতীন কুঞ্জলতার চক্রান্তে কাঞ্চনমালাকে তার অন্ধ স্বামী ফুলকুমার বনে নির্বাসন দেয়। তাই তার পূর্বের সুখের দিনগুলোর কথা মনে করে এ সুখ তার কাছে ক্ষণস্থায়ী বলে মনে হলে সে সুখকে পদ্মপাতার উপর এক ফোঁটা পানির প্রতীকে প্রকাশ করে।

ফুল ও লতা

লতা কখনো একা বেড়ে উঠতে পারে না। এজন্য কিছুকে তার আশ্রয় করতে হয়। তাই গীতিকায় লতা ব্যবহৃত হয়েছে পরাশ্রয়ীতার প্রতীক হিসাবে:

১২০.

বায়েতে হেলিয়া যেমন লতা পড়ে ঢলি।
নদ্যার চান্দের কান্ধে কন্যা পইরা গেল এলি॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ৩৮]

১২১.

এহি কথা চম্পাপুতি কন্যা যইখনে শুনিল।
বিরক্ষ ছাড়া কাউলীর লতা বিছাইয়া পড়িল॥
['ভারইয়া রাজার কাহিনী', পূগী ৪, ২ : ১৬৯]

প্রথম উদাহরণে মহুয়া যখন নদের চাঁদের সঙ্গে পালিয়ে এক বনে এসে বনদম্পতির ন্যায় বসবাস করছিল তখন মহুয়ার পিতার বেদের দলের বাঁশীর শব্দে সে সংকিত হয়ে উঠল এবং নদের চাঁদের কাঁধে ঢলে পড়া লতার মতো এলিয়ে পড়ল। এখানে তাই নদের চাঁদের মত আশ্রয় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কায় মহুয়াকে পরাশ্রয়ীতার প্রতীক হিসাবে নদের চাঁদের কাঁধে লতার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণে নায়িকা চম্পাবতীর পিতা কর্তৃক নায়ক দুধরাজকে বন্দি করার সংবাদ শুনে চম্পাবতী বৃন্তচ্যুত লতার মতো খসে পড়ল। অর্থাৎ দুধরাজ ছিল তার আশ্রয় কিন্তু সে বন্দি। তাই চম্পাবতী পরাশ্রয়ীতার প্রতীক হিসাবে যেন বৃক্ষহীন লতা যে ভূমিতে পতিত।

পদ্ম

সুন্দর, কোমল ও সদা হাস্যোজ্জ্বলতার প্রতীক হিসাবে পদ্মের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় নিম্নের উদ্ধৃতিগুলোয় :

১২২.

আর গণক বলে কন্যা সর্ব্বসুলক্ষণ।
পদ্মের মতন দেখি দুখানি চরণ॥
['রূপবতী', মৈগী ১, ২ : ২৪৩]

'রূপবতী' গাথায় নায়িকা রূপবতীর রূপ বর্ণনায় জনৈক গণক তার পায়ের সৌন্দর্য বর্ণনায় তাকে পদ্মফুলের প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

১২৩.

পদ্মের সমান কন্যার যেমন মুখখানি।
চক্ষু দুইটী দেখি ভাল নাচয়ে খঞ্জনী॥
['রূপবতী', মৈগী ১, ২ : ২৪৩]

একই গাথায় আরেক গণক ঐ নায়িকার মুখের সৌন্দর্য বর্ণনায় তাকে পদ্মফুলের প্রতীকে প্রকাশ করেছে, যা সুন্দর, কোমল ও সদা হাস্যোজ্জ্বলতার প্রতীক। তার মুখে যেন প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের দীপ্তি।

১২৪.

বদন সুন্দর লীলার পদ্মের সমান।
মেঘেতে ঢাকিল যেমন পুন্নমাসীর চান॥
['কঙ্ক ও লীলা', মৈগী ১, ২ : ৩০৯]

'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় নায়ক কঙ্কের মৃত্যুর খবরে নায়িকা লীলার পদ্মতুল্য চেহারা হারিয়ে যেতে বসেছে। অর্থাৎ পূর্বে তার চেহারা ছিল সুন্দর, কোমল ও হাস্যোজ্জ্বল। ফলে তা পদ্মের প্রতীকে প্রকাশিত।

রক্তজবা

লালবর্ণের প্রতীক হিসাবে রক্তজবার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় নিম্নের উদাহরণে :

১২৫.

লাজেতে হইল কন্যার রক্তজবা মুখ।
পরথম যৌবন কন্যার এই পরথম সুখ॥
['মইষাল বন্ধু', পূগী ২, ২ : ৩৯]

'মইষাল বন্ধু' গাথায় নায়িকা সাজুতী কলসীসহ একা স্নান করতে গেলে নদীতে কলসী ভেসে যায়। তখন নায়ক মইষাল সেখানে উপস্থিত হয়ে কন্যার কলসী এনে দিতে সম্মত হয়। জলের ঘাটে এভাবে

মৈষালের সাথে সাজুতীর প্রথম প্রণয়মূলক সাক্ষাতের কারণে সাজুতীর মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হলো তা প্রকাশ করা হয়েছে রক্তজবার প্রতীকে।

বস্তু আশ্রয়ী প্রতীক

সোনা

সোনা একটি মূল্যবান খনিজ পদার্থ। অলঙ্কার হিসাবে এর ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল থেকে। সোনা উজ্বল, চকচকে, মূল্যবান এবং রং ও রূপে সুন্দর। যুগবাহিত চেতনায় সোনা তাই ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি ও উজ্জ্বলতার প্রতীক। যা কিছু সুন্দর ও শ্রেয় তারই প্রতীকরূপে সোনার ব্যবহার হয়ে থাকে। তাই গীতিকায় সোনা ব্যবহৃত হয়েছে কখনো মূল্যবান ও প্রিয়তম বস্তু বা সামগ্রীর প্রতীক হিসাবে; কখনো সুন্দর ও পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে, কখনো সুখী-স্বচ্ছলতা, শান্তিময়তা, ভালো ও চমৎকারিত্বের প্রতীক হিসাবে আবার কখনো দেহের রং-রূপ ও ঔজ্জ্বল্যের প্রতীক হিসাবে। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলোয় মূল্যবান ও প্রিয়তম বস্তু বা সামগ্রীর প্রতীক হিসাবে সোনা ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলোতে ঘরবাড়ী, জমি, ফসল, পালঙ্ক, নরুণ-ক্ষুর, থালা, বাটি, প্রতিমা, কপাট প্রভৃতির বহুমূল্য নিরূপণে সোনা হয়েছে প্রতীক:

১২৬.

মাইন্‌কিয়া বলে এমন কথা না কহিও তুমি।
ছাইড়া যাইতে মন না চলে সোনার বাড়ী জমি॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ১৪]

'মহুয়া' গাথার শেষে যখন সিদ্ধান্ত হয় হুমরা বেদে দলবলসহ বামনকান্দা গ্রাম ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাবে, তখন হুমরার ভাই মানিক জানায় যে বাড়ীঘর ও জমিজমা নদের চাঁদ তাদের উপহার দিয়েছে তা তাদের কাছে অতি প্রিয় হয়ে উঠেছে। এ কারণে এগুলোকে সোনার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১২৭.

সানে বান্ধা পুষ্করিণী গলায় গলায় জল।
পাইক্যা আইছে সাইলের ধান সোনার ফসল॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ১৪]

একই গাথায় নদের চাঁদ হুম্বরা বেদে দলকে যে জমিজমা দিয়েছে তাতে বেদেরা অনেক কষ্ট করে সালীধান বুনেছে। এত প্রিয় ফসল ফেলে হুমরার নির্দেশে তাদের অন্যত্র চলে যেতে মন টানছে না। তাই নিজেদের বোনা ফসলকে সোনার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১২৮.

সোনার পালঙ্ক দিবাম সাজুয়া বিছান।
গলায় গাথিয়া দিবাম মোহরের থান॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৭৪]

'মলুয়া' গাথায় দুশ্চরিত্র কাজী দুষ্ট নেতাই কুটনীকে দিয়ে মলুয়াকে নিকা করার প্রস্তাব পাঠিয়ে মূল্যবান বস্তুর প্রতীক হিসাবে তাকে সোনার পালঙ্ক উপহার দেওয়ার কথা জানায়।

১২৯.

সোণার পালঙ্কে কন্যা ভালা শুইয়া নিদ্রা যায় রে।
সোণার মন্দির দেখে কন্যার রূপে যুড়ে॥
['মুকুটরায়', পূগী ৪, ২ : ১৩৫]

'মুকুটরায়' গাথায় শিলুই রাজার একমাত্র সুদর্শন পুত্র মুকুটরায়ের জন্য নির্বাচিত এক সুদর্শন কন্যা যে পালঙ্কে শুয়ে আছে তাকেই মূল্যবান সামগ্রীর চিহ্ন রূপে সোনার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৩০.

নবদ্বীপ তনে নাপিতে আইল কামাইতে।
সেই নাপিত কামায় সোনার নরুন-ক্ষুরেতে॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১৬৭]

'কমলা' গাথার শেষে নায়িকা কমলার সাথে নায়ক প্রদীপকুমারের বিয়ের আচার স্বরূপ বর-কণেকে নাপিত যে নরুণ-ক্ষুর দিয়ে কামাতে আসল তাকে মূল্যবান বস্তু হিসাবে সোনার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৩১.

জলচৌকি সোণার ঝাড়ি তাতে শীতল পাণি।
হাত মুখ ধুইল রাজা শীতল পরাণি॥
['রূপবতী', মৈগী ১, ২ : ২৪৭]

'রূপবতী' গাথায় রাজা রাজচন্দ্রের হাত-মুখ ধোয়ার জন্য যে পাত্রে করে পানি দেওয়া হয়েছিল তাকেও মূল্যবান বস্তু হিসাবে সোনার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৩২.

সোনার থালে বাড়ে কন্যা চিক্কণ সাইলের ভাত।
ঘরে ছিল পাতি নেম্বু কাইট্যা দিল তাত্॥
['কাজলরেখা', মৈগী ১, ২ : ৩৩১]

'কাজলরেখা' গাথায় পরীক্ষার অংশস্বরূপ দাসী রান্না করে রাজাকে যে মূল্যবান থালায় খাবার পরিবেশন করেছিল তা-ই সোনার প্রতীকে প্রকাশ পেয়েছে।

১৩৩.

সোনার বাটীতে রাখে দধি দুগ্ধ ক্ষীর।
ঘরে মজা সবরি কলা কইরা দিল চির॥
['কাজরেখা', মৈগী ১, ২ : ৩৩১]

একই গাথায় রাজার আহারান্তে দধি-দুগ্ধ-ক্ষীর পরিবেশনের জন্য সেগুলো যে বাটিতে সাজানো হয়েছিল তা-ও প্রকাশ পেয়েছে মূল্যবান বস্তুর প্রতীক স্বরূপ সোনায়।

১৩৪.

ঘরে আছে লক্ষী বউ সোণার পত্তিমা।
সুরঙ্গিণী নাম যে তার রূপের নাহি সীমা॥
['কমল সদাগরের পালা', পূগী ৩, ২ : ২২৪]

'কমল সদাগরের পালা'য় কমল সওদাগরের প্রথমা স্ত্রী সুরঙ্গিণীর প্রতিমাতূল্য দুর্লভ রূপকে মূল্যবান বস্তু হিসাবে সোনার প্রতিমার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৩৫.

সোণার কপাট রূপার খিল গো বাপের ভাণ্ডার।
বাপের আগে কয়লো ধাই খুল্যা দেও দুয়ার॥
['আন্ধাবন্ধু', পূগী ৪, ২ : ১৮৭]

'আন্ধাবন্ধু' গাথায় মূল্যবান ও ঐশ্বর্যের প্রতীক হিসাবে রাজবাড়ীর দরজার কপাটকে সোনার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৩৬.

ফাল্গুন মাসে চল্যা যায়রে চৈত্র মাসে আসে।
সোনার কুইল কু ডাকে বইস্যা গাছে গাছে॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ১৪]

'মহুয়া' গাথায় বসন্তের কোকিলকে প্রিয়তম বস্তুর প্রতীক হিসাবে সোনার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৩৭.

শুইতে দিতাম শীতল পাটী বাটাভরা পান।
আইত যদি সোণার অতিথ যৌবন করতাম দান॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৫৭]

'মলুয়া' গাথায় নায়িকা মলুয়া জল আনতে ঘাটে গিয়ে নায়ক বিনোদকে শয্যারত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তার রূপে মুগ্ধ হয়। সে আপন মনে শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে ঐ অতিথির কথা। মুহূর্তের দেখায়ই সে মলুয়ার প্রিয়তম পাত্রে পরিণত হয়। তাই সে এখানে তাকে সোনার প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

১৩৮.

আমার স্বামী কাঞ্চাসোনা অঞ্চলের ধান।
তার সঙ্গে কাজীর সোনার না হয় তুলন॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৭৬]

একই গাথায় দুষমন কাজী নেতাই কুটনীকে দিয়ে মলুয়ার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে সে কুটনীকে যা জানায় তাতে বোঝা যায় মলুয়ার কাছে তার স্বামী বিনোদ অতি মূল্যবান ও প্রিয়। তাই তাকে কাঁচা সোনার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে যার সঙ্গে কাজীর কোনো তুলনাই হয়না।

১৩৯.

পইরা রইছে ঘর-দরজা পাটির বিছানা।
কোন জনে হরিয়া নিছে আমার কাঞ্চা সোনা॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৮৭]

একই গাথায় ব্যর্থ কাজীর নির্দেশে মলুয়াকে অপহরণ করে দেওয়ান জাহাঙ্গীরের প্রাসাদে বন্দি করা হয়। এদিকে মলুয়ার স্বামী চান্দ বিনোদ স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তাকে অতি মূল্যবান ও প্রিয়তম ব্যক্তি হিসাবে কাঁচা সোনার প্রতীকে প্রকাশ করে।

১৪০.

ইকরের করমর মাকড়ের রে আঁশ।
এইনা বিরক্ষে সোনার ফুল গো ফুটে বার মাস॥
['দেওয়ান ভাবনা', মৈগী ১, ২ : ১৭৭]

'দেওয়ান ভাবনা' গাথায় যে পথ দিয়ে নায়ক মাধব প্রতিদিন শিকারের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করে সে পথের পাশেই ইকর নামে এক প্রকার ক্ষুদ্র গাছের বন রয়েছে। সেই পথ দিয়ে নায়কের আসা-যাওয়ার কারণে ঐ গাছের ফুলকে প্রিয়তম বস্তুর প্রতীক হিসাবে সোনার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৪১.

দেখিতে সোনার নাগর গো চান্দের সমান।
সুবর্ণ কার্ত্তিক যেমন গো হাতে ধনুকবান॥
['দেওয়ান ভাবনা', মৈগী ১, ২ : ১৭৮]

একই গাথার নায়ক জমিদারপুত্র মাধবের সুন্দর রূপবর্ণনায় তাকে প্রিয়তম বস্তুর প্রতীক হিসাবে সোনার নাগরের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৪২.

সোনার কলি আলাল দুলাল রহিলে বাঁচিয়া।
সংসার না থাকলে তারা খাইব কি করিয়া॥
['দেওয়ানা মদিনা', মৈগী ১, ২ : ৩৫৮]

'দেওয়ানা মদিনা' গাথায় দেওয়ান সোনাফরের অতি প্রিয় দুই পুত্র আলাল-দুলালকে প্রিয়তম বস্তুর প্রতীক স্বরূপ সোনার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৪৩.

সেই নারী হারাইয়া রাজা হইলা বাউরা।
সোণার পিন্‌রা খালি সে কৈরা পঙ্খী দিছে উড়া॥
['কমলা রাণীর গান', পূগী ২, ২ : ২২১]

'কমলা রাণীর গান' পালায় স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে রানী কমলা শুকনা পুকুরে জল ভরার উদ্দেশ্যে পুকুরের মধ্যে নেমে জল প্রার্থনা করায় পুকুর জলভর্তি হলে রানী ডুবে মরলেন। রানীকে হারিয়ে রাজার অন্তরের পিঞ্জর যেন খালি হয়ে পড়ল। রানীর উপস্থিতিতে সেই বক্ষপিঞ্জর ছিল পরিপূর্ণ যা প্রিয়তম বস্তু হিসাবে সোনার প্রতীকে প্রকাশিত।

সুন্দর ও পবিত্র মনের প্রতীকও হয়েছে সোনা। কলস, পানসী, নারীর যৌবন, মানবদেহ, মুখ, মন, মন্দির, পাতা-ফুল, কবুতর, হরিণ প্রভৃতির সৌন্দর্য প্রকাশের প্রতীকও কখনো কখনো সোনা হয়েছেঃ

১৪৪.

সোনার কলসী কাঁকে সঙ্গে সখীগণ।
জলের ঘাটেতে যাই সানন্দিত মন॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১৫৫]

'কমলা' গাথায় নায়িকা কমলা সখীদের সঙ্গে নেচে গেয়ে যে কলসী বহন করে ঘাটে যাচ্ছিল তাকে সুন্দরের প্রতীক হিসাবে সোনার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৪৫.

চলিল সোণার পান্‌সি ভরা নদী দিয়া।
লিলুয়ারী বাতাসে দেখ পাল উড়াইয়া॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১৬১]

একই গাথায় পাল উড়িয়ে চলা নৌকাকেও সুন্দরের প্রতীকরূপে সোনার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৪৬.

হাসিয়া খেলিয়া লীলার বাল্যকাল গেল।
সোনার যৈবন আসি অঙ্গে দেখা দিল॥
['কঙ্ক ও লীলা', মৈগী ১, ২ : ২৭০]

'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় নায়িকা লীলার নবযৌবনকে সুন্দরের প্রতীকরূপে সোনার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৪৭.

শুকাইয়া গেলরে তার সোনার যৌবন।
শুকাইয়া গেলরে তার ও চান বদন॥
['কাফেন-চোরা', পূগী ৩, ২ : ৬৩]

'কাফেন-চোরা' গাথায় নায়িকা আয়রার ভরা যৌবনকে সুন্দরের প্রতীক হিসাবে সোনা বলা হয়েছে। যে যৌবন মনসুর ডাকাতের ভয়ে হারিয়ে যেতে বসেছে।

১৪৮.

আমার বন্ধু চান্দ-সুরুজ কাঞ্চা সোনা জ্বলে।
তাহার কাছে সুজন বাদ্যা জ্যোনি যেমন জ্বলে॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ৪০]

'মহুয়া' গাথায় মহুয়ার নিকট তার পিতার পালকপুত্র ও নির্বাচিত পাত্র সুজন বাদ্যার চেয়ে নদ্যার চাঁদের রূপ অধিক আকর্ষণীয় ও সুন্দর। তাই তাকে কাঁচা সোনার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৪৯.

তুমিত ঘরের বধু অঙ্গ কাঞ্চা সোনা।
রইয়া শুন আমার কথার কিঞ্চিৎ নমুনা॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৭৪]

'মলুয়া' গাথায় দুষমন কাজীর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে নেতাই কুটনী একা মলুয়ার সাথে দেখা করে তার রূপের প্রশংসা করে। তার দৃষ্টিতে মলুয়ার দেহলাবণ্য অতি উজ্জ্বল। তাই সে তার দেহকে কাঁচা সোনার প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

১৫০.

অপরূপ রূপ তার রে দেখিতে সুন্দর,
কাঞ্চা সোনার তনু পর্‌ভাত কালেরর ভানু,
নাম তার মদন সদাগর রে।
['ভেলুয়া', পূগী ২, ২ : ১৪২]

'ভেলুয়া' গাথায় নায়ক মদন সওদাগরের রূপ বর্ণনায় সুন্দরের প্রতীক হিসাবে কাঁচা সোনার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৫১.

জাগিয়া না দেখবাম বন্ধু তোমার সোনামুখ।
ভরমিয়া তোমার সঙ্গে আর না পাইব সুখ॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ১৬]

'মহুয়া' গাথার শেষে যখন মহুয়া বেদের দলের সাথে বামনকান্দা গ্রাম ছেড়ে যাচ্ছে তখন সে নায়ক নদের চাঁদের সুন্দর মুখকে সোনার প্রতীকে প্রকাশ করে জানিয়ে যাচ্ছে শেষ বিদায়। এখানে সোনামুখ হয়ে উঠেছে সুন্দরের প্রতীক।

১৫২.

সোণার পালঙ্কে কন্যা ভালা শুইয়া নিদ্রা যায় রে।
সোণার মন্দির দেখে কন্যার রূপে যুড়ে॥
['মুকুটরায়', পূগী ৪, ২ : ১৩৫]

'মুকুটরায়' গাথায় রাজপুত্র মুকুটরায়ের জন্য নির্বাচিত সুদর্শন কন্যার রূপ যেন উজ্জ্বল সোনার মন্দিরের পবিত্রতায় বিভূষিত। অর্থাৎ এখানে কন্যার রূপকে সোনার মন্দিরের পবিত্রতার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৫৩.

একেত যৈবনের ভার আর উছলে জ্বালা।
সুন্দর কন্যা সোণার মন হইল উতালা॥
['বীরনারায়ণের পালা', পূগী ৪, ২ : ২৯৫]

'বীরনারায়ণের পালা'য় নায়িকা সোনার সুন্দর ও পবিত্র মনকে সোনার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৫৪.

গাছে গাছে সোণার পাতা ফুটে সোণার ফুল।
কুঞ্জেতে গুঞ্জরী উঠে ভ্রমরার বোল॥
['কঙ্ক ও লীলা', মৈগী ১, ২ : ২৯৯]

'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় বসন্ত কালের শেষে গাছে গাছে যে নতুন পাতা ও ফুল ফোটে তাকে সুন্দরের চিহ্নরূপে সোনার প্রতীক হিসাবে দেখানো হয়েছে।

১৫৫.

মেঘের অঙ্গেতে যেমন গো বিজলীর ঝলা।
চলিছে সোণার মৃগ গো বন করি উজালা॥
['চন্দ্রাবতীর রামায়ণ', পূগী ৪, ২ : ২৫৭]

'চন্দ্রাবতীর রামায়ণ' গাথায় একটি হরিণের সৌন্দর্য প্রকাশের প্রতীক হয়েছে সোনা।

সংসারের সুখময় স্বচ্ছলতা, ঐশ্বর্য, শান্তিময়তা, ভালো ও চমৎকারিত্বের প্রতীক হিসাবেও সোনার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়:

১৫৬.

আগণ মাসে রাঙ্গা ধান জমীনে ফলে সোনা।
রাঙ্গা জামাই ঘরে আনতে বাপের হইল মানা॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৬২]

'মলুয়া' গাথায় অগ্রহায়ণ মাসের ফসলকে ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধিকে সোনার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৫৭.

কি কর বিনোদের মাসী বৈসা তুমি ঘরে।
সোনার ছত্র আন্যা ধর চান্দ বিনোদের শিরে॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৭১]

'মলুয়া' গাথায় নায়ক বিনোদ মলুয়াকে বিয়ে করে নিজ বাড়িতে ফিরলে সংসারের সুখময় স্বচ্ছলতা ও শান্তিময়তার প্রতীক স্বরূপ সোনার ছাতা তার মাথায় ধরার কথা বলা হয়েছে।

১৫৮.

401855

সোনার কালীতে পত্র সকলি লিখিল।
সিন্দুরের সাত ফোটা তার মাঝে দিল॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১৬৬]

'কমলা' গাথার শেষে নায়িকা কমলার বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র লিখতে যে কালী ব্যবহার করা হয়েছে তাকে সুখী, স্বচ্ছলতা, শান্তিময়তা, সুন্দর ও পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে সোনায় প্রকাশ করা হয়েছে।

১৫৯.

দিলের দুঃখু দূর কইরা কর্‌খাইন এক বিয়া।
সোনার সংসার পাল্‌খাইন যতন করিয়া॥
['দেওয়ানা মদিনা', মৈগী ১, ২ : ৩৫৮]

'দেওয়ানা মদিনা' গাথায় দেওয়ান সোনাফরকে পুনরায় বিয়ে করার পরামর্শ দিয়ে তার সংসারকে সুন্দর করার চিহ্ন হিসাবে সোনার প্রতীকে প্রকাশ করেছে তার উজীর।

১৬০.

কেমুন জানি সোণার দেশ সোণার মানুষ আছে।
কাঞ্চন পুরুষ কেন ভিক্ষা লইতে আইছে॥
['আন্ধাবন্ধু', পূগী ৪, ২ : ১৮৬]

'আন্ধাবন্ধু' গাথায় অন্ধ বংশীবাদকের দেশকে চমৎকার দেশ হিসাবে কল্পনায় সোনার প্রতীকে এবং সেই সুন্দর দেশের মানুষকেও ভালো বিবেচনায় সোনার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৬১.

সেইত না নদীর গো পারে কোন বা সোণার দেশে।
রসইয়া সোণার মানুষ সেই না দেশে বইসে॥
['আন্ধাবন্ধু', পূগী ৪, ২ : ১৮৭]

একই গাথায় পুনরায় অন্ধ বংশীবাদকের দেশকে সুন্দর বলে সোনার প্রতীকে এবং ঐ দেশবাসীকেও সোনার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

নারী দেহের রং-রূপ-ঔজ্জ্বল্য অথবা পাখীর রং-রূপের প্রতীক হয়েছে সোনাঃ

১৬২.

বাইদ্যা বাইদ্যা করে লোকে বাইদ্যা কেমন জনা।
আন্দাইর ঘরে থুইলে কন্যা জ্বলে কাঞ্চা সোনা॥
হাড্ডিয়া না যাইতে কইন্যার পায়ে পরে চুল।
মুখেতে ফুট্টা উঠে কনক চাম্পার ফুল॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ৫]

'মহুয়া' গাথায় হুমরার চুরি করা পালিত কন্যা মহুয়া যৌবনে পদার্পণ করলে তার সৌন্দর্য সকলকে মুগ্ধ করে। রং, রূপ ও ঔজ্জ্বল্যের কারণে নায়িকা মহুয়ার রূপকে রচয়িতার কাছে কাঁচা সোনা বলে মনে হয়েছে। এভাবে কাঁচা সোনা হয়েছে রং-রূপ-ঔজ্জ্বল্যের প্রতীক।

১৬৩.

আন্ধাইর ঘরে থইলে কন্যা কাঁঞ্চা সোনা জ্বলে।
বনে ফুটে ফুলরে ভালা পরবতে জ্বলে মণি॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ২০]

একই গাথায় নায়িকা মহুয়ার রূপবর্ণনায় প্রতীক হিসাবে কাঁচা সোনা ব্যবহৃত হয়েছে।

১৬৪.

কিবা মুখ কিবা সুখ ভুরুর ভঙ্গিমা।
আন্ধাইর ঘরেতে যেমন জ্বলে কাঞ্চা সোনা॥
এইরূপ দেখিয়া বিনোদ হইল পাগল।
চান্দের সমান রূপ করে ঝলমল॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৬৯]

'মলুয়া' গাথায় নায়িকা মলুয়ার রূপ বর্ণনায়ও রং-রূপ-ঔজ্জ্বল্য প্রকাশে কাঁচা সোনার প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে।

১৬৫.

আবে করে ঝিলিমিলি সোণার বরণ ঢাকা।
প্রভাতকালে আইল অরুণ গায়ে হলুদ মাখা॥
['চন্দ্রাবতী', মৈগী ১, ২ : ১০৫]

'চন্দ্রাবতী' গাথায় নায়িকা চন্দ্রাবতীর উজ্জ্বল দেহরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তার রংকে সোনার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৬৬.

অন্ধকারের সাক্ষী তোমরা চান্দ আর ভানু।
এইখানে আসিবে কন্যা সোনার বরণ তনু॥
['চন্দ্রাবতী', মৈগী ১, ২ : ১১১]

একই গাথায় নায়ক জয়চন্দ্র মুসলমান এক কন্যার দেহরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তাকে সোনার প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

১৬৭.

আইল যৌবন-কাল অঙ্গে জলে সোনা।
একেলা যাইতে জলে মায় করে মানা॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১৫৪]

'কমলা' গাথায় নায়িকা কমলার তের বছর বয়সী যৌবন-বর্ণনায় দেহের রং-রূপ ও ঔজ্জ্বল্য প্রকাশের প্রতীক হয়েছে সোনা।

১৬৮.

বাহির অন্দরে ছেড়া করে আনাগোনা।
অঙ্গেতে মাখিয়া তার থইছে কাঞ্চা সোনা॥
['রূপবতী', মৈগী ১, ২ : ২৪৬]

'রূপবতী' গাথায় রাজবাড়ীর বক্‌শী মদনের দেহরূপের উজ্জ্বলতা বর্ণনায় এভাবে কাঁচা সোনার প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে।

১৬৯.

আলগে থাকি রামগতি যে নজর করি চায়।
সোনার পুতুলা যেন সামনে দেখা যায়॥
['চৌধুরীর লড়াই', পূগী ৩, ২ : ৩১৫]

'চৌধুরীর লড়াই' গাথায় নায়িকা রঙ্গমালার দেহের রং-রূপ-ঔজ্জ্বল্য বর্ণিত হয়েছে স্বর্ণ নির্মিত পুতুলের প্রতীকে।

১৭০.

শান্ত হইয়া শ্যামপ্রিয়া চক্ষু মিলি চায়।
সোনার পুতুলা যেন সামনে দেখা যায়॥
['চৌধুরীর লড়াই', পূগী ৩, ২ : ৩২৬]

একই গাথায় পুনরায় নায়িকা রঙ্গমালার দেহের রং-রূপ-ঔজ্জ্বল্যের প্রতীক হয়েছে সোনার পুতুল।

১৭১.

মাথায় সোণার ছিট সোণার বরণ পাখী।
এমন সুন্দর রূপ নয়ানে না দেখি॥
['মকুটরায়', পূগী ৪, ২ : ১৩৯]

'মুকুটরায়' গাথায় মুকুটরায় পিতার নির্দেশে পাত্রী সন্ধানে বের হয়ে এক গহীন বনে এলে একটা হীরামন তোতা পাখি দেখতে পায়। ঐ পাখির রং-রূপ বর্ণনায় প্রতীক হিসাবে এসেছে সোনা।

১৭২.

পভাত বেইলের সোণা তেজগো আরে ঢাল্যা দিছে মুখে।
সোণার অঙ্গে সোণার ঢেউ গো আরে ভালা ঝলকে ঝলকে॥
['বীরনারায়ণের পালা', পুগী ৪, ২ : ২৯৪]

'বীরনারায়ণের পালা'য় নায়িকা সোনার যৌবন বর্ণনায় দেহের রং-রূপ ও উজ্জ্বলতা প্রকাশে প্রতীক হিসাবে সোনা ব্যবহৃত হয়েছে দু'বার।

রূপা-মণি-মুক্তা-হীরা-মতি

এগুলো শুভ্রতা, স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতার প্রতীক। আবার মূল্যবান, দুর্লভ, সুন্দর ও অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী বোঝাবার জন্যও গীতিকায় এগুলো প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নের উদাহরণগুলোয় তাই লক্ষ করা যায় :

১৭৩.

কাজলবরণ ভ্রমরের রূপার বরণ আঁখি।
কোন্ বিধাতায় গড়ছে তোমায় কইরা বনের পাখী॥
['রূপবতী', মৈগী ১, ২ : ২৫৫]

'রূপবতী' গাথায় নিঃসঙ্গ রূপবতী একটি ভ্রমরের চোখের বর্ণনায় স্বচ্ছতার প্রতীক হিসাবে রূপাকে ব্যবহার করেছে।

১৭৪.

সাপের মাথায় যেমন থাইক্যা জলে মণি।
যে দেখে পাগল হয় বাইদ্যার নন্দিনী॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ৫]

'মহুয়া' গাথায় সুন্দরী বেদের মেয়ে মহুয়ার রূপ যেন সাপের মাথার মণির মতো ভয়ঙ্কর-সুন্দর। এখানে ঐ রূপকে মণির প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৭৫.

সাপে যেমন পাইল মণি পিয়াসী পাইল জল।
পদ্মফুলের মধু খাইতে ভমরা পাগল॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ২১]

একই গাথায় নায়িকা মহুয়াকে খুঁজে পেয়ে নদের চাঁদের মনে হয়েছে সে যেন মূল্যবান ও দুর্লভ মণি পেয়েছে।

১৭৬.

সতীর না পতি যেমন সাপের মাথার মণি।
দণ্ডেক ছাড়িয়া গেলে নাই সে বাঁচে প্রাণী॥
['কাঞ্চনমালা', পূগী ২, ২ : ৯৭]

'কাঞ্চনমালা' গাথায় কাঞ্চনমালা তার স্বামীকে হারিয়ে যেন উপলব্ধি করল স্বামী কত। তাই সে সাপের মাথার মণির প্রতীকে প্রকাশিত।

১৭৭.

আন্ধাইর ঘরে থইলে কন্যা কাঁঞ্চা সোনা জ্বলে।
বনে ফুটে ফুলরে ভালা পরবতে জ্বলে মণি॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ২০]

'মহুয়া' গাথায় মহুয়ার রূপ বর্ণনায় মূল্যবান ও দুর্লভতার প্রতীক হিসাবে মণি ব্যবহৃত হয়েছে।

১৭৮.

দেখিতে সুন্দর কন্যা বনের হরিণী।
সপ্পের মাথায় যেন জ্বলে দিব্য মণি॥
['পীরবাতাসী', পূগী ৪, ২ : ৩৪৬]

'পীরবাতাসী' গাথায় নায়িকা বাতাসীর সমগ্র রূপকেই সর্পমণির প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে। সর্পমণি এখানে মহামূল্যবান বস্তু ও সুন্দরের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

১৭৯.

জোড় মাণিকে গড়ছে তার দুই নয়নের তারা।
রাম ধনুকে গড়ছে ভাই তার দুই ভুরা রে॥
['সোণারায়ের জন্ম', পূগী ৪, ২ : ৪৬৭]

'সোণারায়ের জন্ম' গাথায় সোনারায়ের রূপ বর্ণনায় দুই নয়নতারাকে স্বচ্ছতার প্রতীক হিসাবে জোড়া মাণিক ব্যবহার করা হয়েছে।

১৮০.

পাশাল কপাল কন্যার মুক্তা দন্ত পাট।
এই কন্যার বড় ভাগ্য আছে রাজার পাট॥
['রূপবতী', মৈগী ১, ২ : ২৪২]

'রূপবতী' গাথায় নায়িকা রূপবতীর রূপবর্ণনায় তার দাঁতের পাটিকে শুভ্রতা ও স্বচ্ছতার জন্য মুক্তা প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে।

১৯০.

তার মধ্যে দন্ত লীলার নাহি যায় দেখা।
দুর্লভ মুকুতা যেমন ঝিনুর মধ্যে ঢাকা॥
['কঙ্ক ও লীলা', মৈগী ১, ২ : ২৭১]

'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় নায়িকা লীলার যুগ্ম অধরের মধ্যে শুভ্রতা, স্বচ্ছতা, মূল্যবান ও দুর্লভতার প্রতীক মুক্তা স্বরূপ দাঁত লুকিয়ে আছে। ঝিনুকের মধ্যে যেমন মহামূল্য মুক্তা লুকিয়ে থাকে তার দাঁতও যেন তেমনি দুই ঠোঁটের অন্তরালে প্রকাশের আশায়।

১৯১.

তুমি আমার চন্দ্রসূর্য্য তুমি নয়নতার।
তুমি আমার মণিমুক্তা তুমি গলার হার॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১৫০]

'কমলা' গাথায় নায়ক প্রদীপকুমার নায়িকা কমলাকে মূল্যবান ও দুর্লভতার চিহ্ন রূপে মণিমুক্তার প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

১৯২.

হাসিতে ঝলকে যেন বিজলির রেখা।
মুখেতে মুক্তার ছড়া জুরে যায় দেখা॥
['কাফেন-চোরা', পূগী ৩, ২ : ৫৫]

'কাফেন-চোরা' গাথায় আয়রা বিবির রূপ বর্ণনায় হাসিতে দাঁতের প্রকাশে মুক্তার প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে।

১৯৩.

হীরা-মতি জ্বলে কন্যা যখন নাকি হাসে।
সুজাতি বর্ষার জলেরে যেমন পদ্মফুল ভাসে॥
['কাজলরেখা', মৈগী ১, ২ : ৩৪৩]

'কাজলরেখা' গাথায় নায়িকা কাজলরেখার রূপবর্ণনায় হাসি ও দাঁতের প্রকাশে হীরা-মতির ঔজ্জ্বল্যের প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। তার হাসির মধ্য দিয়ে শুভ্র দন্তের প্রস্ফুটনে সমগ্র মুখের যে দীপ্তি ফুটে ওঠে তা হীরা-মতির প্রতীকে প্রকাশ পেয়েছে।

১৯৪.

পরথম যৌবনে কন্যা হীরা-মতি জ্বলে।
কন্যারে দেখিয়া কুমার কহে মিঠা বুলে॥
['কাজলরেখা', মৈগী ১, ২ : ৩২৭]

একই গাথায় প্রথম যৌবনে কাজলরেখার দেহের রং এতটাই উজ্জ্বল যে তা-ও হীরা-মতির প্রতীকে প্রকাশিত।

ধন

ধন শব্দটির অর্থ সম্পদ। তাই গীতিকায় স্বামী-স্ত্রী, প্রণয়ী-প্রণয়িনী কিংবা পুত্র-কন্যাকে সম্পদ হিসাবে ধনের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছেঃ

১৯৫.

হায় প্রভু কোথা গেলা অঞ্চলের ধন।
তোমারে ছাড়িয়া কেম্‌নে রাখিবাম জীবন॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৯৪]

'মলুয়া' গাথায় চান্দবিনোদ শিকারে গেলে তাকে বিষাক্ত সাপে কাটে। তার এ মুমূর্ষু অবস্থায় স্ত্রী মলুয়া নিজ স্বামীকে মূল্যবান সম্পদ হিসাবে ধনের প্রতীকে প্রকাশ করে।

১৯৬.

নানান দেশ ঘুর‍্যা কন্যা লো বেউরে আসিনু।
সপ্পনের ধন মোর সাক্ষাতে মিলিল॥
['মুকুটরায়', পূগী ৪, ২ : ১৪১]

'মুকুটরায়' গাথায় নায়ক মুকুটরায় পূর্বে স্বপ্নে দেখা ব্যাধকন্যাকে সামনে পেলে তার কাছে মূল্যবান সম্পদ মনে হওয়ায় তাকেও ধনের প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

১৯৭.

মায়ের কান্দনে কন্যা চক্ষু মেল্যা চায়।
মায়ের বুকের ধন চুরে লইয়া যায়॥
['মলয়ার বারমাসী', পূগী ৪, ২ : ৪০৯]

'মলয়ার বারমাসী' গাথায় নবরঙ্গপুরের নিতি মাধবের কন্যা মলয়াকে মাতার মূল্যবান সম্পদ হিসাবে ধনের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

পাষাণ বা পাথর

কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা বা মৌনতার প্রতীক হিসাবে পাষাণ বা পাথরের ব্যবহার নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলোয় পাওয়া যায় :

১৯৮.

পাষাণে বান্ধিয়া হিয়া বসিল শিওরে।
নিদ্রা যায় নদীয়ার ঠাকুর হিজল গাছের তলে॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ২৪]

'মহুয়া' গাথার শেষে যখন হুমরা বেদে নায়িকা মহুয়ার হাতে ছুরি দিয়ে নদের চাঁদকে হত্যা করতে বলে তখন মহুয়া তার নির্দেশে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন নদের চাঁদের শিয়রদেশে ছুরি হাতে যে কঠোর ও নিষ্ঠুর মানসিকতা নিয়ে গিয়ে বসল তা-ই প্রকাশিত হয়েছে পাষাণের প্রতীকে। পিতার নির্দেশে কোমল হৃদয়কে সে পাষাণে পরিণত করতে বাধ্য হয়েছিল।

১৯৯.

পাষাণ আমার মাও বাপ পাষাণ আমার হিয়া।
কেমনে ঘরে যাইবাম ফিইরা তোমারে মারিয়া॥
['মহুয়া' মৈগী ১, ২ : ২৪]

একই গাথায় প্রাণপ্রিয় নদের চাঁদকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যার নির্দেশ প্রদান করায় মহুয়ার বাবা-মাকেও মহুয়া কঠোর ও নিষ্ঠুর আখ্যা দিয়ে পাষাণের প্রতীকে প্রকাশ করেছে এবং ছুরি হাতে নিতে বাধ্য হওয়ায় নিজের হৃদয়কেও পাষাণ মনে করেছে।

২০০.

শাণে বান্ধা হিয়া আমার পাষাণে বান্ধা প্রাণ।
তোমায় বধিতে বাপে কহিল সইন্ধান॥
['মহুয়া' মৈগী ১, ২ : ২৫]

পুনরায় একই গাথায় ছুরি হাতে মহুয়া নদের চাঁদের কাছে নিজের এই কঠোর মানসিকতা ও নিষ্ঠুরতার কারণে নিজের প্রাণকেই নিজে পাষাণের প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

২০১.

শিরে হাত দিয়া সবে জুড়য়ে কান্দন।
শুনিয়া হইল চন্দ্রা পাথর যেমন॥
['চন্দ্রাবতী' মৈগী ১, ২ : ১১৩]

'চন্দ্রাবতী' গাথায় নায়ক জয়চন্দ্রের মুসলমান কন্যাকে বিয়ের সংবাদে নায়িকা চন্দ্রাবতীর মানসিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে পাথরের প্রতীকে। পাথর যেমন নিশ্চল, স্থির, নীরব ও মৌন, জয়চন্দ্রের সংবাদে চন্দ্রাবতীরও অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা।

২০২.

তিন চাইর কিল মারে তারে ঘেণ্ডির উপর।
খাড়াই রইছে চান্দ ভাঁড়ালী যেমন পাথর॥
[চৌধুরীর লড়াই', পূগী ৩, ২ : ৪২১]

'চৌধুরীর লড়াই' গাথায় সম্পত্তি লিখিত সনদ ছিড়ে ফেলার অপরাধে রাজেন্দ্রনারায়ণ তার পরামর্শদাতা চান্দ ভাড়ালীর ঘাড়ে কিলের পর কিল বসিয়ে দিলে সে যেভাবে স্থির, নিস্তব্ধ বা মৌন হয়ে গেল তা-ই প্রকাশ পেয়েছে পাথরের প্রতীকে।

শান

ইট পাথরে তৈরি পাকা মেঝেই শান। তাই ঝকঝকে-তকতকে বা মসৃণ ও পরিচ্ছন্ন অর্থে শান-এর প্রতীকে ব্যবহারই স্বাভাবিক। কিন্তু ইট-পাথরের মতো কঠিন পদার্থ দিয়ে শান তৈরি বলে গীতিকায় শানও ব্যবহৃত হয়েছে পাথরের মতো কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতার প্রতীক হিসাবে। তা-ই লক্ষ্য করা যায় :

২০৩.

শাণে বান্ধা হিয়া আমার পাষাণে বান্ধা প্রাণ।
তোমায় বধিতে বাপে কহিল সইন্ধান॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ২৫]

'মহুয়া' গাথায় মহুয়া পিতার নির্দেশে ছুরি হাতে নদের চাঁদকে হত্যা করতে তার কাছে গেলে নিজের এই কঠোর মানসিকতা ও নিষ্ঠুরতার জন্য নিজের হৃদয়কেই শানের প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

২০৪.

কঠিন তোমার মাতাপিতা শানে বান্ধা হিয়া।
প্রাণে কেমনে বাইচা আছে তোমারে বনে দিয়া॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ৩২]

একই গাথার শেষে মহুয়া নিজ প্রেমে জয়ী হলে নদের চাঁদকে হত্যা না করে তাকে নিয়ে পালিয়ে এক সাধুর নৌকায় উঠলে সাধু কৌশলে নদের চাঁদকে নদীতে ফেলে দিয়ে মহুয়ার প্রতি প্রেম নিবেদন করে। মহুয়াও আপন বুদ্ধি বলে পালিয়ে নদের চাঁদকে খুঁজতে খুঁজতে গহীণ বনের এক দেবমন্দিরের কাছে চলে এলে এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পায়। সেও মহুয়ার রূপ দেখে বিচলিত হয় এবং এত সুন্দর কন্যাকে বনবাসী হতে দেখে সন্ন্যাসী মহুয়ার বাবা-মার হৃদয়ের কঠোর নিষ্ঠুরতার জন্য শানের প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

ধনু

বক্রতার প্রতীক হিসাবে ধনুর ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায় কোথাও:

২০৫.

বড়ই ছুরত তার দুনয়ান বাঁকা।
ধনুর মতন ভুরু আছ্মানেতে আঁকা॥
['কাফেন-চোরা', পূগী ৩, ২ : ৫৫]

'কাফেন-চোরা' গাথায় আজিমের দ্বিতীয় স্ত্রী আয়রা বিবির রূপ বর্ণনায় তার সুন্দর বদনে বাঁকা দু নয়নের উপর বক্র ভুরুকে ধনুর প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

গলার হার

হার গলার অলঙ্কার বিশেষ। ফলে তার অবস্থান হৃদয়ের কাছাকাছি। তাই হৃদয়ের কাছাকাছি ব্যক্তি বা মনের মানুষের প্রতীক অথবা অলঙ্কারের মতো প্রিয় বস্তুর প্রতীক হিসাবে গলার হার ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নের উদাহরণ দুটোয় :

২০৬.

দরিয়ায় গলিয়া পড়ে আমার গলার হার।
বিধাতা করিল দুঃখী দুষ বা দিয়াম কার॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ৩১]

'মহুয়া' গাথায় নৌকা থেকে নদীতে পরে হারিয়ে যাওয়া নদের চাঁদকে মহুয়া মনের মানুষ অথবা প্রিয় বস্তুর হিসাবে গলার হারের প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

২০৭.

তুমি আমার চন্দ্রসূর্য্য তুমি নয়নতার।
তুমি আমার মণিমুক্তা তুমি গলার হার॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১৫০]

'কমলা' গাথায় নায়িকা কমলার রূপে মুগ্ধ হয়ে নায়ক প্রদীপকুমার কমলাকে মনের মানুষ অথবা প্রিয় বস্তুর হিসাবে গলার হারের প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

ঘৃতবাতি

সমৃদ্ধি ও আনন্দের প্রতীক হিসাবে ঘৃতবাতির ব্যবহারও গীতিকায় লক্ষ্য করা যায়:

২০৮.

জ্বালিয়া ঘীয়ের বাতি ফু দিয়া নিবাই।
তুমি বন্ধুরে আমার আর লইক্ষ্য নাই॥
['মহুয়া' মৈগী ১, ২ : ২৪]

'মহুয়া' গাথায় মহুয়া যখন পিতার নির্দেশে ছুরি দিয়ে নিদ্রিত নদের চাঁদকে হত্যা করতে আসে তখন সে ভাবে, নিজেই কি নিজেদের এ পবিত্র প্রেমের ধ্বংস করবে, অর্থাৎ ঘৃতবাতি জ্বালিয়ে নিজেই তা নিবিয়ে ফেলবে? এখানে তাই ঘৃতবাতি হয়েছে মহুয়া ও নদের চাঁদের সমৃদ্ধিময় প্রেমের প্রতীক।

বিষ

প্রবল বিষক্রিয়ায় প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। তাই বিষ অপ্রীতিকর বস্তু বা ব্যক্তির প্রতীক। নিম্নের উদাহরণে তা লক্ষ্য করা যায় :

২০৯.
বিষ হইল ঘরবাড়ী বিষ হইলাম আমি।
কর্ম্মদোষে বিষ হইল ঘরের নন্দিনী॥
['রূপবতী' মৈগী ১, ২ : ২৪৪]

'রূপবতী' গাথায় নায়িকা রূপবতীর বিয়ের বয়স পার হতে চললেও তার যোগ্য পাত্র পাওয়া না যাওয়ায় রানী অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এজন্য তিনি সমস্ত পরিবেশকে বিষের প্রতীকে প্রকাশ করেছেন। অবিবাহিত কন্যা ঘরে রাখা যেন বিষক্রিয়ায় মৃত্যুসম।

প্রাণি আশ্রয়ী প্রতীক

হাতি

পশুদের মধ্যে হাতিই হৃষ্টপুষ্ট ও মোটাসোটা। তাকে পালনের জন্যও খরচ হয় বহু অর্থ। এ কারণে হাতিকে ধনী বা বড়লোকের প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়। যার ব্যবহার পাওয়া যায় নিম্নের উদ্ধৃতিটিতে:

২১০.
কিসের লাগ্যা আইছুইন দুয়ারে আইছুন খারা।
কাঙ্গালের দুয়ারে আইজ আত্তির কেন পাড়া॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১২৭]

এখানে 'কমলা' গাথায় কারকুন কমলাকে পাবার জন্য দুষ্ট গোয়ালিনীর শরণাপন্ন হতে তার বাড়ি যায়। গোয়ালিনী তার ভাঙ্গা বাড়িতে কারকুনের মতো ধনী ও নামী-দামী লোককে আসতে দেখে তাকে হাতির প্রতীকে প্রকাশ না করে পারেনি।

ঘোড়া

ঘোড়া তেজ ও শক্তির প্রতীক। তাই নিম্নের উদ্ধৃতিটিতে শক্তির প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে রণ-দৌড়ের ঘোড়া :

২১১.
আমার সোয়ামী সে যে পর্ব্বতের চূড়া।
আমার সোয়ামী যেমন রণ-দৌড়ের ঘোড়া॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৭৫]

'মলুয়া' গাথায় নায়ক কৃষকপুত্র চান্দবিনোদের নব বিবাহিতা সুন্দরী স্ত্রী কৃষককন্যা মলুয়ার রূপৈশ্বর্য দেখে গ্রামের কাজী তাকে স্ত্রী হিসাবে পেতে চায় এবং এ প্রস্তাব নেতাই কুটনীকে দিয়ে পাঠালে মলুয়া তা প্রত্যাখান করে কুটনীকে অপমানিত করে তাড়িয়ে দেয়। প্রতিউত্তর হিসাবে মলুয়া কুটনীকে তার স্বামী সম্পর্কে জানায়, সে অনেক তেজী এবং শক্তিসম্পন্ন। তাই সে তাকে রণ-দৌড়ের ঘোড়ার প্রতীকে প্রকাশ করেছে। সে মনে করে তার স্বামী রণক্ষেত্রে বিপক্ষ দলকে পরাজিত করায় অশ্বশক্তিসম্পন্ন। কাজেই সে স্বামীর বিশ্বস্ততাকে জলাঞ্জলি দিয়ে কাজীর প্রস্তাবে রাজি হতে পারে না।

বাঘ

হিংস্রতার প্রতীক হিসাবে বাঘের ব্যবহার লক্ষ করা যায় কোথাও কোথাও। গীতিকায় বর্ণিত তৎকালীন সমাজের কাজী, দেওয়ান, সওদাগর, গাজী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি সহজ সরল মানুষদের, বিশেষত গাথার নায়ক-নায়িকাদের প্রতি নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ করে যে হিংস্রতার পরিচয় দিয়েছে তা-ই ফুটে উঠেছে নিম্নের উদ্ধৃতিগুলোয় :

২১২.

হাটুতে পাতিয়া মাথা চিন্তে বিনোদ ঘরে।
হরিণা পড়িল যেমন বাঘের কামরে॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৮৫]

'মলুয়া' গাথায় নায়ক চান্দ বিনোদের নববিবাহিতা সুন্দরী স্ত্রী নায়িকা মলুয়ার রূপৈশ্বর্য দেখে দুশ্চরিত্র কাজী তার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি বর্ষণ করে উদ্দেশ্য সাধনে একাধিকবার ব্যর্থ হলে চান্দবিনোদের উপর বিভিন্ন রকম নিষ্ঠুর ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কাজীর এমনি হিংস্র মানসিকতাকে বাঘের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

২১৩.

হরিণা পড়িল যেমন বাঘের কামড়ে।
কাইন্দা কাইন্দা কয় মলুয়া দেওয়ানের গোচরে॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৮৮]

২১৪.

দেওয়ানে দেখিয়া মলুয়া বড় ভয় পাইল।
বাঘের কামড়ে যেন হরিণা পড়িল॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৮৯]

একই গাথার শেষে ঘটনাক্রমে মলুয়া দেওয়ানের প্রাসাদে বন্দি হয়। সেখানেও দেওয়ান তার রূপ দেখে তাকে স্ত্রী হবার প্রস্তাব দিলে উত্তরে মলুয়া মিথ্যা ব্রতের তিনমাস বাকী বলে সময় চেয়ে নেয়। ক্রমে তিনমাস গত হলে প্রিয়সান্নিধ্য লাভের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে দেওয়ান মলুয়ার কক্ষে যায় হিংস্র মানসিকতা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে। পূর্বোক্ত দুটি উদ্ধৃতিতেই দেওয়ানের এসব হিংস্রতাকে বাঘের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

২১৫.

বাঘের মুখেতে পড়ি বনের হরিণী।
ছাড়ি দিয়ে হোতর মতন দোন চোগর পানি॥
['কাফেন-চোরা', পূগী ৩, ২ : ৪৭]

'কাফেন-চোরা' গাথায় বাঁশ বেপারী লুধা গাজী পাহাড়ী কন্যা চেঁউয়া পরীকে অপহরণ করে নিয়ে যাবার সময় তার হিংস্র রূপকে বাঘের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

২১৬.

এম্নিকালে ভোলারে দেখি বড় ভয় পাইল।
বাঘের কামড়ে যেন হরিণী পড়িল॥
['ভেলুয়া', পূগী ৩, ২ : ১১৯]

'ভেলুয়া' গাথায় নায়িকা ভেলুয়া যখন দুশ্চরিত্র ভোলা সওদাগরের কবলে পড়ে তখন ভোলা সওদাগরের যে হিংস্র রূপ প্রকাশ পেয়েছে তা-ই ফুটে উঠেছে বাঘের প্রতীকে।

হরিণ

সৌন্দর্যের প্রতীক, প্রাণ-চাঞ্চল্য বা চঞ্চল চপলতার প্রতীক বা ভীরুতার প্রতীক হিসাবে হরিণের ব্যবহার লক্ষ করা যায় নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে :

২১৭.

মুখখান যেমন তার পুন্নুমাসীর চান।
চৌক্ জিনিয়া যেন মিড়কের নয়ান॥
['দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদালি', পূগী ৩, ২ : ৩৫৩]

'দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদালি' পালায় বর্ণিত গৌড়ের নবাব জোলাল উদ্দীনের এক অপরূপ সুন্দরী ও বুদ্ধিমতি কন্যা মমিনা খাতুনের বিবাহপূর্ব রূপ বর্ণনায় তার চোখ দুটি হরিণের চঞ্চল চপলতার প্রতীকে প্রকাশিত।

২১৮.

দেখিতে সুন্দর কন্যা বনের হরিনী।
সপ্পের মাথায় জ্বলে দিব্য মনি॥
['পীরবাতাসী', পূগী ৪, ২ : ৩৪৬]

'পীরবাতাসী' গাথায় এক ওঝার পালিত বন্যকন্যা নায়িকা বাতাসীর অখণ্ড দেহরূপের বর্ণনায় তার অবস্থান বন্য হরিণীর মতোই। যে সর্বদা চঞ্চল ও ভীরুতার সাথে পদনিক্ষেপ করে। তাই সেও হরিণের প্রতীকে প্রকাশিত।

হরিণ সৌন্দর্য, ভীরুতা কিংবা চঞ্চলতার প্রতীক হলেও নিম্নের উদাহরণটিতে হরিণের ভিন্ন প্রতীকী ব্যবহার লক্ষ করা যায় :

২১৯.

মেঘের অঙ্গেতে যেমন গো বিজলীর ঝলা।
চলিছে সোণার মৃগ গো বন করি উজলা॥
['চন্দ্রাবতীর রামায়ণ', পূগী ৪, ২ : ২৫৭]

'চন্দ্রাবতীর রামায়ণ' নামক পৌরাণিক গাথার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সীতার বনবাসকালীন বারমাসী বর্ণনায় একদিন পঞ্চবটী বনে কুটিরের বাইরে পত্নী সীতাসহ রামচন্দ্র বসেছিলেন। দেবর লক্ষ্মণ বসেছিলেন অদূরে। এমন সময় বন উজ্জ্বল করে একটি সুন্দর স্বর্ণালী হরিণ গহীণ বনে হারিয়ে যাচ্ছিল। সীতার অনুরোধে রাম হরিণের পিছু ছুটে বিপদে পড়লে ভাই লক্ষ্মণও সীতাকে একা ফেলে চলে গেলেন তাকে

উদ্ধার করতে। এদিকে যোগী বেশে লঙ্কাপতি এসে ফল খাওয়ার ছলে একাকী সীতাকে লঙ্কাপুরীতে হরণ করে নিয়ে গেল। সীতা হরণের পিছনে যেহেতু হরিণটিই মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিল সেহেতু হরিণটি হয়ে উঠেছে এখানে সীতা হরণের প্রতীক।

কবুতর

কবুতর-কবুতরীর বসবাস শান্ত, নিরুপদ্রব জীবন ও গার্হস্থ শান্তির প্রতীক। তাই গীতিকায় এর ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়:

২২০.

সুবর্ণ কপোতী মায়ের হৃদয়ের নলী।
কেমনে উড়াইয়া দিব খোপ কইরা খালি॥
['রূপবতী', মৈগী ১, ২ : ২৪৯]

'রূপবতী' গাথায় রূপসী রাজকন্যা রূপবতী রাজা ও রানীর সংসারে শান্তিতে বসবাস করছিল বলে তার প্রতীক হয়েছে কবুতরী।

২২১.

কৈতরা কৈতরী যেমন. খোপাতে বসিয়া,
বাস করে মুখে মুখ মিলাইয়া॥
['কাঞ্চনমালা', পূগী ২, ২ : ১০১]

'কাঞ্চনমালা' গাথায় নায়ক ফুলকুমারের সাথে প্রতিনায়িকা কুঞ্জলতার সুখী দাম্পত্য জীবনে শান্তিপূর্ণ বসবাস কবুতর-কবুতরীর প্রতীকে প্রকাশিত।

২২২.

দুইজনেতে মনের মিল রয় ভরাভরি।
এই মতে রয় যেন কইতরা কইতরী॥
['কাঞ্চনমালা', পূগী ২, ২ : ১০৫]

একই গাথায় কাঞ্চনমালা নায়ক ফুলকুমারকে স্বামী হিসাবে ফিরে পেয়ে উভয়ের শান্তিপূর্ণ বসবাস কবুতর-কবুতরীর প্রতীকে প্রকাশিত।

বক

বক মাছ শিকারের জন্য অপরিসীম ধৈর্য নিয়ে কপটরূপে প্রতীক্ষারত থাকে। তাই কপটতা ও আপাত নিরীহপণার প্রতীক হিসাবে বক ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নের উদ্ধৃতিতে :

২২৩.

বগা যেমন চউখ বুজ্‌এ্যা পাগারের ধারে।
সাধু অইয়া বস্যা থাক্যা পুডী মাছ ধরে॥
মনসুর বয়াতী কয় সেই মতন রইয়া।
বিবি রইল যেমন খাপ ধরিয়া॥
['দেওয়ানা মদিনা', মৈগী ১, ২ : ৩৬৩]

'দেওয়ানা মদিনা' গাথায় বিমাতা তার সতীন পুত্রদ্বয় আলাল-দুলালকে প্রাণহরণের জন্য লোক-দেখানো আদর-যত্ন করেন বিপুলভাবে। উপযুক্ত সময়ের জন্য অসীম ধৈর্য নিয়ে বকের মতো তিনি অপেক্ষা করছিলেন। তার এই গোপন কপটতা ও নিরীহপনার জন্য তাকে মাছ শিকাররত বকের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে এখানে।

তীর্থের কাক

লোভের প্রতীক্ষাকারী বা পরানুগ্রহ প্রত্যাশী লোভী ব্যক্তির প্রতীক হিসাবে তীর্থের কাকের কথা আমরা সবাই জানি। উক্ত প্রতীক ব্যবহারের দৃষ্টান্তও গীতিকায় দুস্প্রাপ্য নয়ঃ

২২৪.

বাপ নাই মাও নাইরে মায়ের পেটের ভাই।
তীর্থের না কাউয়া যেমুন উইড়া না বেড়াই
গো রাজা কহি যে তোমারে॥

['আন্ধাবন্ধু', পূগী ৪, ২ : ১৮৯]

'আন্ধাবন্ধু' গাথার নায়ক অন্ধ বংশীবাদক বাঁশী বাজিয়ে রাজার দুয়ারে ভিক্ষা প্রার্থনা করলে রাজা তার পরিচয় জানতে চান। তখন সে নিজে যে একজন পরাণুগ্রহ প্রত্যাশী ব্যক্তি তা উপলব্ধি করে রাজার কাছে নিজের পরিচয় সম্পর্কে তীর্থের কাকের প্রতীক ব্যবহার করেছে।

চিল

আমরা জানি উচ্চ ও তীক্ষ্ণ শব্দকারী হিংস্র ও মাংসাশী পাখি চিল। তাই চিল হিংস্রতার প্রতীক। কিন্তু জোয়ারের সময় তার যে অস্থির চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়, বিশেষত মাছ শিকারের জন্য, তা-ই বর্ণিত হয়েছে নিম্নের উদ্ধৃতিটিতে:

২২৫.

আমি না পাগল কন্যা যোয়াইয়ের চিলা।
এইখানে থাকিয়া কন্যা শুন আমার কথা॥
['ধোপার পাট', পূগী ২, ২ : ৪]

'ধোপার পাট' গাথায় নায়ক রাজপুত্র নায়িকা কাঞ্চনমালার প্রতি গভীর প্রণয়াসক্তির কথা বলে নিজেকে জোয়ারের চিলের প্রতীকে প্রকাশ করে। জোয়ারের সময় মাছের আশায় চিলগুলো যেমন পাগলের মতো অস্থির হয়ে উড়তে থাকে, রাজপুত্রের অবস্থাও কাঞ্চনমালার জন্য তেমনি। তাই এখানে জোয়ারের চিল হয়ে উঠেছে অস্থিরতার প্রতীক।

কোকিল কণ্ঠ

কোকিল বা কোকিলের কণ্ঠ বসন্ত ঋতুর প্রতীক হলেও নিম্নের উদ্ধৃতি দুটোয় সুমধুর কণ্ঠস্বরের প্রতীক হিসাবে কোকিলের কণ্ঠ ব্যবহৃত হয়েছে :

২২৬.

বেলাইনে বেলিয়া তুলছে দুই বাহুলতা।
কণ্ঠেতে লুকাইয়া তার কোকিলে কয় কথা॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১২৫]

'কমলা' গাথায় মানিক চাকলাদারের কন্যা নায়িকা কমলার রূপবর্ণনায় তার মিষ্টি কণ্ঠস্বরকে কোকিলের কণ্ঠস্বরের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

২২৭.

মুখের গঠন মাইয়ার পুন্নিমার শশী।
বচন কোকিলার বোল কানুর হাতর বাঁশী॥
['নেজাম ডাকাইতের পালা ', পূগী ২, ২ : ৩৩৫]

'নেজাম ডাকাইতের পালা'য় পাহাড়ী সর্দারের অপরূপ কন্যা নায়িকা লালবাইর রূপবর্ণনায় পূর্ণিমা চাঁদতুল্য মুখ থেকে নিঃসৃত সুমধুর কণ্ঠস্বরকে কোকিলের কণ্ঠস্বরের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে যা কৃষ্ণের হাতের বাঁশীর সুরের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ভ্রমর

কৃষ্ণত্বের প্রতীক হিসাবে ভ্রমরও ব্যবহৃত হয়েছে কোথাও কোথাও:

২২৮.

আঁখির তারা যে কন্যার অতি মনোহর।
পৰ্দ্দফুলের মাঝে যেন রসিক ভোমর॥
['ভেলুয়া', পূগী ৩, ২ : ৯০]

'ভেলুয়া' গাথায় নায়িকা ভেলুয়ার রূপ বর্ণনায় চোখের মণিকে ভ্রমরের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

২২৯.

দুই নয়ানে দুই মণি যেন কালা তারা।
ফুলের উপর মধু খায়া ঘুমায় ভোমরা॥
['সোণারায়ের জন্ম', পূগী ৪, ২ : ৪৭৪]

'সোণারায়ের জন্ম' গাথায় ঘোড়াঘাট শহরে ফুল বেগমের রূপ বর্ণনায় চোখের মণির কৃষ্ণত্ব প্রকাশ করার জন্য ভ্রমরের প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে।

ভ্রমর কৃষ্ণত্বের প্রতীক হলেও নিম্নের উদ্ধৃতিটিতে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে বনের নিঃসঙ্গ প্রাণীর প্রতীক হিসাবে :

২৩০.

মাও ছাড়ছি বাপ ছাড়ছি ছাড়ছি জাতি কুল।
ভমর হইলাম আমি তুমি বনের ফুল॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ২৫]

'মহুয়া' গাথায় নদের চাঁদ নায়িকা মহুয়ার জন্য বাপ-মা সকল ছেড়ে নিঃসঙ্গভাবে যেন ভ্রমরের মতো মহুয়ার আশায় বনে বনে ঘুরছে। তাই সে নিজেকে ভ্রমরের প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

জোনাকী

জোনাকী পোকা ক্ষীণ আলোর প্রতীক। তা-ই ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নের উদাহরণে :

২৩১.

আমার বন্ধু চান্দ-সুরুজ কাঞ্চা সোনা জ্বলে।
তাহার কাছে সুজন বাদ্যা জ্যোনি যেমন জ্বলে॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ৪০]

'মহুয়া' গাথায় মহুয়া ও নদের চাঁদের প্রণয় মহুয়ার পিতা মেনে না নিয়ে তার বেদে দলের ভালো খেলোয়াড় সুজনের সাথে তাকে বিয়ে দিতে চাইলে মহুয়া নদের চাঁদের তুলনায় তাকে জোনাকী পোকার ক্ষীণ আলোর প্রতীকে প্রকাশ করেছে এখানে।

সাপ

গোপন শত্রুতার প্রতীক হিসাবে সাপের ব্যবহারও গীতিকায় দুর্লভ নয়:

২৩২.

সতীন আইল ঘরে হইল সর্ব্বনাশ।
সাপের সঙ্গতি যেন হইল গিরবাস॥
['কাঞ্চনমালা', পূগী ২, ২ : ১০৮]

'কাঞ্চনমালা' গাথায় প্রতিনায়িকা কুঞ্জমালা তার স্বামী ফুলকুমারের প্রথমা স্ত্রী ও নায়িকা কাঞ্চনমালার পরিচয় পেয়ে বুঝল যে সে তার সতীন। তাই তাকে গোপন শত্রু হিসাবে কুঞ্জমালা সাপের প্রতীক ব্যবহার করেছে।

পশু-পাখি

ছিন্নমূল ও উন্মুলিত জীবনের প্রতীক হিসাবে পশু-পাখীর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় কোথাও;

২৩৩.

বাড়ী নাইরে ঘর নাইরে বন্ধো যথায় তথায় থাকি।
উইরা ঘুইরা ফিরি যেমন বনের পশু পংখী॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ৩৫]

'মহুয়া' গাথায় পিতার নির্দেশ সত্ত্বেও মহুয়া নদের চাঁদকে হত্যা করতে না পেরে উভয়ে পালিয়ে এক বনে এসে বনদম্পতির ন্যায় যখন বসবাস করছিল, তখন তারা নিজেদের এই ছিন্নমূল ও উন্মুলিত জীবনকে পশু-পাখীর প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

কাল্পনিক জীব-জন্তু ও দেব-দেবী আশ্রয়ী প্রতীক

যম-যমরাজ

মৃত্যুর দেবতা যম। এ কারণে হিংস্র, অমানবিক ও কঠোর মানসিকতাকে যম, যমদূত বা যমরাজের প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে কোথাও কোথাও:

২৩৪.

সামনেতে হুমরা বাদ্যা যম যেন খারা।
হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছে বিষলক্ষের ছুরা॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ৩৯]

'মহুয়া' গাথার শেষে যখন নদের চাঁদ ও মহুয়া পালিয়ে এক বনে এসে বনদম্পতির ন্যায় বসবাস করছিল, তখন মহুয়ার পিতা হুমরা বেদে তাদের সন্ধান পেয়ে নদের চাঁদের প্রতি চরম প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে মহুয়ার হাতে বিষলক্ষের ছুরি তুলে দিল তাকে হত্যা করতে। এমন অবস্থায় প্রতিশোধের আগুনে জলন্ত হুমরাকে হিংস্র ও কঠোর মানসিকতার জন্য যমের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

২৩৫.

যমে মাইণসে টানাটানি বিনোদে লইয়া॥
দারুণ বিধাতা দিছে কপালে লিখিয়া॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৮৫]

'মলুয়া' গাথায় দুষমন কাজী মলুয়ার প্রতি দ্বিতীয় বারের মতো প্রেম নিবেদনে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিনোদের উপর পরোয়ানা জারি করালো সপ্তাহকালের মধ্যে তার স্ত্রী মলুয়াকে দেওয়ানের কাছে দিয়ে দেওয়ার জন্য। এমনি অবস্থায় বিনোদের বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থায় কাজীকে হিংস্রতার প্রতীকরূপে যমের অনুষঙ্গে দেখানো হয়েছে।

২৩৬..

পাহাড়িয়া দেহ যেন কাল মেঘের সাজ।
যমদূতগণ সঙ্গে যেন যমরাজ॥
['দস্যু কেনারামের পালা', মৈগী ১, ২ : ১৯৯]

'দস্যু কেনারামের পালা'য় ডাকাত কেনারাম গায়ক বংশীদাসকে নিজ দলবলসহ আক্রমণ করলে তার ও তার অনুচরদের বিশাল দেহ ও হিংস্র রূপকে যমদূত ও যমরাজের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

রাক্ষস

অতি শক্তিশালী, হিংস্র, দানবীয়, অমানবিক ও কঠোর মানসিকতার প্রতীক হিসাবে রাক্ষসের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় নিম্নের উদ্ধৃতিটিতে :

২৩৭.

রাইক্ষসের হাতে পড়ি না দেখি উপায়।
মনে মনে চিন্তে কন্যা কি মতে পালায়॥
['মহুয়া', মৈগী ১,২:৩৪]

'মহুয়া' গাথায় নায়িকা মহুয়া নায়ক নদের চাঁদকে নিয়ে পালাতে গিয়ে এক সাধুর নৌকায় উঠলে পাকে পড়ে নদের চাঁদ নদীর পানিতে হারিয়ে গেল। পরে মহুয়া তাকে খুঁজতে খুঁজতে এক পার্বত্য বনে চলে এল। সেখানে এক মন্দিরে সন্ন্যাসীর সহায়তায় নিয়ে আসা মুমূর্ষু নদের চাঁদের সাক্ষাৎ পেল মহুয়া। কিন্তু ঐ সন্ন্যাসী মহুয়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে নদের চাঁদকে হত্যার যে পরিকল্পনা করল এবং যেভাবে হিংস্র ও অমানবিক হয়ে উঠেছিল তার যথার্থ প্রতীক হয়েছে এখানে রাক্ষস। এটি একটি পৌরাণিক প্রতীক।

পরী

আমরা জানি পরী উর্ধ্বলোকে বিচরণকারী রূপসী প্রাণীবিশেষ। সুন্দরী নারীর প্রতীক হিসাবে পরীর ব্যবহার পাওয়া যায় নিম্নের উদ্ধৃতিগুলোয় :

২৩৮.

আচানক পুরুষ এক সঙ্গে তার নারী।
জিনিয়া চান্দের ছটা যেন হুরপরী॥
['রূপবতী', মৈগী ১, ২ : ২৫৪]

'রূপবতী' গাথায় নায়ক মদনের সাথে অতি সুন্দরী নারী নায়িকা রূপবতীকে হুরপরীর সৌন্দর্যের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

২৩৯.

সাত ভাইয়ের বৈন ভেলুয়া পরম সোন্দরী।
দূরে থাকি লাগেরে যেন ইন্দ্রকুলের পরী॥
['ভেলুয়া', পূগী ৩, ২ : ৮৯]

২৪০.

সাত পুত্র সাত মানিক কন্যা যেন পরী।
মায়ের পরাণের পরাণ ভেলুয়া সোন্দরী॥
['ভেলুয়া', পূগী ৩, ২ : ৯০]

২৪১.

সদাইগরের বাড়ীঘর পশর করিয়া।
ভেলুয়া আছমানের পরী আইলরে উড়িয়া॥
['ভেলুয়া', পূগী ৩,২ : ৯৯]

২৪২.

অঘোরে ঘুমায় ঘোরে ভেলুয়া সোন্দরী।
পালঙ্কে রৈয়াছে যেন আছমানের পরী॥
['ভেলুয়া', পূগী ৩,২ : ১০৮]

'ভেলুয়া' গাথায় তেলন্যা নগরের ধনী সওদাগর মনুহরের একমাত্র কন্যা নায়িকা ভেলুয়ার রূপবর্ণনায় অতি সুন্দরী নারীর প্রতীক হিসাবে পূর্বোক্ত চারটি উদ্ধৃতিতেই একাধিকবার তাকে পরীর প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

রাম

রাক্ষসরাজ রাবণ বলপূর্বক রামের স্ত্রী সীতাকে লঙ্কায় হরণ করে নিলে রাম বিভীষণের পরামর্শে রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করে স্বীয় স্ত্রী সীতাকে উদ্ধার করল। তাই রামকে সীতা উদ্ধারের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে নিম্নের উদ্ধৃতিতেঃ

২৪৩.

সোয়ামী সহিত মলুয়া যায় বাপের বাড়ী।
ছীরাম উদ্ধার করে যেন আপনার নারী॥
['মলুয়া,' মৈগী ১,২:৯১]

'মলুয়া' গাথায় দেওয়ানের কাছে মলুয়া যখন বন্দি তখন তার পাঁচ ভাই এ সংবাদ পেয়ে ছুটে আসে মলুয়াকে উদ্ধারের জন্য। এখানের অস্পষ্ট কাহিনী থেকে অনুমান করা যায় মলুয়ার স্বামী বিনোদও এ উদ্ধার কার্যে যোগ দিয়েছিল। তাই এখানে বিনোদের স্ত্রী উদ্ধারের কাহিনীটিকে রামের সীতা উদ্ধারের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে। বিষয়টি পৌরাণিক হওয়ার কারণে প্রতীকটিও পৌরাণিক।

রাবণ

রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত লঙ্কাধিপতি ও রাক্ষসদের রাজা রাবণ; যিনি পর্বতের মতো লম্বা, শক্তিশালী, কৃষ্ণবর্ণ ও নিজ শক্তি বলে পর্বত চূড়াকে খণ্ডিত করতে ও সমুদ্রকে আলোড়ন করতে পারতেন। তাই রাবণকে শক্তির প্রতীক হিসাবে দেখানো হয়েছে নিম্নের উদাহরণে :

২৪৪.

কৃষ্ণবর্ণ দেহ তার পর্ব্বত প্রমাণ।
রাবণের মত হৈল অতি বলবান॥
['দস্যু কেনারামের পালা', মৈগী ১, ২ : ১৯৭]

'দস্যু কেনারামের পালা'য় কেনারাম ডাকাত দলের সাথে থেকে থেকে এক মস্তবড় ডাকাত হলো। ডাকাত হিসাবে তারই দেহের অসীম শক্তিকে পৌরাণিক চরিত্র রাবণের শক্তির প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে। এটি পৌরাণিক প্রতীক।

সরস্বতী

বিদ্যা বা কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী রূপে সুন্দর ও সুবুদ্ধির উদ্বোধনকারিনী যিনি মানুষের হৃদয়কে পবিত্র ও নির্মল করেন। তাই নিম্নের উদাহরণে তিনিও হয়েছেন প্রতীক :

২৪৫.

তার আগে এক কন্যা হৈল রূপবতী।
স্বর্গ ছাড়িয়া উপনীত যেমন সরস্বতী॥
['কমলা', পূগী ১, ২ : ১২৩]

'কমলা' গাথায় ধনী মানিক চাকলাদারের একমাত্র রূপসী কন্যা ও গাথার নায়িকা কমলাকে তার সুন্দর, পবিত্র ও নির্মল হৃদয়ের জন্য সরস্বতীর প্রতীকে দেখানো হয়েছে। সরস্বতী একটি পৌরানিক চরিত্র হওয়ায় আলোচ্য প্রতীকটি পৌরাণিক প্রতীকে রূপলাভ করেছে।

লক্ষ্মী

ধন-সম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী। সে সর্বসম্পদে সফলা, সকল শ্রী ও ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী এবং সুন্দর ও শোভার প্রতীক। তা-ই লক্ষ্য করা যায়:

২৪৬.

লক্ষ্মীর সমান রূপ সর্ব্বসুলক্ষণ।
পুনাই বলি কাঙ্গালীয়া ডাকে ঘনঘন॥
['রূপবতী', মৈগী ১, ২ : ২৫৪]

এখানে নায়িকা রূপবতীর রূপ বর্ণনায় তাকে লক্ষ্মীর প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে। এটিও একটি পৌরাণিক প্রতীক।

ইন্দ্র

দেবরাজ ইন্দ্র প্রধান দেবতা, তার শরীর প্রকাণ্ড ও শ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন। তিনি চির-যুবা। তারই প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নের উদ্ধৃতিটিতে :

২৪৭.

নয় বচ্ছর কালে তোরে দিব গৌরীদান।
কন্যা দান করি হইব ইন্দ্রেরই সমান॥
['কাঞ্চনমালা', পূগী ২, ২ : ৯০]

'কাঞ্চনমালা' গাথায় ভরাই নগরের সাধু সওদাগর বহু কষ্টে এক সন্ন্যাসীর কৃপায় কন্যা কাঞ্চনমালাকে লাভ করলেও সন্ন্যাসীর নির্দেশ মতো নয় বছর বয়সেই তার বিয়ে দিতে বাধ্য হলেন নিজের জীবন ও ব্যবসা রক্ষার্থে। পিতা ও মাতার মনোবাসনা ছিল যার সাথে কন্যার বিয়ে দিবেন তিনি ইন্দ্রের মতোই হবেন চির-যুবা ও শ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন। অর্থাৎ এখানে কন্যার ভাবী বর ইন্দ্রের প্রতীকে ভূষিত। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পিতা কাঙ্ক্ষিত বর না পেয়ে এক অন্ধর সাথে কন্যার বিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। ইন্দ্রতুল্য বর আর জুটল না। ইন্দ্রের প্রতীক ব্যবহার করায় এটি পৌরাণিক প্রতীকে রূপলাভ করেছে।

কার্ত্তিক

শিব দুর্গার পুত্র কার্ত্তিক খুব রূপবান। দেব সেনাপতি হওয়ায় সে সর্বদা যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকে। তাই মহা বিক্রমশালী ও রূপবান পুরুষের প্রতীক হিসাবে কার্ত্তিক-এর ব্যবহার পাওয়া যায় নিম্নের উদ্ধৃতিগুলোয় :

২৪৮.

সন্ধ্যাবেলা মইষাল বাথান হইতে আসে।
কার্ত্তিক দেখিল যেন দাঁড়াইয়া পাশে॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১৪৭]

'কমলা' গাথার নায়ক ও শিকারীরূপী প্রদীপকুমারের রূপ এখানে কার্ত্তিকের প্রতীকে প্রকাশিত।

২৪৯.

কার্ত্তিকের সমান রূপ তাহারে দেখিয়া।
পরাণে মজিলাম আমি দগ্ধ হইল হিয়া॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১৬১]

একই গাথায় পুনরায় প্রদীপকুমারের রূপ কার্ত্তিকের প্রতীকে প্রকাশিত।

২৫০.

দেখিতে সোনার নাগর গো চান্দের সমান।
সুবর্ণ কার্ত্তিক যেমন গো হাতে ধনুকবান॥
['দেওয়ান ভাবনা', মৈগী ১, ২ : ১৭৮]

'দেওয়ান ভাবনা' গাথায় নায়ক ও জমিদারপুত্র মাধবকেও মহা পরাক্রমশালী ও রূপবান পুরুষের প্রতীক হিসাবে কার্ত্তিক-এর প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। কার্ত্তিক একটি পৌরাণিক চরিত্র, তাই এর প্রতিটি প্রতীকই পৌরাণিক প্রতীক।

কল্পতরু

পৌরাণিক অভিধান-এ কল্পতরুকে বলা হয়েছে "অভীষ্টদায়ক বৃক্ষ" (সুধীর চন্দ্র সরকার ১৪০৬: ৯১)। অর্থাৎ যার নিকট কোনো কিছু প্রার্থনা করলে তাতে অভীষ্ট লাভ হয়। পৌরাণিক এ বৃক্ষও প্রতীক হিসাবে ব্যবহারে বাদ পড়েনি গীতিকায়:

২৫১

নির্ম্মলা শরীল তার মাজাখানি সরু।
শিনায় কদলী পুষ্প যেন কল্পতরু॥
['নেজাম ডাকাইতের পালা', পূগী ২, ২ : ৩৩৫]

'নেজাম ডাকাইতের পালা'য় পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসকারী জংলী সর্দারের অপরূপ সুন্দরী কন্যা লালবাইর রূপবর্ণনায় তার বক্ষের দুই স্তন যেন কলাফুলগাছে একই বৃন্তে ফোটা দুটি পুষ্প যাকে রচয়িতার কাছে অভীষ্ট লাভের প্রতীক হিসাবে কল্পতরু বলে মনে হয়েছে। পৌরাণিক প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকায় এটি একটি পৌরাণিক প্রতীকে রূপ লাভ করেছে।

সংস্কার আশ্রয়ী প্রতীক

অমঙ্গল, অকল্যাণ বা অশুভ লক্ষণের প্রতীক হিসাবে এমন কিছু প্রাণী আছে যাদের ডাক বা দর্শন কিংবা অন্য কোনো কিছুর শব্দ বা দৃশ্য তৎকালীনের মতো বর্তমানেও আমাদের গ্রাম্য সমাজে প্রচলিত। এদের মধ্যে রয়েছে কাক-চিলের ডাক, টিকটিকির ডাক, কোকিলের ডাক, তেলী ও গর্ভবতী শিয়ালী দর্শন, হাঁচির শব্দ, প্রেত-পিশাচ ইত্যাদি। এ ছাড়াও অপুত্রক, আটকুর বা নিঃসন্তান দম্পতি ও শৈশবে পিতৃমাতৃহীন শিশুকেও (খাকুরা) অমঙ্গলের প্রতীক হিসাবে বর্জন করে থাকে। গীতিকায় লক্ষ করা যায়:

২৫২.

যাইতে জলের ঘাটে নাহি চলে পাও।
শুকনা ডালেতে বস্যা কাগায় করে রাও॥
['দেওয়ান ভাবনা', মৈগী ১, ২ : ১৮৩]

'দেওয়ান ভাবনা' গাথায় নায়িকা সুনাই যখন জানতে পারল তার মামা তাকে দেওয়ান ভাবনার নিকট সমর্পণ করবে তখন নদীর ঘাটে জল আনতে যাওয়ার সময় কাকের কর্কশ কণ্ঠ তার কাছে অশুভ কোনো ভবিষ্যতের প্রতীক বলে অনুমিত হয়।

২৫৩.

জলের ঘাটে যাইতে মোরে করিছে বারণ।
হাঁচি টিকটিকি আর যত অলক্ষণ॥
['দেওয়ান ভাবনা', মৈগী ১, ২ : ১৮৩]

একই গাথায় একই অবস্থায় টিক্‌টিকির ডাকও তার কাছে অশুভ কোনো ভবিষ্যতের প্রতীক রূপে মনে হয়েছে।

২৫৪.

ফাল্গুন মাসে চল্যা যায়রে চৈত্র মাসে আসে।
সোনার কুইল কু ডাকে বইস্যা গাছে গাছে॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ১৪]

'মহুয়া' গাথায় নায়িকা মহুয়ার প্রতি তীব্র প্রণয়াবেগ বশত নায়ক নদের চাঁদ যেদিন শয্যা ত্যাগ করে মহুয়ামুখী হলো, সেদিন ছিল বসন্তের রাত। সে রাতের কোকিল-কণ্ঠে কু-ডাকের মাধ্যমে অশুভের ইঙ্গিত লক্ষণীয়। মহুয়া ও নদের চাঁদের প্রণয় পবিত্র হলেও তা সফল হওয়ার নয়। তাই এ অশুভের প্রতীক হিসাবে এখানে সোনার কোকিলের কণ্ঠ থেকে কুডাক উচ্চারিত হয়েছে।

২৫৫.

মাথায় উপরে ডাকে কাউয়া চিল রইয়া।
নানা অলক্ষণ দেখে পন্থে মেলা দিয়া॥
['দেওয়ানা মদিনা', মৈগী ১, ২ : ৩৮৩]

'দেওয়ানা মদিনা' গাথায় নায়ক দুলাল দেওয়ান হয়ে নিজ স্ত্রী নায়িকা মদিনাকে প্রত্যাখান করায় এবং নিজপুত্রকে অবহেলা করায় দুলালের অপরাধী মনে অশুভ ও অমঙ্গলের প্রতীক রূপে কাক-চিলের ডাক শুনতে পায়।

২৫৬.

তার পরে মেলা দিয়া সাম্‌নে দেখে তেলী।
ডাইনেতে দেখিল এক গাভীন শিয়ালী॥
['দেওয়ানা মদিনা', মৈগী ১, ২ : ৩৮৩]

একই গাথায় দুলালের অপরাধী মানসিকতায় অমঙ্গলের প্রতীকরূপে সামনে দেখতে পায় তেলী ও গর্ভবতী শিয়ালী।

২৫৭.

কাক সাচান করে দিবসেতে রা।
ডাক শুনি মুণির কাঁপিল সর্ব্ব গা॥
পথ কাটি শিবা ধায় না চায় ফিরিয়া।
ঝটিতে চলিল মুনি আশ্রমে ধাইয়া॥
['কঙ্ক ও লীলা', মৈগী ১, ২ : ২৯০]

'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় গর্গের মনে নিজ পালিত কন্যা লীলা ও তার প্রণয়ী কঙ্ককে হত্যার পরিকল্পনায় মনের শঙ্কাভাব থেকে অকল্যাণের প্রতীকরূপে কাক-চিলের ডাক শুনতে পায়।

২৫৮.

আসিতে পথের মাঝে অমঙ্গল নানা।
চারিদিকে যেন প্রেত-পিশাচের থানা॥
['কঙ্ক ও লীলা', মৈগী ১, ২ : ২৯০]

একই গাথায় শঙ্কিত মনে গর্গ প্রকৃতিতে প্রেত-পিশাচকে অকল্যাণের প্রতীক কল্পনা করে।

২৫৯.

যাইবার কালে হাঁচির শব্দে বাধা যে পড়িল।
কতক্ষণ দুলাল মিঞা বারযে চাহিল॥
['দেওয়ানা মদিনা', মৈগী ১, ২ : ৩৮৩]

'দেওয়ানা মদিনা' গাথায় নিজ স্ত্রী পুত্রকে অবহেলা করায় দুলালের অপরাধী মনে হাঁচি হয়েছে অকল্যাণের প্রতীক। যাত্রার সময় হাঁচি হলে যাত্রায় বাধা পড়ে বলে সংস্কার প্রচলিত আছে। সে অনুযায়ী কিছু সময় অপেক্ষা করে তবে যাত্রা করতে হয়, তা না হলে অশুভ কিছু ঘটতে পারে, যা ধরা পড়েছে এ উদ্ধৃতিতে। একই প্রতীক লক্ষ করা যায় পূর্বোক্ত দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে। সেখানেও সুনাইর অশুভ ভবিষ্যতের প্রতীকরূপে হাঁচির উল্লেখ রয়েছে।

২৬০.

তিনকাল গেলরে তার অপুত্রক হৈয়া।
মুখ নাহি দেখে লোকে আটখুর বলিয়া॥
['দস্যু কেনারামের পালা', মৈগী ১, ২ : ১৯২]

'দস্যু কেনারামের পালা'য় জালিয়ার হাওড়পাড়ে বাকুলিয়া গ্রামের দ্বিজ খেলারাম ও তার স্ত্রী যশোধারা দম্পতি নিঃসন্তান হওয়ায় গ্রামীণ সমাজে অমঙ্গলের প্রতীকরূপে অপুত্রক বা আটকুর বলে ঘৃণিত। নিঃসন্তান হওয়ায় পারিবারিক বা ব্যক্তিগত যন্ত্রণার চেয়ে সামাজিক যন্ত্রণাই যে প্রবল তার প্রমাণ এখানে স্পষ্ট। বিপরীতভাবে শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হলে তার প্রতিও সমাজের চরম অবহেলা লক্ষ্য করা যায় নিম্নের উদ্ধৃতিটিতে :

২৬১.

খাঁকুরা বলিয়া কেউ নাহি লয় কোলে।
সংসারেতে কেউ নাহি শিশুরে যে পালে॥
['কঙ্ক ও লীলা', মৈগী ১, ২ : ২৬৭]

'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় কঙ্কের ছয়মাস বয়সকালে পিতা-মাতার মৃত্যু হলে তাকে অমঙ্গলের প্রতীকরূপে খাঁকুরা অর্থাৎ যে মানুষ খায় বলে সবাই তাকে অবহেলা করে তার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

অমঙ্গলের প্রতীক হিসাবে উপরে যে সব উপাদান আলোচিত হয়েছে তা এখনো আমাদের গ্রামীণ সমাজে ঐতিহ্যগত সংস্কার হিসাবে বিদ্যমান। রচয়িতারা ভবিষ্যৎ অমঙ্গলকে ঈঙ্গিতময় করেছেন এসব প্রতীকের মধ্য দিয়ে।

বিবিধ বিষয়ক প্রতীক

আগুন

আগুন সর্বদাই সর্বনাশ ও ক্রোধের প্রতীক। তাই গীতিকায় রাগ, ক্ষোভ বা ক্রোধ প্রকাশ করতে প্রতীক হিসাবে আগুনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আগুন সবকিছুকে পোড়ায়। তাই ব্যক্তির হৃদয়ের অন্তর্যন্ত্রণা বোঝাতেও কোথাও কোথাও প্রতীক হয়েছে আগুন। আগুন তার উজ্জ্বলতার গুণে দূর থেকে দৃশ্যমান এবং উত্তাপের কারণে কখনোই তাকে স্পর্শ করা যায় না। এ কারণে দেহের রূপ বর্ণনায় উজ্জ্বলতার প্রকাশে ও

অধরার প্রতীক হিসাবেও আগুন ব্যবহৃত হয়েছে কোথাও। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলোয় ক্রোধের প্রতীক হিসাবে আগুন ব্যবহৃত হয়েছে :

২৬২.

চমকিয়া উঠিল কন্যা বাপের ডাক শুনি।
চোখ্ চাইয়া দেখে কন্যা জ্বলন্ত আগুনি॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ২৩]

'মহুয়া' গাথায় যখন হুমরা বেদে চরম ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে মহুয়ার হাতে ছুরি দিয়ে নায়ক নদের চাঁদকে হত্যা করতে বলে তখন সে হুমরার চেহারায় ক্রোধের যে চিহ্ন দেখল তা-ই আগুনের প্রতীকে প্রকাশিত হয়েছে।

২৬৩.

আক্ষিতে জালিছে তার জ্বলন্ত আগুনি।
নাকের নিশ্বাস তার দেওয়ার ডাক শুনি॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ৩৯]

একই গাথার শেষে যখন মহুয়া ও নদের চাঁদের মিলন হলো তখন এই মিলনদৃশ্য দেখে পুনরায় পিতা হুমরার পূর্ববর্তী ক্রোধের প্রকাশ ঘটেছে আগুনের প্রতীকে।

২৬৪.

নজর কইরা চায়।
অগ্নির সমান কন্যা সামনে দেখা যায়॥
['কাঞ্চনমালা', পূগী ২, ২ : ১১১]

'কাঞ্চনমালা' গাথায় স্বামী কর্তৃক কাঞ্চনমালাকে বনবাস দান ও সতীন কুঞ্জমালার নানা অত্যাচারে তার ক্রোধের প্রতীক হয়েছে আগুন।

২৬৫.

এই কথা উজীর জানায় দেওয়ান ফিরোজেরে।
আগুন জ্বলিল যেমন সমুদ্দুর ভিতরে॥
['ফিরোজ খাঁ দেওয়ান', পূগী ২, ২ : ৪৬৩]

'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' পালায় নায়ক ফিরোজ খাঁ চারিত্রিক দিক থেকে সমুদ্রের মতো শান্ত হওয়া সত্ত্বেও নায়িকা সখিনাকে বিয়ে করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে সখিনার পিতা কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যাত হয়। ফলে প্রবল বংশ মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ন হওয়ায় তার ক্রোধের প্রকাশ ঘটেছে আগুনের প্রতীকে।

২৬৬.

এই কথা রঙ্গমালায় যখনে শুনিল।
অগ্নির হুলুকা যেন গর্জ্জিয়া উঠিল॥
['চৌধুরীর লড়াই', পূগী ৩, ২ : ৩৪০]

'চৌধুরীর লড়াই' গাথায় কুটনী শ্যামপ্রিয়ার দ্বিতীয়বার নায়িকা রঙ্গমালার গৃহে আগমনের খবর শুনে রঙ্গমালার ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে আগুনের প্রতীকে।

২৬৭.

এই কথা ইঙ্গা চৌধ্রী যখনে শুনিল।
অগ্নির হুলুকা যেন গৰ্জ্জিয়া উঠিল॥
['চৌধুরীর লড়াই', পূগী ৩, ২ : ৪১৯]

একই গাথায় ইঙ্গা চৌধুরী ভেলুচন্দ্রের মুখে চান্দার কর্মকাণ্ডের কথা অবগত হলে তার প্রতি ইঙ্গা চৌধুরীর ক্রোধ আগুনের প্রতীকে প্রকাশিত হয়েছে।

নিম্নের উদ্ধৃতি দুটোয় ব্যক্তি হৃদয়ের অন্তর্যন্ত্রণা প্রকাশেরও প্রতীক হয়েছে আগুন :

২৬৮.

এই দেখ্যা ডিঙ্গাধরের কলিজা যে ফাটে।
বারুদের আগুন যেমন জিক্‌কাইর মার‍্যা উঠে॥
['মইষাল বন্ধু', পূগী ২, ২ : ৪৮]

'মইষাল বন্ধু' গাথায় সামন্ত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় প্রথমে ভাগ্য বিড়ম্বিত ও পরে ভাগ্যবান ডিঙ্গাধর অনেকদিনের বিচ্ছেদের পরও বলরামের কন্যা সাজুতীকে ভুলতে পারেনি। একদিন ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে সে বলরামের বাড়ী গিয়ে জানতে পারে বলরামের মৃত্যু হয়েছে এবং তার একমাত্র কন্যা সাজুতী ও তার মা সীমাহীন দারিদ্র্যে জীবন কাটাচ্ছে। তাদের বাড়ীঘর, পোশাক-পরিচ্ছদের জীর্ণতায় ডিঙ্গাধরের অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যেতে বসে যা ধরা পড়েছে আগুনের প্রতীকে।

২৬৯.

খুড়া কই চান্দা কই মুখেতে ফুকারে।
অগ্নির হুলুকা যেন জ্বলয়ে অন্তরে॥
['চৌধুরীর লড়াই', পূগী ৩, ২ : ৪১২]

'চৌধুরীর লড়াই' পালায় রাজচন্দ্রের ব্যক্তি হৃদয়ের অন্তর্যন্ত্রণাও প্রকাশিত হয়েছে আগুনের প্রতীকে।

রূপ বর্ণনায় দেহ উজ্জ্বলতা এবং অধরার প্রতীক হিসাবে আগুনের ব্যবহার নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলোয় পাওয়া যায় :

২৭০.

কাঞ্চনমালা নজর কইরা চায়।
অগ্নির সমান রূপ সামনে দেখা যায়॥
['কাঞ্চনমালা', পূগী ২, ২ : ১১২]

'কাঞ্চনমালা' গাথায় কাঞ্চনমালার অন্ধ স্বামী ফুলকুমারের রূপ বর্ণনায় উজ্জ্বলতার প্রতীক হিসাবে আগুন ব্যবহার করা হয়েছে।

২৭১.

রূপেতে রূপসী কন্যা অগ্নি যেমন জ্বলে।
রূপের তুলনা তার সংসারে না মিলে॥
['ভেলুয়া', পূগী ২, ২ : ১৪৪]

'ভেলুয়া' গাথায় নায়িকা ভেলুয়ার অখণ্ড দেহরূপের বর্ণনায় উজ্জ্বলতার প্রতীক স্বরূপ আগুন ব্যবহার করা হয়েছে।

২৭২.

আগুনির লোক্কা যেমন দেখিতে কইনারে।
শিরেতে দীঘল কেশ কমর বাইয়া পড়ে॥
['দেওয়ান ইশা খাঁ মসনদালি', পূগী ২, ২ : ৩৫৩]

'দেওয়ান ইশা খাঁ মসনদালি' পালায় বর্ণিত গৌড়ের নবাব জোলাল উদ্দীনের সুন্দরী কন্যা মমিনা খাতুনের বিবাহপূর্ব রূপ বর্ণনায় উজ্জ্বলতার প্রতীক হিসাবে আগুন ব্যবহার করা হয়েছে।

আগুন যেমন স্পর্শ করা যায় না, ভেলুয়া এবং মমিনা খাতুনকেও অত্যন্ত রূপের কারণে সবার পক্ষে স্পর্শ করা কঠিন। তাই তারা অধরার প্রতীক অগ্নিস্বরূপ।

পাগল

উন্মাদ, অস্থির বা মত্ত প্রভৃতি মানসিকতার প্রকাশে আমরা পাগল শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। তাই গীতিকায় তীব্র প্রণয়াবেগ, কোনো কিছুর প্রতি প্রবল আগ্রহ, রূপলালসা, অধ্যাত্ম-আবেগ, বিচ্ছেদ-যন্ত্রণায় কাতরতা, ক্রোধোন্মত্ততা ও উন্মত্তভাব প্রকাশের জন্য পাগল শব্দটি প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নের উদ্ধৃতিগুলোয় 'পাগল' হয়েছে প্রণয়াবেগ প্রকাশের প্রতীক :

২৭৩.

কোথায় আছে জইতার পাহাড় কোথায় গহীন বন।
পাগল হইয়া নদীয়ার চাঁন ভরমে তিরভুবন॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ১৯]

'মহুয়া' গাথায় নায়ক নদের চাঁদকে পালিয়ে যাওয়া নায়িকা মহুয়ার প্রতি তীব্র প্রণয়াবেগ বশত পাগলের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

২৭৪.

শান্তিতে আছয়ে কন্যা একনিষ্ঠ হইয়া।
আসিল পাগল জয়া শিকল ছিড়িয়া॥
['চন্দ্রাবতী', মৈগী ১, ২ : ১১৭]

'চন্দ্রাবতী' গাথায় নায়ক জয়ানন্দকে চন্দ্রাবতীর প্রতি প্রণয়াবেগ বশত পাগলের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

২৭৫.

বাগ-বাগীচা ফুলের শোভা চক্ষে নাহি লাগে।
পাগল হইয়াছি কন্যা তোমার অনুরাগে॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১৫০]

'কমলা' গাথায় নায়ক প্রদীপ কুমারকেও কমলার প্রতি তীব্র প্রণয়াবেগ বশত পাগলের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

২৭৬.

প্রভাতে উঠিয়া লীলা কঙ্কের উদ্দেশে।
আলুই মাথার কেশ পাগলিনী বেশে॥
['কঙ্ক ও লীলা', মৈগী ১, ২ : ২৮৯]

'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় নায়ক কঙ্ককে হারিয়ে নায়িকা লীলাও প্রণয়াবেগে পাগলিনী।

২৭৭.

আমি না পাগল কন্যা যোয়াইয়ের চিলা।
এইখানে থাকিয়া কন্যা শুন আমার কথা॥
['ধোপার পাট', পূগী ২, ২ : ৪]

'ধোপার পাট' গাথায় নায়িকা কাঞ্চনমালাকে দেখে নায়ক রাজপুত্র প্রণয়াবেগ বশত পাগল।

২৭৮.

আষাইঢ়া নদীরে যেমন পাগল হইয়া যায়।
মনেরে বোঝাইয়া বন্ধু রাখা নাহি যায়॥
['ধোপার পাট', পূগী ২, ২ : ৬]

একই গাথায় কাঞ্চনমালা ও নায়ক রাজপুত্রের প্রতি প্রণয়াবেগ বশত পাগল।

নিম্নের উদ্ধৃতিদুটোয় প্রবল আগ্রহের প্রতীকস্বরূপ পাগল ব্যবহৃত হয়েছে :

২৭৯.

সাপে যেমন পাইল মণি পিয়াসী পাইল জল।
পদ্মফুলের মধু খাইতে ভমরা পাগল॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ২১]

'মহুয়া' গাথায় দীর্ঘদিন পর মহুয়া ও নদের চাঁদের মিলনে নদের চাঁদ প্রণয়ীর আলিঙ্গন-লাভার্থে প্রবল আগ্রহবশত পাগলের প্রতীকে প্রকাশিত।

২৮০.

আনাগুনা কইরা কাজী হইল বাওরা।
রাখিতে না পারে মন করে পংক্ষী উড়া॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৭২]

'মলুয়া' গাথায় নায়িকা মলুয়ার রূপ দেখে তার প্রতি প্রণয় নিবেদনে প্রবল আগ্রহী হয়ে কুচরিত্র কাজীর মানসিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে পাগলের প্রতীকে।

নিম্নের তিনটি উদাহরণে রূপ-লালসার প্রতীক হিসাবে পাগলের ব্যবহার লক্ষণীয় :

২৮১.

দেখিয়া কন্যার রূপ সাধু পাগল হইল।
মাঝি মাল্লায় ডাক দিয়া সাধু সল্লা যে করিল॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ২৭]

'মহুয়া' গাথায় সাধুর নৌকায় নদের চাঁদের সাথে মহুয়াকে দেখে সাধু তার রূপ-লালসায় পড়লে তা পাগলের প্রতীকে প্রকাশিত হয়েছে।

২৮২.

কিবা মুখ কিবা সুখ ভুরুর ভঙ্গিমা।
আন্ধাইর ঘরেতে যেমন জ্বলে কাঞ্চা সোনা॥
এইরূপ দেখিয়া বিনোদ হইল পাগল।
চান্দের সমান রূপ করে ঝলমল॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৬৯]

'মলুয়া' গাথায় নায়ক চান্দ বিনোদ নায়িকা মলুয়ার রূপ দেখে লালসায় পরলে তাকে পাগলের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

২৮৩.

দেখিয়া তোমার রূপ হইয়াছি পাগল।
দিবানিশি দেখি কন্যা তোমার চক্ষের জল॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১৫০]

'কমলা' গাথায় নায়ক প্রদীপকুমার নায়িকা কমলার রূপ-লালসায় পড়লে তা পাগলের প্রতীকে প্রকাশিত হয়েছে।

নিম্নের উদ্ধৃতিটিতে 'দস্যু কেনারামের পালা'য় কেনারামকে অধ্যাত্ম আবেগের প্রতীক স্বরূপ পাগলের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে :

২৮৪.

গাইতে গাইতে কেনার চক্ষে আসে জল।
নাইচা গাইয়া ফিরে যেমন ভাবের পাগল॥
['দস্যু কেনারামের পালা', মৈগী ১, ২ : ২৩৬]

নিম্নের উদাহরণ দুটোয় বিচ্ছেদ-যন্ত্রণার প্রতীক হিসাবে পাগল ব্যবহৃত হয়েছে :

২৮৫.

ভার্য্যার লাগিয়া বিপ্র পাগল হইয়া ফিরে।
কেবা রাখে শিশু পুত্রে কেবা ভিক্ষা করে॥
['কঙ্ক ও লীলা', মৈগী ১, ২ : ২৬৭]

'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় স্ত্রীর মৃত্যুতে গুনরাজকে বিচ্ছেদ-যন্ত্রণার প্রতীক হিসাবে পাগল বলা হয়েছে।

২৮৬.

তারপরে না চিন্তায় শেষে হইল পাগল।
যাইনা মুখে লয় তাই সে বকয়ে কেবল॥
['দেওয়ানা মদিনা', মৈগী ১, ২ : ৩৮১]

'দেওয়ানা মদিনা' গাথায় নায়ক দুলালের বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় নায়িকা মদিনাকে পাগলের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় গর্গ ভ্রান্তবিশ্বাস বশত নিজ কন্যা লীলা ও পালিত পুত্র কঙ্কের উপর জাতিনাশ ও চারিত্রিক অনাচারের কারণে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত। তাই নিম্নের উদ্ধৃতিটিতে গর্গের এ ক্রোধোন্মত্ততার কারণে তাকে পাগলের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে :

২৮৭.

লজ্জা আর ক্রোধে গর্গ পাগল হইয়া।
এখানে সেখানে যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া॥
['কঙ্ক ও লীলা', মৈগী ১, ২ : ২৮১]

নিম্নের উদ্ধৃতি দুটোয় উন্মত্ততার প্রতীক হিসাবে পাগলের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় :

২৮৮.

বেশের নাহি আদর-যতন কেশের বন্ধনী।
কোথা হইতে আইল পাগল জোয়ারের পানি॥
['কঙ্ক ও লীলা', মৈগী ১, ২ : ২৭২]

'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় নায়িকা লীলার যৌবন যেভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল তাতে তার যৌবনের উন্মত্ততাকে পাগলের প্রতীকে প্রকাশ করাই যুক্তিসঙ্গত হয়েছে।

২৮৯.

রাত্র যায় দিনরে আসে বাম হইয়াছে বিধি।
পাগল হইয়া ছুটে কন্যা যেমন শাঙন মাইসা নদী॥
['কাঞ্চনমালা', পূগী ২, ২ : ১১০]

'কাঞ্চনমালা' গাথায় স্বামী ফুলকুমার কর্তৃক নায়িকা কাঞ্চনমালাকে মিথ্যা দোষে দোষী করে বনবাস দিলে সে গভীর বনে যেভাবে উন্মত্ত হয়ে ওঠে তা-ই প্রকাশ পেয়েছে পাগলের প্রতীকে।

কাল

গীতিকায় কাল ব্যবহৃত হয়েছে সর্বনাশ বা অমঙ্গলের, ভয়ঙ্কর বা বিষাক্তের, সময় বা জীবনপর্ব প্রকাশের আবার অসময় প্রকাশের প্রতীক অথবা গাঢ় অন্ধকার প্রকাশের প্রতীক কিংবা প্রিয়-বিচ্ছেদরূপ যন্ত্রণা প্রকাশের প্রতীক হিসাবে। নিম্নের উদ্ধৃতিটিতে কাল-এর প্রয়োগ ঘটেছে অমঙ্গলসূচক প্রকাশের প্রতীক হিসাবে :

২৯০.

পড়িতে পড়িতে কন্যার চক্ষে বহে পানি।
সম্মুখে যে আইল তার কি কাল রজনী॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১৪৫]

'কমলা' গাথায় কমলার চরিত্রের উপর কলঙ্ক রটিয়ে তার মামা পত্র লিখল যাতে তার মামী আশ্রিতা কমলাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়। কমলা এ পত্র পাঠ করে এবং ঘরছাড়া হবার আশঙ্কায় সম্মুখে আগত রাত্রিকে তার কাছে সর্বনাশা ও অনিশ্চয়তার রাত্রি মনে হয়। তাই অমঙ্গলের প্রতীক হিসাবে তাকে কালরাত্রি বলা হয়েছে।

নিম্নের উদাহরণ দুটোয় ভয়ঙ্কর বা বিষাক্তের প্রতীক হিসাবে কাল-এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় :

২৯১.

ছোবায় ছিল কালসাপ কোন কাম করিল।
কানি আঙ্গুলের মাঝে ছোপ যে মারিল॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৯৪]

২৯২.

সাক্ষী হইও চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী হইও তুমি।
বিনা দোষে কালনাগে দংশিল মোর পরাণী॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৯৪]

'মলুয়া' গাথায় বিনোদ শিকারে গিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে যে বিষাক্ত সাপের ছোবলের মুখে পড়ল তাকে ভয়ঙ্কর ও বিষাক্তের প্রতীকস্বরূপ কালসাপ রূপে প্রকাশ করা হয়েছে পূর্বোক্ত দুটি উদ্ধৃতিতেই।

নিম্নের উদ্ধৃতিগুলোয় সময় বা জীবনপর্ব এবং একই সাথে অসময় প্রকাশের প্রতীকরূপে কাল ব্যবহৃত হয়েছে :

২৯৩.

শুন শুন পূর্ব্বকথাগো দুঃখের বিবরণ।
দশ বচ্ছর কালেগো বাপের অকাল মরণ॥
['দেওয়ান ভাবনা', মৈগী ১,২:১৭৩]

'দেওয়ান ভাবনা' গাথার নায়িকা সুনাইর জীবনের দশ বছরের সময় তার পিতার মৃত্যুর বর্ণনায় কাল - এসেছে সময় বা জীবনপর্ব প্রকাশের প্রতীক হিসাবে।

২৯৪.

তিনকাল গেলরে তার অপুত্রক হৈয়া।
মুখ নাহি দেখে লোকে আটখুর বলিয়া॥
['দস্যু কেনারামের পালা', মৈগী ১,২:১৯২]

'দস্যু কেনারামের পালা'য় দ্বিজ খেলারামের অপুত্রক জীবনের তিনপর্ব প্রকাশের প্রতীক হয়েছে কাল। কোথাও আকাল ব্যবহৃত হয়েছে কাল-এর বিপরীত অর্থে অর্থাৎ অসময় বুঝাতে:

২৯৫.

এমত সময়ে পরে শুন সভাজন।
আকাল হইলো গো অনাবৃষ্টির কারণ॥
['দস্যু কেনারামের পালা', মৈগী ১,২:১৯৫]

দস্যু কেনারামের পালায় কেনারামের তিন বছর বয়সে অনাবৃষ্টির জন্য যে অসময়ের সৃষ্টি হলো তা-ই বলা হয়েছে আকালের প্রতীকে।

২৯৬.

আসমান কালা জমীনরে কালা কাল নিশা যামিনী।
বিষের কটরা খুলে কন্যা জনম দুঃখিনী॥
['দেওয়ান ভাবনা', মৈগী ১,২:১৯০]

'দেওয়ান ভাবনা' গাথার নায়িকা সুনাই স্বামীর জীবন রক্ষার জন্য কুচরিত্র দেওয়ানের নিকট আত্মসমর্পণের পরিবর্তে আত্মবিসর্জনকে গুরুত্ব দেওয়ায় তার জীবনের সব সোনালী স্বপ্নের আলো যেভাবে গাঢ় গভীর অন্ধকারে আবৃত হয়েছে তা প্রকাশিত হয়েছে কাল নিশার প্রতীকে।

২৯৭.

তিন দোষে দোষী বইন সেও ছিল ভালা
রাড়ী হইয়া সইব কেমনে কালবিষের জ্বালা॥
['মলুয়া', মৈগী ১,২:৯৫]

'মলুয়া' গাথার শেষে চান্দ বিনোদ সর্পাঘাতে মুমূর্ষু অবস্থায় থাকাকালে মলুয়ার পাঁচ ভাই তার মৃত্যুর আশঙ্কায় প্রিয় বিচ্ছেদ-রূপ যন্ত্রণাকে প্রতীক হিসাবে কালবিষের প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

নিশা যামিনী

এ দুটি শব্দই অন্ধাকারাচ্ছন্ন রাত্রির প্রতীক। এ শব্দ দুটির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অন্ধকারময়তার গাঢ়ত্বকে দ্বিগুণ করে উপস্থাপন করা হয়েছে নিম্নের উদাহরণটিতেঃ

২৯৮.

আসমান কালা জমীনরে কালা কাল নিশা যামিনী।
বিষের কটরা খুলে কন্যা জনম দুঃখিনী॥
['দেওয়ান ভাবনা', মৈগী ১,২:১৯০]

'দেওয়ান ভাবনা' গাথার শেষে নায়িকা সোনাই স্বামী মাধবের জীবনরক্ষার জন্য লম্পট দেওয়ানের নিকট আত্মসমর্পণের পরিবর্তে আত্মবিসর্জনকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। আত্মবিসর্জনকালে আকাশ, মাটি ও রাত্রির গভীরতর অন্ধকারময় চিত্রে সোনাইর অসফল জীবনের করুণ পরিণতি বর্ণিত হয়েছে নিশা যামিনীর প্রতীকে।

নগর-বন্দর

লোকালয়, জনকোলাহল ও সমৃদ্ধিময় পরিবেশের প্রতীক হিসাবে নগরের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় নিম্নের উদ্ধৃতিতে :

২৯৯.

চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘাটে বাঁধা রাখে সদাগর।
জলের উপুরে যেমন ভাসিছে নওগর॥
['মলয়ার বারমাসী', পূগী ৪,২:৪০৬]

'মলয়ার বারমাসী' গাথায় নবরঙ্গপুরের বিত্তবান ও ধনী সওদাগর নিতি মাধবের প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার অংশ স্বরূপ যে বর্ণনাটুকু এসেছে তা-ই নগরের প্রতীকে প্রকাশিত হয়েছে। সওদাগর নিতি মাধবের নৌঘাটিতে মাঝিমাল্লাসহ চৌদ্দটি ডিঙ্গা সর্বদা যেভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে তাতে মনে হয় যেন পানির উপর নগর-বন্দর গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ এখানে জনকোলাহলপূর্ণ নৌকাগুলোর একত্রাবস্থানকে নগর-বন্দরের প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

শ্মশান

শবদাহ করার স্থান এবং জনশূন্যতার প্রতীক হিসাবে শ্মশানের ব্যবহার পাওয়া যায় নিম্নের উদাহরণে :

৩০০.

আন্ধাইরে ঢাকি রইছে চাঁদের বাগান।
আমার আশ্রম আজি হইয়াছে শ্মশান।।
['কঙ্ক ও লীলা', মৈগী ১,২:২৯৪]

'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় গর্গের গৃহে তার পালিত পুত্র কঙ্কের অনুপস্থিতি শ্মশানের প্রতীকে প্রকাশিত। কঙ্ক দীর্ঘদিন গর্গের আলয়ে থেকে হঠাৎ একদিন স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ঘর ছাড়ল। তার অনুপস্থিতি কঙ্কের কাছে শ্মশানের মতো জনশূন্য ও ভীতিকর মনে হলো।

পানসী/নৌকা

দেহযোগশাস্ত্রে পানসী বা নৌকা নারীদেহের প্রতীক। তাই গীতিকায় যৌবনবতী নায়িকার দেহ বর্ণনায় এমনি পানসী প্রতীক হিসাবে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে:

৩০১.

এমন সোনার পান্সী তাতে মাঝি নাই।
যৌবন চলিয়া গেলে কেউ না দিব ঠাঁই॥
['মহুয়া', মৈগী ১,২:২৮]

'মহুয়া' গাথায় সাধু সওদাগর বাণিজ্যতরী থেকে মহুয়ার ভরা যৌবনের অধিকারী দেহকে পানসীর প্রতীকে প্রকাশ করে নিজে তার মাঝি হতে চেয়েছে।

৩০২.

আষাঢ়মাসে দীঘলা পান্সীরে নয়া জলে ভাসে।
সেহি মত সোনাইর যৈবন খেলায় বাতাসে॥
['দেওয়ান ভাবনা', মৈগী ১,২:১৭৬]

'দেওয়ান ভাবনা' গাথায় নায়িকা সোনাইর দীর্ঘাঙ্গী দেহের প্রতীক দীঘলা পানসী।

৩০৩.

খরদর ঢেউয়ের নদীরে তাতে যৈববতরী।
এমন কালে ছাইরা গেলে কে অইব কান্ডারী
বন্ধু যাইওনা রে॥
['আয়না বিবি', পূগী ৩,২:২০৭]

'আয়না বিবি' গাথায় নায়িকা আয়না বিবি নিজেই তার ভরা যৌবনে নায়কের কাছে নিজের দেহকে তরী বা নৌকার প্রতীকে প্রকাশ করে তাকে মাঝি হতে আহ্বান করেছে।

প্রাণ

প্রাণিমাত্রই প্রাণের অধিকারী। এই প্রাণ দেহের জন্য সর্বাধিক মূল্যবাস বলে তা সবার কাছে প্রিয়। আর এ কারণে গীতিকায় প্রাণ ব্যবহৃত হয়েছে কখনো প্রিয়তম ব্যক্তির প্রতীক হিসাবে, আবার কখনো হৃদয়রূপ প্রিয় ও মূল্যবান বস্তুর প্রতীক হিসাবে:

৩০৪.

প্রাণের পতি সে আমার প্রাণের দেবতা।
সবাই কহিব আমি মোর প্রাণদাতা॥
['কমলা', মৈগী ১,২ : ১৫৪]

'কমলা' গাথায় নায়িকা কমলা তার স্বামী প্রদীপকুমারকে প্রিয়তম ব্যক্তির প্রতীক হিসাবে প্রাণের প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

৩০৫.

এ সবার বেশী তুমি পরাণের পরাণ।
কোনখানে লুকাইয়া রাখি এই পুন্নুর চরণ॥
['মুকুটরায়', পূগী ৪, ২ : ১৪২]

'মুকুট রায়' গাথায় ব্যাধকন্যা বনে আগত মুকুটরায়কে প্রিয়তম ব্যক্তির প্রতীক হিসাবে প্রাণের প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

৩০৬.

এক কন্যা আছে মোর পরাণের পরাণ।
তাহারে শিখাইবা তুমি তোমার ঐনা বাঁশীর গান॥
['আন্ধাবন্ধু', পূগী ৪,২ : ১৯০]

"আন্ধাবন্ধু" গাথায় রাজা আন্ধাবন্ধুর নিকট নিজ প্রিয় কন্যাকেও প্রিয়তম ব্যক্তির প্রতীক হিসাবে প্রাণের প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

৩০৭.

যে নাকি পরাণ দিয়া কিন্যাছিল মোরে।
ফাকি দিয়া কোন পরাণে আইলাম ছাইড়ে তারে॥
['দেওয়ানা মদিনা', মৈগী ১,২ : ৩৮২]

'দেওয়ানা মদিনা' গাথায় নায়ক দুলাল তার তালাক দেওয়া স্ত্রী মদিনার পূর্বকথা স্মরণ করে অনুশোচনা করছিল, যে মদিনা তাকে হৃদয়রূপ প্রিয় ও মূল্যবান বস্তু প্রাণের বিনিময়ে তাকে রক্ষা করেছিল তাকে সে কিভাবে ছেড়ে আসল। অর্থাৎ এখানে মদিনার নিকট দুলাল যে প্রাণের প্রতীক তা সে নিজেই উপলব্ধি করে অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছিল।

নয়নতারা

চোখের অতি প্রয়োজনীয় অংশটি হচ্ছে চোখের মণি বা কালো অংশটি যাকে আমরা নয়নতারা বলি। তাই নয়নতারা অতি প্রয়োজনীয় বা অতি প্রিয় বস্তুর প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নের উদ্ধৃতিগুলোয় :

৩০৮.

মায়ের নয়নতারা নয়নের মণি।
ফুল ছিটকীর পরি নাহি সাইছে পরানী॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৯৭]

'মলুয়া' গাথায় শিশুকালে নায়িকা মলুয়া মায়ের কাছে অতি প্রিয় ছিল বলে তাকে নয়নতারার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

৩০৯.

দোইড়া আইস্যা চান্দ বিনোদ নদীর পাড়ে খাড়া।
এমন কইরা জলে ডুবে আমার নয়নতারা॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৯৮]

একই গাথার শেষে যখন মলুয়া আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে ভাঙ্গা নৌকায় চেপে নদীর মাঝে গেল তখন স্বামী চান্দ বিনোদ নদীর পাড়ে এসে তার স্ত্রী মলুয়াকে অতি প্রিয় হিসাবে নয়নতারার প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

৩১০.

তুমি আমার চন্দ্রসূর্য্য তুমি নয়নতার।
তুমি আমার মণিমুক্তা তুমি গলার হার॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১৫০]

'কমলা' গাথায় নায়ক প্রদীপকুমার নায়িকা কমলাকেও প্রিয় ব্যক্তি হিসাবে নয়নতারার প্রতীকে প্রকাশ করেছে।

ক্ষীর

কার্তিক মাসে নতুন ধান উঠলে নবান্ন ও গুড় দিয়ে কৃষকেরা এক রকম মিষ্টি ক্ষীর প্রস্তুত করে। তাই নিম্নের উদ্ধৃতিটিতে 'শান্তি' গাথায় নায়িকা শান্তির নবযৌবনকে নায়ক তিল্যাম সওদাগর মিষ্টি ও তার মনে প্রীতিদায়কের কারণে আমন ধানের ক্ষীরের প্রতীকে প্রকাশ করেছে :

৩১১.

একেত কার্ত্তিক হারে মাসে শান্তি আমন ধানের ক্ষীর।
শান্তি নারীর যৈবন দেইখে আমার প্রাণ করে অস্থির॥
['শান্তি', পূগী ২, ২ : ১২৩]

ঝিলিমিলি

নিম্নের উদ্ধৃতি দুটোতে ঝিলিমিলি শব্দটি আনন্দ ও উচ্ছ্বাসময়তার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে :

৩১২.

আবে করে ঝিলীমিলী নদীর কুলে দিয়া।
দুইজনে চলিল ভালা ঘোড়ায় সুয়ার হইয়া॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ২৬]

'মহুয়া' গাথায় মহুয়া পিতার নির্দেশে নদের চাঁদকে হত্যা করতে না পেরে নদের চাঁদসহ দুজনে পালিয়ে যেতে হুমরার ঘোড়ায় চড়লে তাদের পালাবার মুক্তির আনন্দ ও উচ্ছ্বাসময়তা প্রকাশ পেয়েছে ঝিলিমিলির প্রতীকে।

৩১৩.

আবে করে ঝিলিমিলি সোণার বরণ ঢাকা।
প্রভাতকালে আইল অরুণ গায়ে হলুদ মাখা॥
['চন্দ্রাবতী', মৈগী ১, ২ : ১০৫]

'চন্দ্রাবতী' গাথায় নায়িকা চন্দ্রাবতীর প্রতি নায়ক জয়ানন্দের অনুরাগ রঞ্জিত মনের ছবিটি সূর্যোদয়ের মধ্যে ঝিলিমিলির প্রতীকে প্রকাশিত।

এ ছাড়া গীতিকায় বর্ণিত দুষ্ট কাজী (মলুয়া), নেতাই কুটনী (মলুয়া), চিকন গোয়ালিনী (কমলা), ভাটুক ঠাকুর (দেওয়ান ভাবনা), দেওয়ান (দেওয়ান ভাবনা), মঘুয়া (মৈষালবন্ধু), কঙ্কুরাজা (মৈষালবন্ধু), আবু রাজা (ভেলুয়া), মুনাপ কাজী (ভেলুয়া), ভোলা সদাগর (ভেলুয়া), মাণিক (কমল সদাগর), গাবর রাজা (শ্যামরায়)-সমাজের দুঃশীল চরিত্রের প্রতীক। তাদের চরিত্র, চিন্তা-ভাবনা এবং অন্যায় ও নির্যাতনের মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠেছে আবহমান সমাজের বিরাজমান সংকট। এদের অনেকেই দুঃশীল সামন্ত প্রতিনিধি হিসাবে ক্ষমতার দাপট দেখিয়েছেন অধীনস্তদের উপর। এদের অন্যায় শাসনের প্রতিবাদ করার সাহস খুব কম ব্যক্তিরই ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা গীতিকায় চিত্রকল্প

মৈমনসিংহ ও *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা* প্রণয়মূলক রচনা। গীতিকার চিত্রকল্পগুলোতে এর প্রতিফলন দেখা যায়। এর বিশ্লেষণে নিম্নোক্ত চিত্রকল্পসমূহের প্রাধান্য দেখা যায়:

ক. মানবদেহের, বিশেষত নারীদেহের সৌন্দর্য বা রূপ বর্ণনা

খ. স্বাধীন প্রণয়বাসনা এবং প্রণয়প্রাপ্তিজনিত আনন্দ

গ. প্রণয়ে ব্যর্থতাজনিত মানসিক শূন্যতা ও যন্ত্রণা।

লক্ষণীয় যে, এসব গীতিকায় উপমা-রূপক-প্রতীকসহ অলঙ্কার প্রয়োগের অনুষঙ্গ সর্বদা মানুষ, মানুষের সৌন্দর্য, তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিজনিত অনুভূতি। এ-বিবেচনা থেকে গীতিকায় প্রাপ্ত চিত্রকল্পগুলোকে তিনভাগে বিন্যস্ত করা যায় :

১. রূপ-বর্ণনাত্মক চিত্রকল্প;

২. মানসিক অবস্থা-বর্ণনাত্মক চিত্রকল্প; এবং

৩. বিবিধ চিত্রকল্প।

রূপবর্ণনাত্মক চিত্রকল্প

গীতিকার রূপবর্ণনাত্মক চিত্রকল্পগুলো মধ্যযুগীয় প্রণয়োপাখ্যান ও অন্যান্য কাব্যে নায়িকার রূপবর্ণনায় যে সুনির্দিষ্ট কাঠামো ছিল, তা থেকে মুক্ত। প্রাপ্ত চিত্রকল্পগুলোতে রূপের যে মহিমা প্রকাশ পেয়েছে তাতে পৃথকভাবে চুল, ললাট, ভুরু, চোখ, মুখ, ঠোঁট, দাঁত, স্তন, পা এবং অখণ্ড দেহরূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। সব চিত্রকল্পেরই বিষয় রূপসী নায়িকা বা নায়কের মাহাত্ম্য প্রকাশ। আর তা প্রকাশ করতে অনুষঙ্গরূপে কখনো ব্যবহৃত হয়েছে প্রকৃতির নানা উপাদান; যেমন ফুল, ফল, বৃক্ষ, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, তারা, মেঘ, বিজলী, রামধনু, আগুন, পানি, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি। কখনো ব্যবহৃত হয়েছে বস্তু, যেমন ধনুক, বাঁশী, হীরা-মতি-মুক্তা, সর্পমণি, চিরুণী, নৌকা, পুতুল, প্রতিমূর্তি ইত্যাদি। আবার কখনোবা ব্যবহৃত হয়েছে পৌরাণিক চরিত্র ও বিষয়াদি।

চুল

নায়ক বা নায়িকার রূপবর্ণনায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আলোচনায় চুল বা চুলের সৌন্দর্য বিষয়ক চিত্রকল্পগুলো মনোহর। মানব দেহের শুরু মাথা আর মাথার সৌন্দর্য ঘন কালো চুল। গীতিকায় আমাদের প্রাপ্ত চুলের বর্ণনাত্মক চিত্রকল্প দুটো; অন্য একটিতে রয়েছে চুলের সিঁথির বর্ণনা। চুলের সৌন্দর্য বর্ণনাত্মক চিত্রকল্পদুটোর একটির অনুষঙ্গ প্রকৃতি, অন্যটির অনুষঙ্গ কীটপতঙ্গ। সিঁথির বর্ণনাত্মক চিত্রকল্পটির অনুষঙ্গও প্রকৃতি।

১.

দেখিল সুন্দর কন্যা জল লইয়া যায়।
মেঘের বরণ কন্যার গায়েতে লুটায়॥
এইত কেশ না কন্যার লাখ টাকার মূল।
শুকনা কাননে যেন মহুয়ার ফুল॥
['মলুয়া'; মৈগী ১, ২ : ৫৩]

এ চিত্রকল্পটিতে মেঘের মতো কালো চুল মলুয়ার দেহে বার বার লুটিয়ে পড়ছে যা লাখ টাকার উৎস বলে মনে হয়েছে। মহুয়া ফুলের মাদকতার যে নেশা, শুকনো মাথায় নায়িকার সতেজ চুল তেমনি নায়ক চান্দ বিনোদের কাছে। অর্থাৎ নায়িকা মলুয়ার চুলের সৌন্দর্য বর্ণনায় অনুষঙ্গ রূপে এই মহুয়া ফুল এসেছে সচেতনভাবে। নায়িকার সুন্দর চুল উপমিত হয়েছে ফুলের সঙ্গে। *ময়মনসিংহের গীতিকা:* জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য গ্রন্থে বলা হয়েছে "মহুয়া ফুলের মাদকতা যেন যৌবনের মাদকতার সঙ্গে মিশে গেছে" (সৈয়দ আজিজুল হক ১৯৯০:৩৬২)। আঙ্গিক বিচারে এটি প্রকৃতি-আশ্রয়ী উপমাত্মক চিত্রকল্প।

২.

মস্তকের কেশ যেমুন,
কুইজের মাথায় কালা।
জোড়া ভুরু দেখলে হায়রে
যায়রে মোনের জ্বালা॥
['মাণিক তারা'; পূগী ২. ২: ২৫৩]

চৈত্রের গরমে জীবনসঙ্গীনির সন্ধানে ভ্রমণরত বাসু পানি পানের উদ্দেশ্যে ঘাটের পাড়ে এসে লক্ষ করল বিপরীত পাড়ে এক কেশবতী কন্যা। ওপাড় থেকে কন্যাও দেখে নিল বাসুকে। বাসু পানি পান শেষ করে একটি গাছের তলায় এসে ঐ কন্যাকে ভালভাবে অবলোকন করে তার পরিচয় জানতে চাইল। এই কন্যাই মাইন্দা গ্রামের সাধুশীলের রূপসী কন্যা মাণিকতারা। এখানে মাণিকতারার রূপ বর্ণনা বাসুর দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে। তার মুখখানা যেন পূর্ণিমার চাঁদ। খালের অন্য পাড় থেকে বাসু মাণিকতারাকে উদ্দেশ্য করে রূপের যে প্রশংসা করেছে তা-ই ফুটে উঠেছে উপর্যুক্ত চুল বিষয়ক চিত্রকল্পটিতে। কন্যার মাথার চুল এত কালো যে মনে হচ্ছে উকুনের মাথার কালো অংশের মতো, যার যুগ্ম ভুরুদর্শনে মনের জ্বালা দূর হয়। এখানে নায়িকার কালো চুলের বর্ণনায় কুইজের (উকুনের) অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রণয়তৃষিত হৃদয়ের যন্ত্রণা লাঘবের ইঙ্গিত বহন করছে এ পোকাবিষয়ক চিত্রকল্পটি।

৩.

সিঁথিতে সিঁথানি কন্যা তারা যেন জ্বলে।
বাহার করিয়া সাড়ী তুলিল কাঁকালে॥
['মুকুটরায়'; পূগী ৪, ২ : ১৪৪]

রাজপুত্র মুকুটরায় উপযুক্ত কন্যা নির্বাচনে ব্যর্থতার শাস্তিস্বরূপ পিতা কর্তৃক পরিত্যজ্য হয়। গহীন বনে চলতে চলতে সে হঠাৎ এক হীরামন তোতা দেখে তার পিছু পিছু গিয়ে গাছের পাতা ও বাকল পরিহিত এক সুন্দর বনকন্যাকে খুঁজে পায়। মুকুটরায়ের রূপ দেখে কন্যা মুগ্ধ হয়। কয়েকদিন আত্মগোপন করে থাকার পর ব্যাধকন্যাসহ মুকুটরায় নিজ রাজ্যে ফিরে এলো। এভাবে রাজপুত্র মুকুটরায় পূর্বে স্বপ্নে-দেখা

অরণ্যচারিণী প্রণয়িণীকে উদ্ধার করে বিয়ে করে এনে নানা রত্ন-অলঙ্কারে ভূষিত করে। এক বনচারিণীকে সভ্য সমাজের অলঙ্কারে ভূষিত করায় তার রূপ ফুটে উঠেছে এ চিত্রকল্পে। আকাশের তারা জীবন্ত ও জ্বলজ্বলে। এখানে প্রণয়িণীর রূপ বর্ণনায় মাথার চুলের সিঁথিতে সেই তারার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পেয়েছে যা অনুষঙ্গ রূপে বর্ণিত হয়েছে চুল বিষয়ক চিত্রকল্পটিতে। ইন্দ্রিয় বিচারের আলোকে চিত্রকল্প দর্শনেন্দ্রিয় ভিত্তিক ও মূর্ত।

ললাট

আমাদের আলোচ্য গীতিকাসমূহে রূপ বর্ণনায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনাত্মক চিত্রকল্পে কপাল বা ললাটের প্রসঙ্গ এসেছে দু'বার। প্রথমবার ভাগ্য সম্পর্কে এবং দ্বিতীয়বার কপালের একটি বিশেষ পরিচিতিমূলক তিল প্রসঙ্গে।

৪.

কোপালেতে ভাগ্যরেখা চমকে বিজুলি।
কুষ্ঠির মাঝে লেখা আছে রাজা হৈব বুলি॥
['কমল সদাগরের পালা'; পূগী ৩, ২ : ২২৫]

পালা'য় কাঁইচা নদীর পাড়ে বাসন্তী নগরে সম্পদশালী কমল সদাগরের বসতি। তার প্রথমা স্ত্রী সুরঙ্গিণী রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। তাদের দু'টি পুত্রসন্তান - চানমণি ও সূর্য্যমণি। বড়পুত্র চানমণি বাবা-মার বড় আদরের ধন। তার কপালে ভাগ্যরেখা যেন বিজলীর মতো চমকাচ্ছে যার প্রকাশ পাই আমরা উপরোল্লিখিত চিত্রকল্পটিতে। তার কুষ্ঠিতে সংকেত দেয়া আছে যে সে ভবিষ্যতে একদিন রাজা হবে। এর সত্যতা প্রমাণিত হয় কাহিনীর শেষে যখন দেখি ঘটনাচক্রে চানমণি দক্ষিণ দেশের রাজ সিংহাসন লাভ করে। প্রকৃতি আশ্রয়ী এ চিত্রকল্পটি সওদাগরপুত্র চানমণির আগাম সৌভাগ্যের চিহ্নবাহী। মেঘের বিজলী যেমন মুহূর্তের জন্য সবকিছু আলোকিত করে দিয়ে পথিককে পথ দেখায়, তেমনি চানমণির ললাটের ভাগ্যরেখা বিজলীর মতো ক্ষণিকের জন্য তার সমৃদ্ধিময় ভবিষ্যৎকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে গেল।

৫.

অতিদীর্ঘ জটাভার গো পড়ে ভূমিতলে।
ললাটে চন্দন তিলা গো তারা যেন জ্বলে॥
['চন্দ্রবতীর রামায়ণ'; পূগী ৪, ২ : ২৪৯]

'চন্দ্রাবতীর রামায়ণ' গাথায় রামচন্দ্রের জন্মগ্রহণ অধ্যায়ে এক মুনির কপালের তিলকের ঔজ্জ্বল্য বর্ণনায় তারার অনুষঙ্গে উপযুক্ত চিত্রকল্পটির সৃষ্টি। গাথায় নগরীর রাজা দশরথ তিনটি বিয়ে করে এবং যথাবিধ যজ্ঞ পালন করেও পুত্রসন্তানের পিতা হতে পারলেন না। একদিন তিনি মনোকষ্টে যোড়মন্দিরে গিয়ে কপাট বন্ধ করে অনাহারে শুয়ে থাকলেন। তিনদিন পর হঠাৎ এক মুনি তথায় আগমন করেন। তার কপালের একটি বিশেষ পরিচিতিমূলক তিলকে অবলম্বন করেই সৃষ্টি হয়েছে উপরোল্লিখিত চিত্রকল্পটি। মুনিদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার চুলের জটা অতি দীর্ঘ যা ভূমিকে স্পর্শ করছে। কপালেও একটি বিশেষ চন্দনতিলা। মনে হয় যেন নির্মেঘ আকাশে তারা জ্বল জ্বল করছে। তারই দেওয়া অকাল অমৃত ফল ভক্ষণে কৌশল্যা রাণী দেবতার বরে পুত্রবতী হলেন এবং রামের জন্ম দিলেন। কাজেই তার ললাটের চন্দনতিলের বিজয় ঘোষিত হল।

ভুরু

গীতিকাসমূহে রূপের মাহাত্ম্য প্রকাশে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনাত্মক চিত্রকল্পে ভুরুর সৌন্দর্য বর্ণনা করা হয়েছে তিন স্থানে। ভুরুর উপরই চোখের সৌন্দর্য নির্ভর করে। প্রথম দু'টিতে ভুরুর বণনা এসেছে বস্তু-আশ্রয়ী অথাৎ রামের ধনুকের তুলনায়। ফলে এ দুটি চিত্রকল্পই পুরাণাশ্রয়ী। অপরটি প্রকৃতি-আশ্রয়ী; রামধনুর অনুষঙ্গে।

৬.

দেখিতে রামের ধনু কন্যার যুগ্ম ভুরু।
মুষ্টিতে ধরিতে পারি কটিখানা সরু॥
['কমলা'; মৈগী, ১, ২ : ১২৫]

হুলিয়া গ্রামের সম্পদশালী মাণিক চাকলাদারের কন্যা কমলা অপরূপ দেহসৌন্দর্যের অধিকারী। তার বিয়ের বয়স হয়েছে, কিন্তু যোগ্য পাত্র পাওয়া যেন দুরুহ। তার মুখ চাঁদের মতো ফুটফুটে, ঠোঁটগুলো সিঁদুর রঙা যেন তেলাকুচ ফলের মতো। চোখ দুটো যেন জিনিয়া ও অপরাজিতা ফুল, যেখানে ভ্রমর উড়ে এসে বসে পড়ে। কমলার এমনি রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গেই আলোচ্য চিত্রকল্পটি সৃষ্টি হয়েছে। কমলার চোখের দুই ভুরুর বর্ণনায় অনুষঙ্গরূপে রামের ধনুকের চমৎকার উপমা এসেছে এ চিত্রকল্পে। রামের ধনুক যেমন বাঁকা ও দৃষ্টিনন্দন, কমলার ভুরুও রচয়িতার কাছে তেমনি মনে হয়েছে। কমলার কটিকে বলা হয়েছে অত্যন্ত সরু যাকে মুষ্টিতে ধরে রাখাও অসম্ভব নয়। কমলার এই রূপবর্ণনায় রচয়িতা ২২টি চরণ ব্যবহার করেছেন যা গীতিকায় কমই দৃষ্ট হয়।

৭.

পরথম যৌবন কন্যার সোণার বরণ তনু।
কপালেতে আঁইকা রাখ্ছে শ্রী রামের ধনু॥
['ভেলুয়া'; পূগী ২, ২ : ১৪৪]

কাঞ্চননগরের বিত্তবান বণিক মাণিক সওদাগরের বাতিতূল্য পাঁচপুত্র এবং 'মদনের রতি'তূল্য মাত্র এক কন্যা -নাম ভেলুয়া সুন্দরী। তার চুলের বরণ মেঘের মতো এবং চোখ দুটি তারকার মতো উজ্জ্বল। ভেলুয়ার সদ্য যৌবনবতী দেহ স্বর্ণবর্ণ। এই কন্যার যুগ্ম ভুরুর বর্ণনায় রামের বাকা ধনুকের অনুষঙ্গ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বস্তুআশ্রয়ী এ চিত্রকল্পটি। ভেলুয়ার কপালে দৃশ্যমান জোড়া ভুরুকে *পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ২য়খণ্ড, ২য় সংখ্যায়* "অঙ্কিত করিয়া জোড়া ভুরু রামধনুর মত যেন আঁকিয়া রাখিয়াছে" বলে সম্পাদক মন্তব্য করেছেন (দীনেশ চন্দ্র সেন ১৯২৬:১৪৪)। কন্যার কপালে দু'চোখের উপর বাকা ভুরু দুটিকে রচয়িতার কাছে মনে হয়েছে রামের হাতের বাকা ধনুকের মতো। কেউ হয়তো সযত্নে সেই ধনুক এঁকে কন্যার ভুরুকে শিল্পরূপদান করেছে। আঙ্গিক বিচারে এটি একদিক থেকে বস্তু-আশ্রয়ী চিত্রকল্প, কারণ রামের ব্যবহৃত ধনুক এর অনুষঙ্গ। অপরদিক থেকে এটি্কে প্রকৃতি-আশ্রয়ীও বলা যায়, যদি অনুষঙ্গ হিসাবে এখানে আকাশের বর্ণিল রামধনুকে গ্রহণ করা হয়। দুটি চিত্রকল্পই পুরাণাশ্রয়ী, কারণ এদের অনুষঙ্গ রামের ব্যবহৃত ধনু।

৮.

বড়ই ছুরত তার দুনয়ান বাঁকা।
ধনুর মতন ভুরু আছ্মানেতে আঁকা॥
['কাফেন চোরা'; পুগী ৩, ২ : ৫৫]

কুর্ম্মাই নদীর তীরের চিন্তাপুর গ্রামের বেপারী আজিমের প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর অপূর্ব সুন্দরী আয়রা বিবিকে সে বিয়ে করে। আয়রা নবযৌবনা; রূপ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে তার চেহারা দেখলে 'যোয়ান মর্দ'তো দূরের কথা নারীরও মন ভুলে যায়। তার হাসিতে মনে হয় যেন বিজলীর রেখাপাত, দাঁতগুলো যেন মুক্তোর মতো সমস্ত মুখ জুড়ে প্রকাশ পায়। পা পর্যন্ত লম্বা কালো চুলের অধিকারীণী এই আয়রা বিবির বাঁকা দু নয়নের উপর বক্র ভুরুর বর্ণনায় শরাসন বা ধনুকের অনুষঙ্গে আলোচ্য প্রকৃতি-আশ্রয়ী চিত্রকল্পটির সৃষ্টি। আকাশে যেমন ধনুকের আকৃতিতে রংধনুর সৃষ্টি হয়, আয়রা বিবির দুচোখের উপর ভুরু দুটিকেও যেন অনুরূপ মনে হচ্ছে। অর্থাৎ আয়রা বিবির কপাল যেন আকাশ এবং ভুরুযুগল ঐ আকাশে ওঠা ধনুকাকৃতির রংধনু, যার গঠন বক্রাকার এবং নয়নাভিরাম।

চোখ

চোখের সৌন্দর্য দেহসৌন্দর্যের অন্যতম উপাদান । গীতিকায় রূপবর্ণনার অনুষঙ্গে চোখ বা চোখের তারা বিষয়ক চিত্রকল্পের সন্ধানও মেলে। কোথাও চোখকে বর্ণনা করা হয়েছে রূপের মাহাত্ম্য প্রকাশের ক্ষেত্রে; আবার কোথাও বিমর্ষ রূপের অনুষঙ্গে চোখ ব্যবহৃত হয়েছে নায়িকার বিপর্যস্ত অবস্থা বর্ণনায়।

৯.

উপরে যোর ভুরু নীচে নয়ানতারা।
মধুলোভে পুস্পে যেমন বৈসাছে ভমরা॥
কাল কাজলে রাঙ্গা তার দুটি পাশে। .
বর্ষাকাল্যা তারা যেমন মেঘের উপর ভাসে॥
['কঙ্ক ও লীলা'; মৈগী ১, ২ : ২৭১]

পালার নায়িকা লীলা অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী। তার সৌন্দর্যের আলোকচ্ছটায় অন্ধকারও যেন আলোকিত হয়। তার রূপসৌন্দর্য দেখে বাগানের ফুলগুলো যেন মলিন হয়ে পাতার নিচে লুকায় এবং চন্দ্রও লজ্জিত হয়ে অন্ধকারে হারিয়ে যায়। তার রূপ দেখে পথের পথিক থমকে দাঁড়িয়ে তার মুখটি দেখে নেয়। লীলার এমনি রূপবর্ণনায় চোখের সৌন্দর্য বিষয়ক চিত্রকল্পটির অবতারণা। সুন্দরী লীলার চোখের উপরে জোড়া ভুরু শোভা পাচ্ছে এবং তার নিচে দুচোখের তারা অবস্থান করছে এমনভাবে যেন মনে হয় মধুর আকর্ষণে কালো ভ্রমর ফুলের মধ্যে বসে আছে। এখানে নয়নতারা যেন ভ্রমর, যে চোখের পাতারূপ ফুলের মধ্যে মধু অন্বেষণ করছে। লীলার কাজলকালো চোখের দুই পাতার মধ্যে কালো তারা বা মণি দুটোকে মনে হচ্ছে যেন মেঘের উপর বর্ষাকালের আকাশের তারকার মতো। বর্ষাকালের মেঘে যেমন জলীয়বাষ্প পরিপূর্ণ থাকে, যে কোনো মুহূর্তেই বর্ষণ হতে পারে এমনি অবস্থায় লীলার চোখের তারা দুটি দুই পাতার মধ্যে বিরাজমান। চোখের দুই পাতার মধ্যে মেঘপূর্ণ বর্ষার আকাশ এবং সেই আকাশে ভাসমান মেঘের উপর নয়নতারা যেন বর্ষাকালের উজ্জ্বল নক্ষত্র। নায়িকা লীলার রূপের মাহাত্ম্য

প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রকৃতি-আশ্রয়ী এ চিত্রকল্পটিতে রূপ বর্ণনায় চোখের প্রকাশে বর্ষাকালের আকাশে মেঘ ও তারার অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে।

১০.

আঙ্খির তারা যে কন্যার অতি মনোহর।
পর্দ্দফুলের মাঝে যেন রসিক ভোমর॥
['ভেলুয়া'; পূগী ৩, ২ : ৯০]

সাগরে বেষ্টিত তেলন্যা নগরে ধনী সওদাগর মনুহর সাতপুত্র ও এক কন্যা রেখে মৃত্যুবরণ করলেন। গাথার নায়িকা ভেলুয়া সেই সাত ভাইয়ের এক বোন। গাথায় 'ভেলুয়ার পরিচয়' অংশে চৌদ্দ চরণ ধরে তার রূপ বর্ণনা করা হয়েছে। দূর থেকে তাকে যেমন ইন্দ্রকুলের পরীর মতো মনে হয়, তেমনি আবার কাছ থেকে তাকেই সোনার নির্মিত প্রতিমার ন্যায় মনে হয়। অর্থাৎ তাকে স্থান ভেদে একই অঙ্গে বহুরূপে রূপিনী মনে হয়। এ রূপবর্ণনারই একপর্যায়ে উপর্যুক্ত কীট-পতঙ্গ আশ্রয়ী চিত্রকল্পটিতে ভেলুয়ার চোখের সৌন্দর্য বর্ণনায় পদ্মফুলে ভ্রমরের অনুষঙ্গ এসেছে। তার চোখের তারা মনোমুগ্ধকর। তা দেখে পদ্মফুলের মাঝখানে রসিক ভ্রমরের কথা মনে পড়ে যায়। অর্থাৎ ভেলুয়ার চোখ যেন পদ্মফুল আর তার চোখের কালো তারা যেন কালো ভ্রমর। এখানে চোখের উপর পদ্মফুল ও ভ্রমরকে আরোপ করে একটি চমৎকার ও সার্থক উপমাত্মক চিত্রকল্প সৃষ্টি হয়েছে। মনে হলো যেন ঐ ভ্রমরটি মধুভরা ফুল পেয়ে মধুপান করছে।

১১.

আড় নয়ানে চাইল কৈন্যা আড় নয়ানে চাইল।
বিজলী চমকি যেন মেঘের কোলে ধাইল॥
['নুরন্নেহা ও কবরের কথা'; পূগী ৪, ২ : ১০৩]

পালায় মালেকের নিঃসঙ্গতা দূর করার অভিপ্রায়ে বাল্যসাথী নুরন্নেহা তার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। এই নুরন্নেহার রূপবর্ণনায় তার আড় নয়নে তাকানোর ব্যাখ্যায় বিজলীর অনুষঙ্গে বর্তমান চিত্রকল্পটির ব্যবহার। নুরন্নেহার চোখ এবং তার ক্ষণিক দৃষ্টিপাত যেন বিজলীর চকিত আলোকরশ্মির মতো। নায়িকার নিক্ষিপ্ত দৃষ্টির উপর বেগবান বিজলী চমকানো আরোপিত হওয়ায় প্রকৃতি-আশ্রয়ী চিত্রকল্পটি অসামান্য শিল্পরূপ লাভ করেছে।

১২.

সেজুতিয়া তারা যেমুন জ্বলে দুই আঁখি।
রাঙ্গা রাঙ্গা দুই ঠোঁট সিন্দূরেতে মাখি॥
['জীরালনী'; পূগী ৪, ২ : ৪৩০]

প্রতাপশালী রাজা চক্রধরের প্রথমা পত্নীর একমাত্র কন্যা রূপসী জীরালনী। তার আর এক নাম মেঘমতী। এই কন্যার প্রথম যৌবনের রূপ অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তার চুল মেঘের মতো কালো; মুখ চাঁদের মতো। তার চোখের সৌন্দর্য বর্ণনায় সন্ধ্যাতারার অনুষঙ্গে উপর্যুক্ত প্রকৃতি আশ্রয়ী চিত্রকল্পটি পাওয়া যায়। মেঘমতী বা জীরালনীর দুই চোখ যেন সন্ধ্যাতারার মতো জ্বলজ্বলে। রাঙ্গা ঠোঁট দুটোতেও যেন কে সিঁদুরের রং মেখে দিয়েছে। আমরা জানি সন্ধ্যাতারা জ্বলজ্বলে ও ক্ষণস্থায়ী। এর ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে জীরালনীর চোখের উজ্জ্বলতা এবং সিঁদুরের সঙ্গে তার রাঙ্গা ঠোঁটের তুলনা একীভূত হয়ে যে তৃতীয় মাত্রার সৃষ্টি করেছে, তা-ই এখানে চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে। *ময়মনসিংহের গীতিকা: জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য*

গ্রন্থে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, "সন্ধ্যাতারার আকাশে সিঁদুর রঙা লাল মেঘ যেন তার সমগ্র সৌন্দর্য নিয়ে নায়িকার মুখমণ্ডলে আভাসিত হয়ে ওঠে" (সৈয়দ আজিজুল হক ১৯৯০:৩৭৯)।

১৩.

সাজুতীয়ার তারা যেমন লীলার দুটী আঁখি।
কোঠরে বসিল চক্ষু দেখি বা না দেখি॥
['কঙ্ক ও লীলা'; মৈগী ১, ২ : ৩০৯]

দীর্ঘ প্রতিকূল ঘটনাবলী অতিক্রম করে নায়িকা লীলার পিতা যখন নায়ক কঙ্ককে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন তখন লোকমুখে শোনা গেল কঙ্ক জলে ডুবে মরেছে। কঙ্কের মৃত্যুর খবর শুনে লীলা দুঃখে বেদনায় শয্যাশায়ী হয়ে বিলাপ করতে লাগল। কঙ্কের মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হলে লীলা নিজ জীবনের প্রতি সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে ফেলল। কঙ্কের এ বিরহে রূপবতী লীলার বিমর্ষ রূপের বর্ণনা করা হয়েছে প্রকৃতি-আশ্রয়ী এ চিত্রকল্পটিতে। যার চেহারা ছিল পদ্মফুলের মতো, যার চোখ দুটি ছিল সন্ধ্যাতারার মতো উজ্জ্বল, সেই চোখ আজ কঙ্কের বিরহে কোটরে হারিয়ে যেতে বসেছে। তার মলিন চেহারায় কঙ্কান্বেষণের ছাপ, তার সুন্দর দেহ আখের পাতার মতো নির্জীব ও শুকিয়ে যাচ্ছে। লীলার কোটরাগত চোখের দিকে তাকালেই খুঁজে পাওয়া যাবে সে বিরহ যন্ত্রণায় কাতর। এভাবে আশাহত হয়ে তিলে তিলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। চোখ বিষয়ক আলোচ্য চিত্রকল্পটি রূপবর্ণনার বিপরীত প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ পূর্বের চারটি চিত্রকল্পে চোখের বর্ণনা করা হয়েছে নায়িকার সৌন্দর্য তথা আকর্ষণীয় রূপবর্ণনায়; কিন্তু একই অনুষঙ্গে অর্থাৎ সন্ধাতারার মতো উজ্জ্বল চোখ দুটি এখানে মলিন হয়ে এসেছে প্রিয়ার বিরহযন্ত্রণায়।

মুখ

রূপবর্ণনায় মুখের সৌন্দর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মুখ দর্শনেই একজনের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অনুধাবন করা যায়। গীতিকায় মুখের সৌন্দর্য বিষয়ক চিত্রকল্প পাওয়া যায় চারটি। আর ঠোঁট যেহেতু মুখের সৌন্দর্যের অন্যতম ভিত্তি সেহেতু ঠোঁটের সৌন্দর্যও একটি চিত্রকল্পে বিধৃত। সবগুলো চিত্রকল্পের অনুষঙ্গই প্রকৃতি।

১৪.

বাইদ্যা বাইদ্যা করে লোকে বাইদ্যা কেমন জনা।
আন্দাইর ঘরে থুইলে কন্যা জ্বলে কাঞ্চা সোনা॥
হাত্তিয়া না যাইতে কইন্যার পায়ে পরে চুল।
মুখেতে ফুট্টা উঠে কনক চাম্পার ফুল॥
['মহুয়া'; মৈগী ১, ২ : ৫]

হুমরার চুরি করা পালিত কন্যা মহুয়া যৌবনে পদার্পন করলে তার সৌন্দর্য সকলকে মুগ্ধ করে। মুহূর্তকাল দেখলেও তার রূপের কথা ভোলা যায় না; তার রূপে মুনীরও মন ভোলে। মহুয়া ফুলের মাদকতায় পরিপূর্ণ নায়িকা মহুয়ার রূপবর্ণনায় হাস্যোজ্জ্বল মুখের পরিচিতিতে পূর্ণ প্রকৃতি-আশ্রয়ী এ উপমাত্মক চিত্রকল্পটি। নায়িকার রূপকে রচয়িতার কাছে কাঁচা সোনা বলে মনে হয়েছে, সেই সাথে তার মুখমণ্ডলকে প্রস্ফুটিত কনকচাঁপা ফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। চিত্রকল্পটিতে মহুয়ার লম্বা কেশ এবং হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের কথা আছে, যে মুখে কনকচাঁপা ফুলের দ্যুতি ছড়িয়ে রয়েছে। *লোককালা প্রবন্ধাবলী গ্রন্থে* বলা

হয়েছে, "আমরা মোনালিসার রহস্যময় হাসির কথা জানি, কিন্তু যার মুখে প্রস্ফুটিত কনকচাঁপা উদ্ভাসিত হয়, তাঁকে কেমন দেখায় জানিনা" (ওয়াকিল আহমদ ২০০১:১২০)। রচয়িতা সেটাকেই চিত্রিত করেছেন এ চিত্রকল্পটিতে।

১৫.

আসমানেতে কাল মেঘ চান্দে ঢাইক্যা রাখে।
ভাঙ্গা কেশ পড়ে যখন রে সুন্দর কন্যার মুখে॥
['ভেলুয়া'; পূগী ২,২ : ১৪৪]

ভেলুয়ার রূপের তুলনা সংসারে বিরল। তার চুল মেঘবরণ এবং চোখ দুটি তারকার মতো উজ্জ্বল। তার কপালের যুগ্ম ভুরু যেন রামের বাঁকা ধনুকের মতো। প্রথম যৌবনে তার রূপে যেন আগুন জ্বলছে। সে হাটলে যেন দেহলাবণ্য ভেঙ্গে পড়ে। মুখখানাও তার চন্দ্রের মতো সুগোল ও স্নিগ্ধ। কন্যার চুল এত দীর্ঘ যে হাটলে তা ভূলুণ্ঠিত হয় ফলে উপায় না পেয়ে দাসীরা তা ধরে রাখতে বাধ্য হয়। এই কালো চুলের অংশবিশেষ যখন ভেলুয়ার মুখমণ্ডলে পতিত হয় তখনকার রূপ বর্ণনা স্থান পেয়েছে এ চিত্রকল্পে। *ময়মনসিংহের গীতিকা:জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য*-গ্রন্থে বলা হয়েছে "কালো মেঘ দ্বারা আচ্ছাদিত হলেও চাঁদ যেমন তার আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত করে, তেমনি কালো কেশের মধ্য থেকে নায়িকার মুখাবয়বের কান্তি বেরিয়ে আসছে (সৈয়দ আজিজুল হক ১৯৯০:৩৬৬)।"আঙ্গিক বিচারে এটি একই সাথে উপমাত্মক ও প্রতীক-আশ্রয়ী প্রকৃতি বিষয়ক চিত্রকল্প। কালো মেঘের ঢেকে রাখা চাঁদের ক্ষীণ আলোকৌজ্জ্বল্যর উপমায় কন্যার মুখ সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে। এখানে ভাঙ্গা কেশের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে কালোমেঘ।

১৬.

মুখের গঠন মাইয়ার পুন্নিমার শশী।
বচন কোকিলার বোল কানুর হাতর বাঁশী॥
['নেজাম ডাকাইতের পালা'; পূগী ২,২ : ৩৩৫]

পালায় পাহাড়ী সর্দারের কন্যা লালবাই বারো বছর বয়সে অপরূপ যৌবনের অধিকারিণী হল। কন্যা লালবাইর রূপবর্ণনায় মুখের প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে এ প্রকৃতি-আশ্রয়ী চিত্রকল্পটিতে। লালবাইয়ের মুখের গঠন যেন পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুগোল ও পূর্ণ বিকশিত। সেই মুখ থেকে নিঃসৃত সুমধুর কণ্ঠস্বর কোকিলের কণ্ঠস্বরের মতো যা কৃষ্ণের বাঁশীর সুরের কথা মনে করিয়ে দেয়। ফলে এটি পুরাণাশ্রয়ী চিত্রকল্পের মর্যাদায় উন্নীত। কারণ এখানে লালবাই কন্যার কোমল কণ্ঠস্বর বর্ণনায় কৃষ্ণের মনোহারিণী বাঁশীর সুরের অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। ইন্দ্রিয় বিচারে এটি শ্রবণেন্দ্রিয়নির্ভর বিমূর্ত চিত্রকল্প। তবে মুখের বর্ণনায় যে এর উপর চাঁদের সৌন্দর্য ও আকৃতি আরোপ করা হয়েছে তাতে এটি মূর্ত ও দর্শনেন্দ্রিয় নির্ভর চিত্রকল্পে রূপ পেয়েছে।

১৭.

পদ্মের সমান কন্যার যেমন মুখখানি।
চক্ষু দুইটী দেখি ভাল নাচয়ে খঞ্জনী॥
['রূপবতী'; মৈগী ১, ২ : ২৪৩]

সময়মত বিয়ে দিতে না পারায় দুশ্চিন্তাগ্রস্থ রানী কন্যা রূপবতীর ভবিষ্যত জানতে পাঁচ জন গণক আনলেন। সবাই-ই রাজকন্যা রূপবতীর রূপ-গুনের প্রশংসা করে কল্যাণময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত

দিয়েছেন। কন্যার রূপবর্ণনায় পঞ্চম গণকের ভবিষ্যত বাণীই ফুটে উঠেছে প্রকৃতি আশ্রয়ী এ চিত্রকল্পটিতে। কন্যার মুখখানা যেন পদ্মফুলের মতো সদা হাস্যোজ্জ্বল। তার চোখদুটো দেখে মনে হয় যেন খঞ্জনীর সুরের তালে নাচছে। যার মুখে প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের দীপ্তি এবং চোল দুটি নৃত্যরতা, তার ভবিষ্যৎ কি অনিশ্চিত হতে পারে? তার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই খুঁজে পাওয়া যায় তার সুখের ঠিকানা। গণকের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কন্যার চাঁদ বরণ গালেও সিঁদুরের আভা। সুলক্ষণা তার সর্ব অঙ্গের গঠন। তার বিয়েও হবে রাজার ঘরে এবং এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না। সে যে একে একে সাত পুত্রের মা হবে গণক তাও জানাতে ভুল করে না।

১৮.

চান্নির মতন মুখ করে ঝলমল।
রাঙা ঠোঁট যেন তার তেলাকুচি ফল॥
['ভেলুয়া'; পূগী ৩,২ : ৯০]

'ভেলুয়া' গাথায় নায়িকা ভেলুয়া অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী। তার রূপবর্ণনায় চোখ, দাঁত ও ঠোঁটের আলাদা সৌন্দর্য প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তার বাঁকা ঠোঁটের হাসিটুকু নজরকাড়া। মনে হয় যেন তার হাসিতে বিজলী চমকাচ্ছে। তার উজ্জ্বল মুখ চাঁদের মতো ঝলমল করছে। অর্থাৎ চাঁদের ফুটফুটে জ্যোৎস্নাটুকু ছিনিয়ে নিয়ে ভেলুয়ার মুখের উপর নিক্ষেপ করে উজ্জ্বল করে তোলা হয়েছে। সেই উজ্জ্বল মুখের অধিকারিণীর রাঙ্গা ঠোঁটদুটি যেন পাকা তেলাকুচ ফলের মতো। এখানে প্রকৃতি আশ্রয়ী চিত্রকল্পটিতে তেলাকুচ ফল ভেলুয়ার রাঙ্গা ঠোঁটের বর্ণনার অনুষঙ্গরূপে স্থান পেয়েছে।

দাঁত

নায়ক বা নায়িকার রূপবর্ণনায় দাঁতের সৌন্দর্য বর্ণনা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। হাসিতে দাঁতের প্রকাশ। গীতিকায় নির্মল হাসির প্রকাশে দাঁত এসেছে চারটি চিত্রকল্পে।

১৯.

তার মধ্যে দন্ত লীলার নাহি যায় দেখা।
দুর্লভ মুকুতা যেমন ঝিনুর মধ্যে ঢাকা॥
['কঙ্ক ও লীলা'; মৈগী ১, ২: ২৭১]

পালায় যৌবনে পদার্পণকারী লীলার প্রতি কঙ্কের ছিল অকৃত্রিম অনুরাগ। বাংলার *লোক-সাহিত্য* প্রথম খণ্ডে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তাহার রূপটি পল্লীকবির সুগভীর আন্তরিক মমতায় মাখা" (আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৬২:৪২৬)। তার রূপ দেখে বাগানের সমস্ত ফুল যেন লজ্জায় পাতার আড়ালে চলে যায় এবং চাঁদ অন্ধকারে হারিয়ে যায়। তার অধর দেখে মনে হয় যেন কেউ সিঁদুর মেখে দিয়েছে। তার সিঁদুর রাঙা সেই যুগ্ম অধরের নিচে লুকিয়ে আছে মহামূল্যবান দাঁত, যার বর্ণনা ফুটে উঠেছে বস্তু-আশ্রয়ী এ উপমাত্মক চিত্রকল্পটিতে। দাঁতের একটি পরিচিত উপমান হিসাবে মুক্তোর ব্যবহার সুপরিচিত, কিন্তু সিঁদুর রাঙা ঠোঁটের আবরণ রূপে দুটি ঝিনুকের উপমায় আলোচ্য চিত্রকল্পটি অভিনব হয়ে উঠেছে। নদী-সাগর কেন্দ্রীক জীবন যাদের তাদের মনেই এমন চিত্র কল্পনা সম্ভব।

২০.

হাসিতে ঝলকে যেন বিজলির রেখা।
মুখেতে মুক্তার ছড়া জুড়ে যায় দেখা॥
['কাফেন-চোরা'; পূগী ৩,২ : ৫৫]

আয়রা বিবির রূপবর্ণনায় তার হাসির প্রকাশে বিজলী ও মুক্তা অনুষঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়ে এই চিত্রকল্পটির অবতারণা। আয়রা বিবি অনিন্দ্য সুন্দরী। তার হাসিতে বিজলীর রেখাপাত। অর্থাৎ বিজলী যেমন মেঘের মধ্যে মুহূর্তের জন্য ঝিলিক দিয়ে চমক দেখিয়ে হারিয়ে যায়, কন্যার হাসিতেও যেন তেমনি মুক্তো সদৃশ দন্তগুলো ঝিলিক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

২১.

হাসিতে বিজলী ঝরে অতি চমৎকার।
চাচর চিকন কেশ পায়ে পড়ে তার॥
['ভেলুয়া'; পূগী ৩, ২ : ৯০]

গাথায় তের বছর বয়সী নায়িকা ভেলুয়ার উচ্ছল হাসির প্রকাশে বিজলীর অনুষঙ্গ নিয়ে আলোচ্য প্রকৃতি-আশ্রয়ী চিত্রকল্পটির সৃষ্টি। আকাশে মেঘের ঘর্ষণে যে বিজলী চমকায় তা ক্ষণিকের মধ্যে হারিয়ে যায়, কিন্তু তার প্রভাব বা রেশ থেকে যায় বহুক্ষণ। ভেলুয়ার চমৎকার হাসিটিও তেমনি ক্ষণিক বিজলী চমকানোর মতো, দর্শকের কাছে যার রেশ থাকে অনেক সময় ধরে।

২২.

হীরা-মতি জ্বলে কন্যা যখন নাকি হাসে।
সুজাতি বর্ষার জলেরে যেন পদ্মফুল ভাসে॥
['কাজলরেখা'; মৈগী ১, ২ :৩১৫]

দশ বছর বয়সী কন্যা কাজলরেখা অসাধারণ রূপের অধিকারী। তার রূপবর্ণনায় হাসি ও দাঁতের প্রকাশে হীরা-মতির ঔজ্জ্বল্যের অনুষঙ্গ ও পদ্মফুলের কথা এসেছে। সে যখন হাসে তখন তার দাঁতগুলো দেখে মনে হয় যেন হীরা-মতি জ্বলছে। একই সঙ্গে দাঁতগুলোকে মনে হচ্ছে যেন সুদৃশ্য বর্ষার পানিতে পদ্মফুল ভাসছে। এখানে নায়িকার হাসির মধ্য দিয়ে শুভ্র দন্তের প্রস্ফুটনে সমগ্র মুখের যে দীপ্তি প্রকাশ পায়, হীরার ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে তার তুলনাটি সুদৃশ্য বর্ষার পানিতে ভাসমান পদ্মফুলের সঙ্গে উপমিত হয়ে নায়িকার সৌন্দর্য সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রা অর্জন করেছে। হীরার হাস্যোজ্জ্বতার সঙ্গে পদ্মফুলের হাস্যোজ্জ্বল সৌন্দর্য একত্রিত হয়ে তৃতীয় যে মাত্রাটি সংযোজিত হয়েছে তাই একটি বস্তু-আশ্রয়ী অসামান্য উপামাত্মক চিত্রকল্পে রূপ লাভ করেছে।

স্তন

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারীর রূপবর্ণনায় স্তনের সৌন্দর্যের বর্ণনা একটি বিস্তৃত স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু বাংলা গীতিকায় নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনায় নায়িকার স্তনযুগলের সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে মাত্র একটি চিত্রকল্পে।

২৩.

নির্মলা শরীল তার মাজাখানি সরু।
শিনায় কদলী পুষ্প যেন কল্পতরু।।
[নৈজাম ডাকাইতের পালা;পূগী ২,২:৩৩৫]

গাথায় পর্বতচারী কন্যা লালবাইর রূপবর্ণনায় স্তনদ্বয়ের সৌন্দর্য প্রতিফলিত হয়েছে উল্লিখিত প্রকৃতি-আশ্রয়ী চিত্রকল্পে। চাঁদসদৃশ কন্যার নির্মল শরীরে কোমরখানি সরু আকৃতির। তার বক্ষের সৌন্দর্য বর্ণনায়ও কলাফুলের অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান-এ* কল্পতরুকে "ইন্দ্রলোকের সর্বকামনা-পূরণকারী দেবতরু" বলা হয়েছে (শ্রীশলেন্দ্র বিশ্বাস ১৯৯৩:১৩৬); পাহাড়ী সর্দার কন্যার বক্ষও যেন ঐরূপ সর্বকামনা পূরণ করার গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ "অভীষ্টদায়ক বৃক্ষ" (সুধীর চন্দ্র সরকার ১৪০৬:৯১)। এখানে কন্যার বক্ষের সৌন্দর্য বর্ণনায় ইন্দ্রলোকের সর্বকামনাপূরণকারী দেবতরুর মতো কলাগাছের ফুলের অনুষঙ্গ কল্পনা করে কন্যার বক্ষ সৌন্দর্যে আরোপ করা হয়েছে। লালবাইর দুই স্তন যেন সুবিকশিত সুগঠিত কলাফুল। একই বৃন্তে ফোটা ঐ দুটি পুষ্প রচয়িতার কাছে অভীষ্ট লাভের মাধ্যম বলে মনে হয়েছে। চিত্রকল্পটিতে কল্পতরুর প্রসঙ্গ থাকায় এটি পুরাণাশ্রয়ী চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে।

চরণ

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনায় চরণ বা পা এবং চরণেক্ষেপের তিনটি বর্ণনাত্মক চিত্রকল্প পাওয়া যায়। এর প্রথমটি প্রকৃতি ও পশু আশ্রয়ী, দ্বিতীয়টি প্রকৃতি-আশ্রয়ী এবং শেষেরটি বস্তু-আশ্রয়ী।

২৪.

আষাঢ় মাস্যা বাশের বেরুল মাটী ফাট্যা উঠে।
সেই মত পাও দুইখানি গজন্দমে হাটে॥
['কমলা'; মৈগী ১, ২ : ১২৫]

গাথায় নায়িকা কমলার রূপবর্ণনা করা হয়েছে দীর্ঘ বাইশ পংক্তিতে। সে অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী। তার কেশ থেকে শুরু করে শরীরের প্রায় প্রতিটি অঙ্গই প্রকৃতির কোনো না কোনো উপাদানের সাথে তুলনীয়। তার এ-অনুপম সৌন্দর্য বর্ণনার এক পর্যায়ে কোমল পা ও চলার বর্ণনায় উল্লিখিত প্রকৃতি ও পশুর অনুষঙ্গকেন্দ্রীক চিত্রকল্পটি পাওয়া যায়। আষাঢ় মাসের বৃষ্টি ভেজা নরম মাটি ভেদ করে সাধারণ দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় এমন গতিতে উত্থিত বাশের নয়া অঙ্কুরের কোমলতার কথা এসেছে এ চিত্রকল্পে। সাধারণ উপমানের সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে একান্তই গ্রামকেন্দ্রিক এক সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা। *ময়মনসিংহের গীতিকা: জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য গ্রন্থে* এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তুলনাটি যেন প্রত্যক্ষভাবে ব্যাখ্যাগম্য নয়, অনেক কিছুই যেন অনুভব করে নিতে হয়" (সৈয়দ আজিজুল হক ১৯৯০:৩৮০)। অপরপক্ষে হাতীর চলার ছন্দের সঙ্গে নায়িকা কমলার ধীরে পথ চলার তুলনার মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। হাতী ভারী প্রাণী হলেও তার নরম ও কোমল পা ফেলার ভঙ্গীটি মনোহর ও ছন্দোময়। কমলার পা ফেলার ভঙ্গীটিও অনুরূপ বলে তার চলনে আভিজাত্য ও ছন্দমাধুর্য ফুটে উঠেছে দর্শনেন্দ্রিয় নির্ভর এ চিত্রকল্পটিতে।

২৫.

পাও দুইখান গেলে যেমন কলাগাছ।
পরীগণ হাইর মানে তার রূপের কাছ॥
['দেওয়ান ইশা খাঁ মসনদলি'; পূগী ২, ২ : ৩৫৩]

ঐতিহাসিক চরিত্র ঈশা খাঁ অবলম্বনে রচিত এই পালায় বর্ণিত গৌড়ের নবাব জোলাল উদ্দীনের এক অপরূপ সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী কন্যা মমিনা খাতুনের বিবাহপূর্ব রূপবর্ণনা স্থান পেয়েছে আলোচ্য প্রকৃতি আশ্রয়ী চিত্রকল্পটিতে। সে এতটাই রূপবতী ছিল যে বহু নবাবপুত্র তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেও কাউকেই সে পছন্দ করতে পারেনি। তার রূপ, গুণ ও বুদ্ধির সমতূল্য কোনো যোগ্য বর সে খুঁজে পেলন না। তার রূপ কবির দৃষ্টিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো। তার মাথায় কোমর অবধি ঘন কালো চুল ভর্তি। কন্যার মুখ দেখলে মনে হয় যেন পূর্ণিমার চাঁদের মতো সদা হাস্যোজ্জ্বল। চোখ দুটির মধ্যে হরিণের চঞ্চল চপলতার আভাস। রূপবর্ণনার এক পর্যায়ে অনিবার্যভাবে এসেছে কন্যার গোলগাল দুই পায়ের বর্ণনা। বাগানের নরম কোমল মাটিতে গোলাকৃতির কলাগাছ যেমন শোভা পায়, মমিনা কন্যার পা-দুখানিও যেন ঐ রূপ। এখানে মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে প্রকৃতির তুলনা আরোপ করে একটি সুন্দর চিত্রকল্পের অবতারণা করা হয়েছে। এখানে আকৃতিগত দিক অর্থাৎ গাছের গোলাকৃতি ও কন্যার দুপায়ের আকৃতি যেন কবিকল্পনায় অভিন্ন। তাই কন্যার রূপবর্ণনায় পায়ের গঠন বলতে গিয়ে কলাগাছের অনুষঙ্গে চিত্রকল্পটি সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। এমনি রূপসী কন্যাকে দেখে যেন পরীরাও হার মেনে যায়।

২৬.

পায়ের দুইখানি গোছ যেমন চিরুণী।
এই লক্ষণ থাক্‌লে কন্যা হয় রাজরাণী॥
['রূপবতী'; মৈগী ১, ২ : ২৪৩]

গাথায় পাঁচজন গণক একে একে কন্যা রূপবতীর রূপ-গুণ যাচাই করে ভাগ্য নির্ণয় করেছে। সে উত্তর দেশীয় কোনো রাজপুত্রের ঘর আলোকিত করবে। এই গণক কন্যার সুলক্ষণা পায়ের গঠন বর্ণনায় যে উক্তি করেছেন তা উপর্যুক্ত বস্তু-আশ্রয়ী চিত্রকল্পটিতে বিধৃত হয়েছে। রূপবতীর পায়ের গঠন এখানে চিরুণীর অনুষঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তার দু'পায়ের গঠন চিরুণীর মতো। এ রকম লক্ষণ কন্যার জন্য মঙ্গলজনক, সে ভবিষ্যতে রাজরানী হয়।

রূপ-বর্ণনাত্মক চিত্রকল্পের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা ছাড়া নায়ক-নায়িকার দৈহিক অবয়ব বা উজ্জ্বলতার সঙ্গে চাঁদ, তারা, সূর্য, আকাশ, বিজলী, স্বর্ণ, আগুন, সর্পমণি ইত্যাদির চিত্রকল্প; এমনকি যৌবনের সঙ্গে নদী বা ঢেউয়ের এবং চলমান তরীর অনুষঙ্গবহ উপমাত্মক চিত্রকল্পও পাওয়া যায়। এছাড়া পৌরাণিক অনুষঙ্গ নিয়েও রূপ-বর্ণনাত্মক চিত্রকল্প গঠিত হয়েছে।

চাঁদ

চাঁদ বাঙালি জীবনে অনুপম সৌন্দর্যের প্রতীক। তাই গীতিকায় প্রাপ্ত চিত্রকল্পে কখনো কখনো নায়ক বা নায়িকার দৈহিক অবয়ব বা উজ্জ্বলতার বর্ণনায় অনুষঙ্গরূপে চাঁদের ব্যবহার ঘটেছে।

২৭.

সভা কইরিয়া বইস্যা আছে ঠাকুর নদ্যার চান।
আসমানে তারার মধ্যে পূর্ণ মাসীর চান॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ৭]

গাথায় ব্রাহ্মণ জমিদারপুত্র নদের চাঁদকে বামনকান্দা গ্রামে বেদে দলের আগমন সংবাদ জানানোর প্রসঙ্গে গ্রামে তার অবস্থান বর্ণিত হয়েছে প্রকৃতি-আশ্রয়ী এ চিত্রকল্পটিতে। সভার মধ্যে সে আসীন; মনে হয় যেন আকাশের শত-সহস্র তারার মধ্যে পূর্ণিমার চাঁদ। অর্থাৎ এখানে সভামধ্যে নদের চাঁদের অবস্থান গায়ের উজ্জ্বলতার দিক থেকে পূর্ণ চন্দ্রের অনুষঙ্গে প্রকাশিত। গ্রাম্য সভায় উপস্থিত অন্যান্যদের তুলনায় নদের চাঁদের দৈহিক উজ্জ্বলতার অসামান্য সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণীয় পার্থক্যটি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে এখানে।

২৮.

দেখিতে সুন্দর নাগর চান্দের সমান।
ঢেউয়ের উপর ভাসে পুন্নুমাসীর চান॥
['চন্দ্রাবতী', মৈগী ১, ২ : ১১৮]

গাথায় চন্দ্রাবতীর সঙ্গে দুর্দৈববশত প্রণয়ভঙ্গের কারণে আত্মবিসর্জন দেওয়া জয়ানন্দের নদীতে ভাসমান মৃতদেহের রূপ বর্ণনা স্থান পেয়েছে এ চিত্রকল্পে। নদীর ঢেউয়ের উপর পূর্ণিমার চাঁদের প্রতিবিম্ব ও আলোর ঝিকিমিকি এবং জয়ানন্দের দেহকে আশ্রয় করে চিত্রকল্পটির সৃষ্টি। জয়ানন্দের মৃতদেহের সুন্দর অবয়ব ও উজ্জ্বলতার বর্ণনায় পূর্ণিমার চাঁদ উপমিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতি-আশ্রয়ী এ উপমাত্মক চিত্রকল্পটি। এর অনুষঙ্গ পূর্ণিমার চাঁদ। যে চন্দ্রাবতী বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তার প্রণয়ী জয়ানন্দের শেষ সাক্ষাতের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে তার কাছেই আবার তার জলে ভাসমান মৃতদেহ প্রতিভাত হয়েছে জলে প্রতিবিম্বিত পূর্ণিমার চাঁদ বলে। *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী চরিত্র*-গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত রমণীর ট্রাজিক রূপটি কবি সংহত ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন" (শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৯১:১৩৩)। আকাশের পূর্ণিমার চাঁদের সৌন্দর্যের চেয়ে জলে বিম্বিত সেই চাঁদের লাবণ্য ও সৌন্দর্য অনেক বেশি। আলোচ্য চিত্রকল্পটিতে তারই ইঙ্গিত পাই। জয়ানন্দের মৃত্যুর পিছনে কারণ হিসাবে *ময়মনসিংহের গীতিকা : জীবনধর্ম ও কাব্য মূল্য*-গ্রন্থে বলা হয়েছে, "স্বীয় গুরুতর অপরাধ বোধের অসহনীয় অনুশোচনা তাকে আত্মবিসর্জনে উদ্বুদ্ধ করেছে" (সৈয়দ আজিজুল হক ১৯৯০:১৯০-১৯১)।

২৯.

গ্রহণ ছাড়িলে যেমন চান্দের প্রকাশ।
কুমারে দেখিয়া কন্যা পাইল আশ্বাস॥
['কাজলরেখা', মৈগী ১, ২ : ৩২৬]

গাথায় জনৈক সন্ন্যাসী প্রদত্ত শুকপাখীর কথামতো সওদাগর ধনেশ্বর বাণিজ্যে যাবার ছল করে নিজ কন্যা কাজলরেখাকে বনবাস দিতে চললেন। গহীন বনে পৌঁছে একটা ভাঙ্গা মন্দিরের সিড়িতে তাকে বসিয়ে রেখে পিতা গেলেন পানির খোঁজে। এদিকে কন্যা মন্দিরের মধ্যে বন্দি হয়ে পড়ল। পিতা পানিসহ ফিরে এসে বুঝলেন কন্যা মন্দিরে বন্দি। কন্যার কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন মন্দিরের ভিতরে সর্বাঙ্গে সুঁচ ও শেল বিধানো এক মৃতকুমার শুয়ে আছে। বাবা বুঝলেন এই সেই মৃতকুমার যার সাথে

কাজলরেখার বিয়ে হবে বলে শুকপাখী জানিয়েছিল। তিনি কন্যাকে মরা কুমারকে স্বামী হিসাবে বরণ করে নিতে বলে বিদায় নিলেন। এরপর কাজলরেখা ঐ মন্দিরের সন্ন্যাসীর কথামতো মৃতকুমারের দু'চোখের দুটো সুঁচ ছাড়া দেহ থেকে সমস্ত সুঁচ তুলে গাছের পাতার রস দেওয়ার প্রস্তুতিস্বরূপ পুকুরে স্নান করতে গেল। পুকুরঘাটে বসে কঙ্কনের বিনিময়ে কেনা কঙ্কনদাসী কাজলরেখার স্নানশেষে আসার পূর্বেই দুর্দৈববশত পাতার রস ঢেলে দেয় কুমারের চোখে। স্নানান্তে কাজলরেখা ফিরেই দেখতে পায় তার স্বামী বেঁচে উঠেছে। এই সময়ে জীবিত কুমারের উজ্জ্বল দেহরূপের বর্ণনা স্থান পেয়েছে এ-প্রকৃতি আশ্রয়ী চিত্রকল্পটিতে। চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদের সৌন্দর্য আড়াল হয়ে যায়। কুমারের দেহসৌন্দর্যও যেন মৃত্যু তেমনি আড়াল করে রেখেছিল। গ্রহণ শেষে চাঁদের সৌন্দর্য প্রকাশের মতো সে জীবিত হলে দৈহিক ঔজ্জ্বল্য নিয়ে প্রকাশিত হলো। এখানে কুমারের দেহরূপ গ্রহণ পরবর্তী চাঁদের অনুষঙ্গে প্রকাশিত।

৩০.

খসিয়া আস্‌মানের চান্দ ভুঁয়েতে পড়িল।
কেউ বলে বনের লক্ষ্মী বনবাসে আইল॥
['কাঞ্চনমালা', পূগী ২, ২ : ৯৫]

গাথায় সাধু সওদাগর পত্নীকে সন্ন্যাসী প্রদত্ত ফল খাওয়ালে সুরূপা কন্যা কাঞ্চনমালার জন্ম হয়। কিন্তু এত রূপের অধিকারিণীকে সওদাগর শত চেষ্টা করেও সন্ন্যাসীর কথামতো নয় বছর পূর্ণ হতে মাত্র যখন অর্ধদণ্ড বাকী তখনও পাত্রস্থ করতে পারলেন না। এরই মধ্যে ভিক্ষুক বেশে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছয় মাসের এক অন্ধ শিশুকে কাঁধে নিয়ে সওদাগরের সামনে ভিক্ষার জন্য হাজির হলে বাধ্য হয়ে সওদাগর এই ছয়মাস বয়সী অন্ধ শিশুর সঙ্গেই কাঞ্চনমালার বিয়ে দিলেন। মনোকষ্টে কাঞ্চনমালা ঐ অন্ধ শিশু স্বামীসহ বনবাসে গেল। বনবাসে কাঠুরিয়াদের সঙ্গে মিশে কাঠ কাটতে গেলে কাঞ্চনমালার রূপে বন আলোকিত হয়। কাঞ্চনমালার সেই দেহ ঔজ্জ্বল্যের রূপ বর্ণনা স্থান পেয়েছে আলোচ্য চিত্রকল্পে।

চাঁদ সর্বদাই স্নিগ্ধ ও সৌন্দযের প্রতীক। প্রকৃতির নিয়মে সে আকাশেই বিরাজমান। কিন্তু সেই বস্তু যদি হাতের কাছে ধরা দেয় তবে তার সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পায়। কাঞ্চনমালাকে বাগানের সমস্ত কাঠুরিয়ার মাঝে মনে হয় যেন আকাশের সেই চাঁদ স্থান পরিবর্তন করে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। চাঁদের সেই ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য কাঞ্চনমালার উপর আরোপিত হওয়ায় চাঁদের অনুষঙ্গ নিয়ে কাঞ্চনমালার উজ্জ্বল দেহরূপ বর্ণিত হয়েছে এ প্রকৃতি আশ্রয়ী চিত্রকল্পে। কন্যার এমনরূপ দেখে সবাই তাকে বনের লক্ষ্মী ভেবে সম্মান করতে লাগল।

৩১.

জলেতে ভাসিয়া যায় পুন্নমাসীর চান।
কন্যারে দেখিয়া সাধু হারাইল জ্ঞান।
['ভেলুয়া', পূগী ২, ২ : ১৪৭]

শঙ্খপুরের মুরাই সাধুর পুত্র মদন সাধু পিতৃ ইচ্ছায় চৌদ্দডিঙ্গাসহ বাণিজ্য যাত্রাকালে কাঞ্চননগরের ঘাটে উপনীত হলে বিত্তবান বণিক মাণিক সওদাগরের রূপসী কন্যা ভেলুয়াকে পঞ্চ ভাইয়ের বৌ ও দ্বাদশ দাসীসহ স্নানরতা দেখল। মদন সাধুর দর্শন যেন কন্যার চন্দ্রসম মুখকে মেঘে ঢেকে রাখল। কন্যা ভেলুয়া সাধুর দিকে আড় নয়ানে তাকিয়ে তার রূপ দেখে নিল। উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলো। নদীর

জলে স্নানরতা কন্যাকে দেখে মদন সাধুর মনে হলো যেন পূর্ণিমার চাঁদখানা পানিতে ভেসে যাচ্ছে। মদন সাধুর এই প্রতিক্রিয়াই ফুটে উঠেছে আলোচ্য চিত্রকল্পে। স্নানরতা কন্যার দেহরূপের ঔজ্জ্বল্য বর্ণনা করতে গিয়ে এখানে পূর্ণিমার চাঁদের অনুষঙ্গ ব্যবহার করে প্রকৃতি আশ্রয়ী এ চিত্রকল্পটি রচনা করা হয়েছে। চিত্রকল্পটি নায়িকাকে দেখে নায়কের প্রতিক্রিয়া। আকাশের দৃশ্যমান চাঁদকে পানিতে স্থান দিলে পানির সংস্পর্শে তার সৌন্দর্য যেমন আরো বৃদ্ধি পায় ভেলুয়াও তেমনি পানির স্পর্শে আরো বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে মদন সাধুর কাছে। স্বচ্ছ পানি এবং পূর্ণিমার চাঁদ একাকার হয়ে ভেলুয়াকে আরো রূপসী করেছে।

৩২.

কতদূর যাইয়া দেখে চরের উপরে।
চান্দ সুরুজ খইস্যা যেন পরছে বালুর চরে॥
['ভেলুয়া', পূগী ২,২ : ১৮৮]

শঙ্খপুরের মুরাই সাধুর প্রবল বংশ ও আত্মমর্যাদাবোধকে উপেক্ষা করে পুত্র মদনসাধু ভেলুয়াকে নিয়ে পিতৃগৃহে উপস্থিত হলে পিতা কর্তৃক উভয়ে বিতাড়িত হয়ে যার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করে ভেলুয়ার রূপৈশ্বর্যের কারণে সে-ই শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। এক পর্যায়ে উভয়ের জীবন রক্ষার্থে ভেলুয়া তার স্বামী মদন সাধুর সাথে নৌকাযোগে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু চতুর্দিক থেকে তারা শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ল। অবশেষে আত্মঘাতিণী হবার অভিপ্রায়ে ভেলুয়া সাগরে ঝাঁপ দিল। ভেলুয়ার স্বামী মদন সাধু ও স্বামীবন্ধু হিরণসাধুর বোন মেনকা তাকে উদ্ধারের জন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হয়। এরই মধ্যে সমুদ্রে ঝড় উঠলে আক্রমণকারীসহ সবাই অথৈ পানিতে ভাসতে লাগল। ঝড় শেষে এক ধার্মিক সাধুর নৌকা তথায় আসলে নৌকার দাড়ি-মাঝিরা জলে ঝাপ দেয়া দুই কন্যা ভেলুয়া ও মেনকাকে চরের উপরে যেভাবে পড়ে থাকতে দেখল তারই শৈল্পিক বর্ণনা ফুটে উঠেছে আলোচ্য প্রকৃতি আশ্রয়ী চিত্রকল্পটিতে।

ভেলুয়া ও মেনকার রূপ এখানে চন্দ্র ও সূর্য তুল্য। দুটি বিপরীতধর্মী অনুষঙ্গ নিয়ে দুই কন্যার দেহরূপের ঔজ্জ্বল্য বর্ণনায় চিত্রকল্পটি উজ্জ্বল। চন্দ্রের অবস্থান রাতে হলেও আকাশের অন্য সব গ্রহ, নক্ষত্র বা উপগ্রহের মধ্যে তার অবস্থান শ্রেষ্ঠ- বিশেষত সৌন্দর্য বর্ণনার ক্ষেত্রে। একইভাবে সূর্যও আবির্ভূত হয় দিনে। তার অবস্থানও সপ্তবর্ণে বর্ণিল ও আকর্ষণীয়। এখানে বিপরীতমুখী হলেও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে কেউ কারো চেয়ে কম নয়। যদিও সূর্যের আলোই চাঁদকে আলোকিত করে রূপসী করেছে তবু কারো রূপ লোপ পায়নি। রূপবর্ণনায় উভয়ের স্থান স্বীকৃত। আঙ্গিক বিচারে এটি প্রকৃতি-আশ্রয়ী চিত্রকল্প।

৩৩.

চান্দ-সুরজ যেন ঘোড়ায় চরিল।
চাবুক খাইয়া ঘোড়া শণেতে উড়িল॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ২৬]

নদের চাঁদ ও মহুয়ার প্রণয়ে ভীত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হুমরা বিষলক্ষের ছুরি দিয়ে নদের চাঁদকে হত্যার উদ্যোগ নিলে মহুয়ার প্রণয়ের আবেগের কাছে তা ব্যর্থ হয়। ঘোড়ায় চেপে মহুয়া নদের চাঁদের সঙ্গে অজানার উদ্দেশ্যে পলায়ণ করে। উল্লিখিত প্রকৃতি-আশ্রয়ী চিত্রকল্পটিতে ঘোড়ার পিঠে মহুয়া ও নদের চাঁদের অবস্থান চন্দ্র-সূর্যের অনুষঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে। নদের চাঁদ ও মহুয়া নবজীবনের সূচনায় পিতৃ

আলয়ের প্রতিকূল অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে ঘোড়ায় চড়েছে। উভয়ের ঘোড়ায় চড়াকে দৈহিক উজ্জ্বলতা ও রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে চন্দ্র-সূর্যের ঘোড়ায় চড়ার সঙ্গে তুলনা করে ভিন্নতর মাত্রা সংযোজনের মাধ্যমে এখানে চমৎকার চিত্রকল্পের সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩৪.

তার মধ্যে অধুয়া যে দেখিতে কেমন
তারার মধ্যেতে যেন চান্দের কিরণ।
['সুরৎজামাল ও অধুয়া'; পূগী ২,২ : ৪১৬]

সুরৎজামাল ছোট চাচা দুলাল খার চক্রান্তে পিতৃরাজ্য হারিয়ে মাসহ পিতার বন্ধু রাজা দুবরাজের আশ্রয় লাভ করে। দুবরাজ রাজার একমাত্র সুন্দরী কন্যা অধুয়া তাদের আশ্রিত সুরৎজামালকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়। পরবর্তীকালে সুরৎজামাল যখন তাদের আশ্রয় ছেড়ে পিতার দেওয়ানী উদ্ধার করে সেখানে চলে গেল তখন অধুয়া এক দাসীকে দিয়ে প্রেমপত্র পাঠাল সুরৎজামালের কাছে। পত্র পাঠান্তে সুরৎজামাল অধুয়ার দর্শন লাভার্থে তাদের ঘাটে গিয়ে পৌছল। খবর পেয়ে অধুয়াসুন্দরী পাঁচ ভাবী ও দাসীবাদীসহ সজ্জিত হয়ে সুরৎজামালের সাথে দেখা করতে ঘাটে এল। ঘাটে আসা এমনি সজ্জিত কন্যাদের মধ্যে অধুয়াসুন্দরীর অবস্থান প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃতি-আশ্রয়ী এ চিত্রকল্পটিতে। বহু রমণীর মধ্যে অধুয়াকে মনে হচ্ছে চাঁদের কিরণের মতো। আকাশের লক্ষ কোটি তারার মধ্যে যেমন চাঁদকে খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না, সুরত জামালেরও তেমনি রমণীগণের মধ্যে অধুয়াকে পেতে কষ্ট হয়নি। এখানে স্বভাবতই অন্যদের চেয়ে অধুয়ার রূপ শ্রেষ্ঠ। চিত্রকল্পটিতে সব রমণীর মধ্যে অধুয়ার স্থিতি অসংখ্য তারার মধ্যে চাঁদের অনুষঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। ফলে এখানে প্রকৃতি-আশ্রয়ী একটি মূর্ত চিত্রকল্পের মধ্যে অধুয়াসুন্দরীর উজ্জ্বল দেহরূপ ফুটে উঠেছে।

৩৫.

ঘাটেতে উডিয়া ভোলা দিষ্টি করি চায়।
পরীর মতন কৈন্যা যেন ঘাটে দেখা যায়॥
এক চান্নি উঠে যেন আছ্মানর উপরে।
আজু কেন দেখি চান দরেয়ার কিনারে॥
['ভেলুয়া', পূগী ৩, ২ : ১১৫]

নায়িকা ভেলুয়ার ননদিনী বিভলার ঈর্ষাপরায়ণতার কারণে ভেলুয়াকে চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। শাস্তির অংশস্বরূপ তাকে নদী থেকে কলসী ভরে পানি আনতে হতো। একদিন ভরদুপুরে সে একা কলসী নিয়ে নদীরঘাটে গেল পানি আনা ও একই সঙ্গে স্নানের উদ্দেশ্যে। এমনি সময়ে ভোলা সওদাগর বাণিজ্য শেষে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে তথায় উপনীত হলে নদীর ঘাটে পরীসদৃশ কন্যা ভেলুয়াকে দেখে তার রূপশ্রীতে মুগ্ধ হল। তার দৈহিক অবয়ব ও উজ্জ্বলতার বর্ণনাই স্থান পেয়েছে প্রকৃতি-আশ্রয়ী আলোচ্য চিত্রকল্পটিতে।

চাঁদ সম্পর্কে সে জানে যে তা আকাশে শোভা পায়। কিন্তু একই সৌন্দর্যসম্পন্ন অন্য কোনো বস্তুকে কিভাবে সে নদী বা সমুদ্রের কিনারে দেখছে। এখানে ভেলুয়াকে সেই আকাশের চাঁদের সৌন্দর্যের মতোই স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল মনে হয়েছে ভরদুপুরেও। নদীর তীরে চাঁদের সৌন্দর্য স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে বেশি, নদীর পাড়ে ভেলুয়ার রূপ-সৌন্দর্যও যেন তার কাছে অনেক বেশি প্রতীয়মান হয়েছে। তাই এখানে নদীর স্পর্শে ভেলুয়ার উপযুক্ত সৌন্দর্য ও দেহের উজ্জ্বলতার বর্ণনায় চাঁদ এসেছে অনুষঙ্গরূপে।

তারা

অন্ধকার আকাশে তারার অবস্থান উজ্জ্বল। তাই দৈহিক উজ্জ্বলতার বর্ণনায় তারার অনুষঙ্গ এসেছে দু'টি চিত্রকল্পে।

৩৬.

জলের না পদ্মফুল শুকনায় ফুটে রইয়া।
আসমানের তারা ফুটে মঞ্চেতে ভরিয়া॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৫৩]

গাথায় চান্দ বিনোদ শিকারের উদ্দেশ্যে আড়ালিয়া গ্রামের এক পুকুর পাড়ে কদমগাছের নিচে এসে বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এমন সময় সেই পুকুর পাড়ে গ্রামের মোড়লের কন্যা মলুয়া জল ভরতে এসে ঘুমন্ত চান্দ বিনোদকে দেখতে পায়। মলুয়া কলসীতে জল ভরতে গেলে তার শব্দে চান্দ বিনোদের হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গে - চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে মেঘবরণ কন্যা মলুয়া জল নিয়ে যাচ্ছে। মেঘের মতো আঁধার করে আসা কালো চুল তার দেহে লুটিয়ে পড়ছে। তার শুকনা মাথায় সতেজ চুল যেন মহুয়া ফুলের মতো। তার ডাগর ডাগর চোখ একবার দেখলে মন কেড়ে নেয়। কন্যার এমনি অবয়ব ও রূপের ঔজ্জ্বল্য বর্ণনায় আলোচ্য প্রকৃতি-আশ্রয়ী চিত্রকল্পটি পদ্মফুল ও তারার অনুষঙ্গে উজ্জ্বল। কন্যার রূপ দেখে মনে হয় জলে ফোটা পদ্মফুল জলে না ফুটে স্থলে ফুটেছে। একইভাবে আকাশের তারাও যেন মর্তের বুকজুড়ে ফুটে রয়েছে। এখানে রূপসী মলুয়ার উপরে একইসাথে স্থলপদ্ম এবং আকাশের তারকা আরোপ করে চিত্রকল্পের সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩৭.

আসমান হইতে জলে তারা যেন খসে।
জোয়ারিয়া গাঙ্গের ঢেউয়ে সাপল ফুল ভাসে॥
['আন্ধাবন্ধু', পূগী ৪, ২ : ২০৭]

গাথায় রাজকন্যা স্বামীর সংসার সুকৌশলে ত্যাগ করে পুরনো প্রণয়ী অন্ধ বংশীবাদকের কাছে চলে আসে। অন্ধ তাকে স্বামীর সংসারে ফিরে যাবার পরামর্শ দিলেও কন্যার সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত না হওয়ায় অন্ধ নিজেই নদীতে ঝাঁপ দেয়; সেই সঙ্গে প্রণয়ীকে পেতে রাজকন্যাও নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিজ জীবন বিসর্জন দেয়। অন্ধ ও রাজকন্যার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর উভয়ের ভাসমান দেহরূপের উজ্জ্বলতাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে আলোচ্য চিত্রকল্পটি। নায়ক-নায়িকার রূপে তারকার উজ্জ্বলতা দৃষ্ট হওয়ায় মনে হচ্ছে আকাশ থেকে যেন তারকা খসে পানিতে পড়ছে। একই সাথে নদীর জোয়ার - জলের স্রোতে ভেসে যাওয়া শাপলা ফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে নায়ক-নায়িকার যৌবনের পূর্ণতা ও দেহসৌন্দর্যের উজ্জ্বলতাকে। তারকা এবং শাপলা ফুলের সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা উভয়ের দেহে আরোপিত হওয়ায় এটি প্রকৃতি-আশ্রয়ী চিত্রকল্পে পরিণত হয়েছে।

সূর্য

সূর্য তেজোদীপ্তের প্রতীক হলেও এতে সবগুলো রং বিদ্যমান থাকায় দৈহিক উজ্জ্বলতার প্রকাশে সূর্যের অনুষঙ্গ নিয়েও চিত্রকল্প পাওয়া যায়।

৩৮.

চান্দের ছুরত কুমার তোমার কাম-তনু।
মেঘেতে ঢাকিয়া যেমন প্রভাতের ভানু॥
['কাজলরেখা', মৈগী ১, ২ : ৩২৩]

গাথায় এক সন্ন্যাসীপ্রদত্ত শুকপাখীর কথামতো সওদাগর ধনেশ্বর বাণিজ্যে যাবার ছল করে নিজ কন্যা কাজলরেখাকে বনবাস দিতে চললেন। গহীন বনে পৌছে একটা ভাঙ্গা মন্দিরের সিড়িতে তাকে বসিয়ে রেখে পিতা গেলেন পানির খোঁজে। এদিকে কন্যা মন্দিরের মধ্যে বন্দি হয়ে পড়ল। পিতা পানিসহ ফিরে এসে কন্যাকে না পেয়ে ডাকতে থাকলে পরে তিনি বুঝলেন কন্যা মন্দিরে বন্দি। তিনি কন্যার কাছ থেকে জানতে পারলেন মন্দিরের ভিতরে সর্বাঙ্গে সুঁচ ও শেল বিধানো এক মৃতকুমার শুয়ে আছে। পিতা বুঝলেন এই সেই মৃতকুমার যার সাথে কাজলরেখার বিয়ে হবে বলে শুকপাখী জানিয়েছিল। তিনি কন্যাকে বুঝিয়ে ঐ মরা কুমারকে স্বামী হিসাবে বরণ করে নিতে বলে বিদায় নিলেন। ঐ কুমারের রূপ বর্ণনায় এ চিত্রকল্পটি সমৃদ্ধ। সকালের রক্তিম সূর্যকে মেঘে ঢেকে রাখলে যেমন ঐ মেঘের চারপাশ থেকে সূর্যের কিরণ বিচ্ছুরিত হতে চেষ্টা করে, কুমারের দেহ উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্যও যেন তেমনি। প্রভাতের সূর্যকে মেঘে ঢেকে রাখতে পারে না, ক্রমান্বয়ে তার রক্তিমাভা প্রকাশ পায়। সুঁচ বিধানো হলেও কুমারের রূপ অতিশয় চমৎকার। তার সর্বাঙ্গ ছেপে সেই রূপেরই যেন বিচ্ছুরণ ঘটছে। যার প্রকাশ ঘটেছে প্রকৃতি আশ্রয়ী এ চিত্রকল্পটিতে।

আকাশ

আকাশের রং নীল। এই নীল আকাশের অনুষঙ্গ নিয়েও গঠিত হয়েছে একটি চিত্রকল্প।

৩৯.

তার পরে পড়াইল সাড়ী নামে আসমান তারা।
ভূমিতে থইলে যেমন ভুয়ে আসমান পরা॥
['কমলা', মৈগী ১, ২ : ১৬৮]

গাথায় সুন্দরী নায়িকা কমলার সাথে রাজপুত্র প্রদীপকুমারের বিয়ের আয়োজন চলাকালে কন্যা সাজানোয় শাড়ী পড়ানোকে অবলম্বন করে তার রূপবর্ণনায় আলোচ্য চিত্রকল্পটি রচিত। বিয়ের আচারস্বরূপ কন্যার সহচরীরা কন্যাকে মনের মতন করে সাজাচ্ছে। কন্যাকে আসমানতারা নামে যে গাঢ় নীল শাড়ীখানা পড়ানো হয়েছে, সেই শাড়ী পরিহিত অবস্থায় সে যদি ভূমিতে বসে তাহলে মনে হয় যেন পুরো নীল আকাশখানা ভূমিতেই পড়ে আছে।

চিত্রকল্পটিতে শাড়ীর সৌন্দর্য বর্ণনায় কন্যার রূপবর্ণনা একাকার হয়ে গেছে। এখানে কন্যার সারা অঙ্গে নীল শাড়ীর উপর নীল আকাশকে আরোপ করে প্রকৃতি-আশ্রয়ী চিত্রকল্পটির প্রকাশ। ভূমিতে আকাশের অনুষঙ্গরূপে কমলার দেহে আসমানতারা শাড়ীর অবস্থান ফুটে উঠেছে আলোচ্য চিত্রকল্পে। শাড়ীর বর্ণনায় চিত্রকল্পটি পূর্ণ, সেই সাথে এসেছে কন্যার দেহরূপের বর্ণনাও।

বিদ্যুৎচ্ছটা

আকাশে ক্ষণিকের জন্য মেঘে বিজলী চমকিয়ে সবকিছু উজ্জ্বল করে দেয়। এ কারণে দৈহিক উজ্জ্বলতা বর্ণনায় বিজলীর অনুষঙ্গ নিয়ে চিত্রকল্পও রয়েছে।

৪০.

পাল্‌কি হৈতে বাহির হৈল বিজলীর কণা।
ভেলুয়ারে দেখি কাজির হইল ভাবনা॥
['ভেলুয়া', পূগী ৩, ২ : ১৩২]

বাণিজ্য থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে ভোলা সওদাগর নদীর ঘাটে পরীসদৃশ কন্যা ভেলুয়াকে দেখে তার রূপশ্রীতে মুগ্ধ হয়ে তাকে অপহরণ করে নিজ বাড়িতে এনে যৌবন প্রার্থনা করে। কিন্তু নিজ বুদ্ধি বলে তার কাছ থেকে ভেলুয়া সময় চেয়ে নেয়। এর মধ্যে ভেলুয়ার স্বামী আমির সাধু ঘুরতে ঘুরতে ভোলা সওদাগরের গৃহে বন্দি ভেলুয়াকে খুঁজে পায়। আমির সাধু মুনাপ কাজীর কাছে বিস্তারিত ঘটনা জানিয়ে ভোলার বিরুদ্ধে নালিশ করলে দুষ্ট কাজী সে সুযোগ গ্রহণ করে ভেলুয়াকে তার কাছে আনার নির্দেশ দিয়ে জানায় ভেলুয়ার সামনেই সে তাদের যথাযথ বিচার করবে। ভেলুয়াকে পালকিতে করে ভোলা সওদাগর কাজীর ঘরে হাজির করে।

পাল্‌কি থেকে ভেলুয়ার নির্গমণে মুনাপ কাজীর মনে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার শৈল্পিক প্রকাশ দেখা যায় এ-উপমাত্মক চিত্রকল্পটিতে। পালকি থেকে ভেলুয়ার নামাকে কাজীর কাছে বিদ্যুৎচ্ছটা বা বিজলীর কণার মতো মনে হলো। মেঘের বিজলী ক্ষণিকের জন্য মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে যায়। ভেলুয়া যেন তেমন একটি কণা যে পালকির দরজা থেকে বের হতেই কাজীর চোখে আঘাত হেনেছে। এ প্রসঙ্গে *বাংলা কাব্যে উপমালোক* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "'বিজলীর কণায়' চকিত রূপবিন্দুটুকু ভেলুয়ার শরীরে স্থির অবস্থান পাওয়ার আগেই কাজীর লোভে গ্রস্ত হল" (শিবচন্দ্র লাহিড়ী ১৯৬৫:৪১৫)। চিত্রকল্পটির অন্তরালে আমরা তৎকালীন সমাজে কাজী চরিত্রের পরিচয় পাই- বয়স নব্বই হলেও নারীসঙ্গলাভে তার অনীহা নেই।

৪১.

মেঘের অঙ্গেতে যেমন গো বিজলীর ঝলা
চলিছে সোণার মৃগ গো বন করি উজলা॥
['চন্দ্রাবতীর রামায়ণ', পূগী ৪, ২ : ২৫৭]

গাথার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি প্রতীকী হরিণের রূপবর্ণনায় অনুষঙ্গরূপে এসেছে মেঘের বিজলীর ক্ষণিক ঔজ্জ্বল্যের কথা। সীতার বনবাসকালীন বারমাসী বর্ণনায় একদিন পঞ্চবটী বনে রাম-সীতা লতাপাতার কুটির তুলে বসবাস শুরু করলেন। দেবর লক্ষ্মণ থাকলেন তাদের পাহারায় রত। এমন সময় বন উজ্জ্বল করে একটি হরিণ চলে যাচ্ছিল। এই প্রতীকী হরিণের সৌন্দর্য বর্ণনাই স্থান পেয়েছে এ চিত্রকল্পটিতে। হরিণটি যেভাবে বনপথে চলছিল তাতে মনে হচ্ছিল মেঘে বিজলী যেমন মুহূর্তের জন্য ঝলক মেরে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে যায়, হরিণটিও যেন তেমনি ঝলক মেরে গহীন বনে হারিয়ে যাচ্ছে। সীতার অনুরোধে রাম ছুটলেন হরিণের পিছু। ক্ষণিক বাদে তিনি রাক্ষসের কবলে পড়লে চিৎকার শুনে ভাই লক্ষ্মণ সীতাকে একা ফেলে ছুটে গেলেন তাকে উদ্ধার করতে। এ সুযোগে যোগীবেশে লঙ্কাপতি এসে একাকী সীতাকে গড়ুর

রথে চড়িয়ে লঙ্কাপুরীতে হরণ করে নিয়ে গেল। সীতা হরণের পিছনে যেহেতু হরিণটিই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল সেহেতু হরিণটি হয়ে উঠেছে সীতা হরণের প্রতীক।

স্বর্ণ

স্বর্ণ মূল্যবান ও উজ্জ্বল ধাতু। তাই দৈহিক উজ্জ্বলতা প্রকাশে স্বর্ণের অনুষঙ্গ নিয়ে চিত্রকল্প পাওয়া যায়।

৪২.

সোণা গলাইয়া যেন বানাইছে পুতুলা।
গলায় দিয়াছে দিব্য রতনের মালা॥
['কাঞ্চনমালা', পূগী ২, ২ : ৮৬]

গাথায় সাধু সওদাগর পত্নীকে সন্ন্যাসী প্রদত্ত ফল খাওয়ালে স্বরূপা কন্যা কাঞ্চনমালার জন্ম হয়। দেখতে দেখতে কাঞ্চনমালার বয়স নয় বছর হতে চলল। এই নবমবর্ষীয়া কন্যার উজ্জ্বল দেহরূপের বর্ণনাই স্থান পেয়েছে আলোচ্য বস্তু-আশ্রয়ী চিত্রকল্পটিতে। তার সমস্ত দেহ দেখে মনে হয় সুনিপুণ হাতে তৈরি একটি পুতুল যার গঠন উপাদান অতি মূল্যবান ও চকচকে বস্তু সেই সোনা। কন্যার গলায়ও শোভা পাচ্ছে মহা মূল্যবান রতনের মালা। এখানে মানবদেহের উপরে উজ্জ্বল সোনার পুতুল আরোপ করায় কাঞ্চনমালার শারীরিক গঠন একটি চিত্রকল্পে রূপ পেয়েছে। চিত্রকল্পটিতে কাঞ্চনমালার রূপ বর্ণনায় অনুষঙ্গরূপে এসেছে সোনার পুতুল।

৪৩.

ঘরে আছে লক্ষ্মী বউ সোণার পত্তিমা।
সুরঙ্গিণী নাম যে তার রূপের নাহি সীমা॥
['কমল সদাগরের পালা', পূগী ৩, ২ : ২২৪]

পালায় কমল সদাগরের প্রথমা স্ত্রী সুরঙ্গিণী রূপে লক্ষ্মী, গুণে সে সরস্বতী। আলোচ্য চিত্রকল্পটিতে সুরঙ্গিণীর সেই দেহরূপের উজ্জ্বলতা বর্ণনায় অনুষঙ্গরূপে সোনার প্রতিমার আগমন ঘটেছে। সংসারে সে সোনানির্মিত উজ্জ্বল প্রতিমাতূল্য। প্রতিমা বা প্রতিমূর্তি যেমন নিখুঁত ও সর্বদা শ্রদ্ধাশীল, কমল সওদাগরের স্ত্রী সুরঙ্গিণীও তেমনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্রী।

৪৪.

সোনার পালঙ্কে কন্যা ভালা শুইয়া নিদ্রা যায় রে।
সোণার মন্দির দেখে কন্যার রূপে যুড়ে॥
['মুকুটরায়', পূগী ৪, ২ : ১৩৫]

শিলুই রাজার একমাত্র সুদর্শন পুত্র মুকুটরায়ের বয়স বিশ বছর পূর্ণ হলে পিতা তার বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধানে চতুর্দিকে লস্কর পাঠালেন। তাদেরই মধ্যে নির্বাচিত এক কন্যার উজ্জ্বল দেহরূপ বর্ণনায় এ চিত্রকল্পটির সৃষ্টি। কন্যার রূপ যেন উজ্জ্বল সোনার মন্দিরের পবিত্রতায় বিভূষিত। অর্থাৎ এখানে কন্যার রূপ সুষমার অনুষঙ্গ হয়েছে সোনার মন্দিরের পবিত্রতা। রূপ মন্দিরের ব্যবহার এখানে বস্তু-আশ্রয়ী হয়ে সোনার মন্দিরের চিত্রকল্প সৃষ্টি হয়েছে।

আগুন

উজ্জ্বলতার গুণে আগুন দূর থেকে দৃশ্যমান বলে দেহের উজ্জ্বলতা প্রকাশে আগুনের ব্যবহার দেখা যায়।

৪৫.

রূপেতে রূপসী কন্যা অগ্নি যেমন জ্বলে।
রূপের তুলনা তার সংসারে না মিলে॥
['ভেলুয়া', পূগী ২, ২ : ১৪৪]

নায়িকা ভেলুয়া কাঞ্চননগরের বিত্তবান বণিক মাণিক সওদাগরের রূপসী কন্যা। সেই সপ্তদশী কন্যা ভেলুয়ার উজ্জ্বল দেহরূপের বর্ণনা স্থান পেয়েছে অগ্নি-আশ্রয়ী এ চিত্রকল্পটিতে। ভেলুয়ার রূপ এখানে যেন জ্বলন্ত অগ্নি। অগ্নিকে যেমন স্পর্শ করা যায় না, তেমনি ভেলুয়াকেও যেন সবার পক্ষে স্পর্শ করা কঠিন। এখানে তার দৈহিক উজ্জ্বলতাকে অগ্নির অনুষঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে। তার এমন রূপের তুলনা সংসারে বিরল। দীর্ঘাঙ্গী চুলের অধিকারিণী কন্যার রূপে কাঞ্চননগর উজ্জ্বল।

সর্পমণি

উজ্জ্বল ও মহামূল্যবান রত্ন হিসাবে উজ্জ্বল দেহরূপ বর্ণনায় স্বর্পমণির ব্যবহার পাওয়া যায় কোনো কোনো চিত্রকল্পে।

৪৬.

দেখিতে সুন্দর কন্যা বনের হরিণী।
সপ্পের মাথায় যেন জ্বলে দিব্য মণি॥
['পীরবাতাসী', পূগী ৪, ২ : ৩৪৬]

গাথার নায়ক বিনাথ আশ্রয়দাতা চান্দ মোড়লের সাথে নৌকায় বাণিজ্যযাত্রাকালে ঝড়ে পড়ে ভাসতে ভাসতে কংস নদীর তীরে গহীন জঙ্গলে বসবাসকারী সুমাই ওঝার পালিতা কন্যা বাতাসীর নজরে পড়ে। ওঝার সঙ্গে বনে বনেই থাকে বাতাসী। তার উজ্জ্বল দেহরূপের বর্ণনায় সর্পমণির অনুষঙ্গ নিয়ে এ চিত্রকল্পটি সৃষ্টি।

বনে বাতাসীর অবস্থান বন্য হরিণীর মতোই যে সর্বদা চঞ্চল ও ভীরুতার সাথে পদনিক্ষেপ করে। সর্পমণি উজ্জ্বল ও মহামূল্যবান রত্ন। এই রত্ন নিয়ে সে যেমন গহীন বনে পরিভ্রমণ করে বাতাসীও যেন সর্পের মাথার ঐ মণির মতো উজ্জ্বলরূপ ধারণ করে বনগামিনী। নায়িকার সমগ্র রূপকেই এ চিত্রকল্পটিতে সর্পমণির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রূপে-গুণে অতুলনীয়া বাতাসী প্রকৃতির কোলে লালিতা। তার রূপবর্ণনায় *পূর্ব পাকিস্তানের লোকগীতিকা* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "তার চিকন ঠোঁটের লালিমায় প্রভাতের অনুণোদয়ের প্রশান্তি আর হরিণ-চোখের নীলিমায় বনের শ্যামল স্নিগ্ধ মায়ার অঞ্জন লেগে' আছে" (পাকিস্তান পাবলিকেশান্স ১৯৬২ : ১৫০)।

নদীর ঢেউ

নদীর ঢেউ যেমন অবাধে ছুটে চলে, তেমনি নায়িকার যৌবনের সঙ্গে নদী বা ঢেউয়ের তুলনার চিত্রকল্পও গীতিকায় পাওয়া যায়।

৪৭.

আষাঢ় মাসে দীঘলা পান্‌সীরে নয়া জলে ভাসে।
সেহি মত সোনাইর যৈবন খেলায় বাতাসে॥
['দেওয়ান ভাবনা', মৈগী ১, ২ : ১৭৬]

নায়িকা দ্বাদশবর্ষীয়া পিতৃহীন সুনাই পরমা সুন্দরী। তার রূপবর্ণনায় এ চিত্রকল্পটির অবতারণা। আষাঢ়ের ভরা জোয়ারে স্রোতের পানিতে যেভাবে নৌকার অবাধ বিচরণ, অর্থাৎ স্রোতের খোলা পানিতে নৌকা যেমন লাগামহীনভাবে ভেসে চলে তেমনি সোনাইর যৌবনরূপ বাতাসে ভেসে চলছে। সুনাই মাত্র যৌবনে পা দিয়েছে, তার সে নবযৌবনের গতিময়তা প্রকাশ পেয়েছে আষাঢ়ের নয়া জলের উপমার আশ্রয় নিয়ে রচিত এ-উপমাত্মক চিত্রকল্পে।

চিত্রকল্পটিতে নয়া জলে পূর্ণ নদীর সঙ্গে যুবতী নারীদেহের নবযৌবনের তুলনাটি পশ্চাতে রেখে নয়াজলে ভাসমান নৌকার গতিময়তার সঙ্গে নবযৌবনপ্রাপ্ত বালিকা সুনাইর চপল চঞ্চল দিকটির সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে।

আঙ্গিক বিচারে আলোচ্য চিত্রকল্পটি গতির অনুষঙ্গবহ প্রকৃতি-আশ্রয়ী চিত্রকল্প। এ-প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলো স্মরণ করা যায়:

ক) 'দীঘলা পানশী' দীর্ঘাঙ্গী নারীদেহের কথা। 'নয়া জল' নতুন যৌবন। 'যৈবন খেলায় বাতাসে' কথায় রূপের ক্রীড়াশীলতা আগের ছত্রটির উপমানে আবেগের দোলা দিয়েছে" (শিবচন্দ্র লাহিড়ী, ১৯৬৫:৪১৩)।

খ) "কানায় কানায় পূর্ণ নদীজলে মৃদুমন্দ বাতাসে যে তরঙ্গ-ছন্দ-চাঞ্চল্য-আনন্দপূর্ণ ধ্বনিময়তার সৃষ্টি করে, যৌবনোদগমে যুবতী-শরীরেও যেন অনুরূপ শিহরণ পরিলক্ষিত হয়" (সৈয়দ আজিজুল হক, ১৯৯০:৩৮০)।

গ) "দীর্ঘাঙ্গী নারীদেহে 'দীঘলা পানশী'র সাদৃশ্য গহীন গাঙের চিত্রভাবনায় নারীর নব-যৌবনের অফুরন্ত ঐশ্বর্য দ্যোতিত করছে" (শিখা দত্ত, ২০০২:২৫)।

৪৮.

খরদর ঢেউয়ের নদীরে তাতে যৈবন তরী।
এমন কালে ছাইরা গেলে কে অইব কাণ্ডারী
বন্ধু যাইওনা রে॥
['আয়না বিবি', পূগী ৩, ২ : ২০৭]

গাথায় নায়ক মামুদ উজ্জ্যাল স্ত্রী আয়নাকে গৃহে রেখে ছয়মাসের জন্য বাণিজ্যযাত্রা করার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু নবপরিণীতা স্ত্রী আয়না স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতি মেনে নিতে পারবে কিনা তা নিয়ে সে সংশয়ে পড়ে। একবার ভাবে ভরা যৌবনে স্ত্রীকে একলা রেখে যাওয়া তার অনুচিত। স্বামীর উদ্দেশ্যে নায়িকা আয়নার দেহরূপ নির্ভর আকুতি স্থান পেয়েছে এ-বস্তু আশ্রয়ী চিত্রকল্পটিতে।

আয়নার নারীদেহ যেন খরস্রোতা নদী, আর যৌবন যেন ঐ নদীতে চলমান নৌকা। এমনি যৌবনতরীতে স্বামী নামক কাণ্ডারী না থাকলে তা যেন বৃথা হয়ে যাবে। তাই আয়নার অনুরোধ সে যেন তাকে একা ফেলে বাণিজ্যে না যায়।

নদীস্রোত ও নৌকার উল্লেখ থাকায় এটি হয়ে উঠেছে গতির অনুষঙ্গবহ চিত্রকল্প।

পৌরাণিক

পৌরাণিক চরিত্র ও সুন্দর রূপ হিসাবে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকের অনুষঙ্গবহ চিত্রকল্পও বিরল নয়।

৪৯.

দেখিতে সোনার নাগর গো চান্দের সমান।
সুবর্ণ কার্ত্তিক যেমন গো হাতে ধনুকবান॥
['দেওয়ান ভাবনা', মৈগী ১, ২ : ১৭৮]

গাথার নায়ক জমিদারপুত্র মাধব দেখতে খুবই সুন্দর। চিত্রকল্পটি তার রূপবর্ণনায় উদ্ভাসিত। চন্দ্রসদৃশ মাধবকে হাতে শরসহ মনে হয় যেন স্বর্ণবর্ণ সেই কার্ত্তিকের মতো যার হাতে সদা ধনুকবান থাকে। অর্থাৎ এ চিত্রকল্পটি দেব সেনাপতি কার্ত্তিকের অনুষঙ্গে গাথার নায়ক মাধবের রূপ বর্ণনা প্রকাশ পেয়েছে। দেব সেনাপতি কার্ত্তিক যেমন রূপবান, সে সর্বদা যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকে মাধবও যেন তেমনি। আঙ্গিক বিচারে এটি পুরাণাশ্রয়ী চিত্রকল্প।

মানসিক অবস্থা বর্ণনাত্মক চিত্রকল্প

গীতিকার মানসিক অবস্থা বর্ণনাত্মক চিত্রকল্পগুলোতে কাহিনীর ঘাত-প্রতিঘাত কিংবা প্রেম প্রস্তাব নিবেদনে অথবা বিপর্যস্ত অবস্থার বর্ণনায় নায়ক বা নায়িকার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রের মানসিক অবস্থাও ফুটে উঠেছে। এ-ধরনের অধিকাংশ চিত্রকল্পেই অনুষঙ্গ হিসাবে এসেছে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান ও বস্তু। কিছু চিত্রকল্পে রয়েছে আগুন ও শূন্যতার ব্যবহার।

৫০.

কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি॥
['মহুয়া', মৈগী ১, ২ : ১২]

'মহুয়া' গাথায় প্রাপ্ত মানসিক অবস্থা বর্ণনাত্মক দুটি চিত্রকল্পই প্রকৃতি-আশ্রয়ী। গাথায় ব্রাহ্মণ কুমার নদের চাঁদ বেদকন্যা মহুয়ার প্রণয়প্রার্থী। এক পর্যায়ে নদের চাঁদ মহুয়াকে তার প্রণয় প্রস্তাব দিলে মহুয়া কপটক্রোধে তা প্রত্যাখান করে। সরাসরি প্রণয় নিবেদনের নির্লজ্জতার জন্য নদের চাঁদকে জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে বললে প্রেমিকের সপ্রতিভ উত্তর পাই এ রূপকাত্মক চিত্রকল্পটিতে।

এখানে মহুয়ার যৌবনকে গভীর নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যে, যৌবন-নদী পুরুষের আত্ম বিসর্জনের যথার্থ স্থান হতে পারে। এখানে নায়িকা মহুয়া যদি 'গহীন গাঙ্' হতে রাজী থাকে শুধু তাহলেই নদ্যার ঠাকুর সে গাঙে আত্মসমাহিত হতে পারে। যেহেতু নদ্যার চাঁদ মহুয়ার প্রেমে নিমজ্জিত তাই তার আর

লৌকিক মৃত্যুর অর্থহীন অভিনয় করে লাভ নেই, মহুয়ার মধ্যেই তার সকল অস্তিত্ব বিলুপ্ত হোক। নদ্যার ঠাকুরের এমনি বাসনাকে রোমান্টিক কবি কল্পনার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে আখ্যা দেয়া যায়। চিত্রকল্পটি সম্পর্কে *ময়মনসিংহ গীতিকায় নারী চরিত্রের স্বরূপ* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "এখানে নায়িকা নদী-নদীর জল কলস-দড়ির সমন্বয়ে নদীমাতৃক পূর্ববাংলার পল্লীজীবনকেন্দ্রিক বস্তুনিষ্ঠ প্রেমের স্বপ্ন যেমন দেখেছে-তেমনি নায়ক তার হৃদয় উপচানো প্রেম-নিষ্ঠায় আচ্ছন্ন হয়ে কল্পনায় প্রিয়াকে জল ভরা গাঙ্গে রূপান্তরিত করে তাতে ডুবে মরার বাসনায় পরিতৃপ্ত হতে চেয়েছে" (মোঃ শহীদুর রহমান ১৯৯৮:৬৭)।

নায়কের মানসিক অবস্থা বর্ণনায় এটি একটি প্রকৃতি-আশ্রয়ী রূপকাত্মক চিত্রকল্প। মহুয়ার প্রতি নদ্যার ঠাকুরের গভীর প্রেমাসক্তি যেমন এক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি মহুয়ার কৃত্রিম ভর্ৎসনার উপযুক্ত জবাবও হয়ে উঠেছে নদ্যার চাঁদের বক্তব্য যা শিল্পসার্থক। প্রেমিকার কাছে আত্মনিবেদনের জন্য এমন ধরনের প্রাকৃতিক চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনাভিব্যক্তি কেবল প্রণয়মূলক গীতিকায়ই সম্ভব। চিত্রকল্পটিতে নায়কের মানসিক অবস্থার একটি চমৎকার রোমান্টিক দিক উপস্থাপিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়বিচারে এটি একই সাথে দর্শন ও ত্বগেন্দ্রিয়-নির্ভর চিত্রকল্প।

৫১.

বায়েতে হেলিয়া যেমন লতা পড়ে ঢলি।
নদ্যার চান্দের কান্ধে কন্যা পইরা গেল এলি॥
['মহুয়া,' মৈগী ১,২:৩৮]

দীর্ঘ প্রতিকূলতা অতিক্রম করে নায়িকা মহুয়ার বিচক্ষণতায় একাধিকবার প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে নায়ক নদের চাঁদ দিন কাটাচ্ছিল জনহীন বনমধ্যে বনদম্পতির ন্যায়। কিন্তু তাও স্থায়ী হয়না। বেদের দল তাদের সন্ধান লাভ করে। একদিন নদের চাঁদ সন্ধ্যাবেলা মহুয়াকে ক্রোড়ে নিয়ে নিরালে বনমধ্যে বসেছিল। এমন সময় কাছেই নদীতে বেদের দলের বাঁশীর শব্দে মহুয়া আনমনা ও বিচলিত হয়ে পড়ল। পালং সইর সতর্ক সংকেত শুনে মহুয়ার মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় প্রকৃতি-আশ্রয়ী এ চিত্রকল্পটিতে। জীবননাশের গভীর আশংকায় মহুয়া নদের চাঁদের কাধে এলিয়ে পড়ে, যেমন করে বাতাসের বেগে লতা গাছের সঙ্গে ঢলে পড়ে।

৫২.

বাপ নাই ভাই নাইগো একেলা জননী।
কর্ম্মদোষে হইলা সুনাইগো জনম দুঃখিনী॥
পারাত নাই পরতিবাসীরে একলা থাকে ঘরে।
অভাগী মায়ের দুঃখুগো জ্বল্যা পুড়্যা মরে॥
বিরক্ষ মইরা গেলে যেমুন গো ঝুইরা পড়ে লতা।
লতা যদি শুক্যা গেলগো ঝরে পুষ্প পাতা॥
['দেওয়ান ভাবনা', মৈগী ১,২:১৭৩-১৭৪]

গাথায় কৈশোরে পিতৃহীন বালিকা সুনাই নিরাপত্তাহীনতার কারণে মাতুলালয়ে আশ্রিতা। দশ বছর বয়সে তার বাবার অকালমৃত্যু ঘটে। কোনো ভাইও নেই যে সুনাইর অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবে। এমনকি পাড়া-প্রতিবেশীও অনুপস্থিত। এমনি অবস্থায় সুনাইর বিধবা মার মানসিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে

উপরিউক্ত চিত্রকল্পটিতে। শোকে ও মেয়ের চিন্তায় দিন দিন তার শরীর মন ভেঙ্গে পড়তে লাগল। মূল বৃক্ষকে আশ্রয় করে যে লতার অস্তিত্ব, সেই বৃক্ষের মৃত্যুতে লতারও অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। একই সাথে লতার শুকনা দেহ থেকে ফুল ও পাতার ঝরে পড়াও তখন স্বাভাবিক হয়ে উঠে। দৈনন্দিন জীবনাভিজ্ঞতা থেকে আহৃত এ উপমাকে সুনাইর নিঃসঙ্গ বিধবা মায়ের জীবনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে প্রকৃতি-আশ্রয়ী এ উপমাত্মক চিত্রকল্পে। *ময়মনসিংহের গীতিকা: জীবনধর্ম ও কাব্য মূল্য* গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "সাধারণ উপমায় উপমান-চিত্রটি হতো একতলবিশিষ্ট, কিন্তু এখানে দ্বিতলবিশিষ্ট হয়ে ত্রিমাত্রিকতা লাভ করেছে" (সৈয়দ আজিজুল হক ১৯৯০:৩৭৮)।

৫৩.

এহি কথা চম্পাপুতি কন্যা যইখনে শুনিল।
বিরক্ষ ছাড়া কাউলীর লতা বিছাইয়া পড়িল॥
['ভারইয়া রাজার কাহিনী', পূগী ৪, ২ : ১৬৯]

তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে বিজয়ী ভারইয়া রাজা পরাজিত বীরসিংহ-পুত্রের সঙ্গে নিজ কন্যার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। বন্দিত্ব মোচনের জন্য রাজা বীরসিংহ ভারইয়া রাজার কন্যা চম্পাবতীকে গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি ছিল নিতান্ত কূট কৌশল এবং তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন সে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দ্বিতীয়বার ভারইয়া রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে পুত্র দুধরাজকে পাঠায়। তবে এবারও তন্ত্রমন্ত্রের কাছে তার পরাজয় ঘটল, তিনি বন্দি হন। দুধরাজের মৃত্যুদণ্ড আসন্ন, বন্দি অবস্থায় তার বুকে বাইশ মণি পাথর চাপা দিয়ে শাস্তির মাত্রা আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে - ধাইর কাছে রাজকুমারের এ-বিপদের কথা শুনে কুমারী অস্থির হয়ে উঠে। তার এ অস্থির চিত্তের সার্বিক পরিচয় ফুটে উঠেছে এ প্রকৃতি-আশ্রয়ী চিত্রকল্পটিতে।

ময়মনসিংহের গীতিকা: জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য গ্রন্থে বলা হয়েছে, "পিতৃদত্ত প্রতিশ্রুতিকে স্বীয় জীবনে গ্রহণ করে স্বপ্নে উল্লসিত রাজকন্যা চম্পাবতী, যাকে স্বামী হিসেবে বরণ করেছে তার কষ্টে সে যে আন্দোলিত হবে - সেটাই স্বাভাবিক" (সৈয়দ আজিজুল হক ১৯৯০:২৮৮)। দুধরাজের ভাবী শ্বশুর এখন স্বীয় জামাতাকে বন্দি করে শাস্তি দিচ্ছে এ সংবাদ নিতান্তই মর্মস্পর্শী। ফলে চম্পাবতী যেন বৃন্তচ্যুত পুষ্প, পাতা বা লতার মতো খসে পড়ল। অর্থাৎ লতা যেমন প্রবল বাতাসে গাছ থেকে ভূমিতে পতিত হয়, চম্পাবতীর অবস্থাও তেমনি।

৫৪.

উমর খাঁর কান্দনেতে নদী নালা ভাসে।
আসমান হইতে সূরুষ্ চান্দ যেমন খসে॥
['ফিরোজ খাঁ দেওয়ান', পূগী ২, ২ : ৪৭৬]

প্রকৃতির দুটি বিপরীতমুখী উপদান নিয়ে সৃষ্ট এ চিত্রকল্পে এক পর্যুদস্ত পিতার মানসিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। পালায় ঈশা খাঁর বংশধর ফিরোজ খাঁ দেওয়ান কর্তৃক পার্শ্ববর্তী কেল্লাতাজপুরের দেওয়ান উমর খাঁর কন্যা সখিনা সুন্দরীকে ভালোবেসে বিয়ে করার অভিপ্রায় প্রেরিত প্রস্তাব প্রত্যাখাত হলে ফিরোজ খাঁ সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে উমরকে পরাজিত করে সখিনা বিবিকে বন্দি করে জঙ্গলবাড়ীতে এনে বিয়ে করেন। পরাজিত উমর খাঁ দিল্লীর বাদশাহের কাছে এ ব্যাপারে নালিশ দিলে বাদশাহ ফিরোজ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ঘোষণা করে আহত অবস্থায় তাকে বন্দি করেন। সখিনা বন্দি স্বামীকে উদ্ধারকল্পে পুরুষের ছদ্মবেশে নিজ পিতা ও দিল্লীর বাদশাহর সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে উমরের কেল্লাতাজপুর ধ্বংস করে দেন। কিন্তু যুদ্ধের মাঠেই সে জানতে পারল যে তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে। পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য কঠোর হৃদয় যার, তার মনের কোমলতা এমন যে স্বামীর আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত চির-বিচ্ছেদলিপি পাঠ করে যুদ্ধসজ্জারত অবস্থায়ই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ভূলুণ্ঠিত ও মৃত্যুমুখে পতিত হলো। কাহিনীটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে সুতীব্র ট্র্যাজিক রসে। আর এ ট্রাজিক রসকে ঘনীভূত করেছে পিতা উমর খাঁয়ের বিলাপোক্তি। তিনি শোকে ভেঙ্গে পড়লেন নিজ কন্যার জন্য। পিতার এ আর্তি ফুটে উঠেছে এ চিত্রকল্পটিতে। *গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য* গ্রন্থে এর বর্ণনা, "কুল মর্যাদার অহংকারে যে উমর খাঁ কন্যার অন্তরের অন্দরমহলের সংবাদ নেননি, তিনিই সখিনার মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে তাঁর ভুল বুঝতে পেরে আর্তি করেছেন" (বরুণ কুমার চক্রবর্তী ১৯৯৩:২৫৩)। কাহিনীর শেষে সখিনার মৃত্যুর পর সে যখন ফিরোজ খাঁর প্রতি সখিনার প্রণয়বাসনার কথা জানতে পারে, তখনই তার মনে অনুশোচনার সৃষ্টি হয়। কন্যার মৃত্যুতে উমর খাঁ উপলব্ধি করলেন অর্থহীন কুলগৌরবে তিনি কন্যার ব্যক্তিগত আশা-আকাঙক্ষাকে অস্বীকার করে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন। আকাশ থেকে চন্দ্র-সূর্য খসে পড়লে ধরণীর যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা হয় উমর খাঁর মনের অবস্থাও তেমনি। তিনি প্রবল কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। এই কান্নার প্রকাশে চন্দ্র-সূর্যের খসে পড়ার অনুষঙ্গ তথা ধরণীর রূপ পরিবর্তন যেন কন্যার অনুপস্থিতিতে পিতার মানসিক অবস্থারই পরিবর্তন, যার প্রকাশ উক্ত চিত্রকল্পে।

৫৫.

হাটুতে পাতিয়া মাথা চিন্তে বিনোদ ঘরে।
হারণা পড়িল যেমন বাঘের কামরে॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৮৫]

নায়ক চান্দবিনোদের নববিবাহিতা স্ত্রী মলুয়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে কাজী তাকে স্ত্রী হিসাবে পেতে চায়। নেতাই কুটনীকে দিয়ে এ প্রস্তাব পাঠালে মলুয়া প্রত্যাখান করে। এতে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে কাজী চান্দ বিনোদের উপর একাধিকবার শাস্তিমূলক পরোয়ানা জারি করে। এর মধ্যে নেতাই কুটনীকে দিয়ে কাজী পুনরায় মলুয়াকে প্রস্তাব পাঠালে আবারও তা প্রত্যাখ্যাত হয়। ফলে কাজীর প্রতিশোধস্পৃহা বেড়ে যায়। এবার কাজী দ্বিতীয়বারের মতো দেওয়ানের মাধ্যমে বিনোদের ঘরে সুন্দর এক পরীর মতো নারী থাকার কারণে পরোয়ানা জারী করে জানায় যে এক সপ্তাহের মধ্যে ঐ নারীকে দেওয়ানের কাছে সমর্পণ করতে না পারলে চান্দ বিনোদের মৃত্যুদণ্ড হবে। এমনি পরোয়ানায় উভয়ের জীবনাশঙ্কায় চান্দ বিনোদের চরম বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে উপরিউক্ত চিত্রকল্পটিতে। এখানে কাজী বা দেওয়ানকে বাঘের হিংস্রতার প্রতীকে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ বাঘ যখন হরিণ শিকার ধরে তখন হরিণের যেমন অবস্থা, কাজী এবং দেওয়ানের পরোয়ানার কারণে চান্দবিনোদেরও তেমনি অবস্থা।

৫৬.

দেওয়ানে দেখিয়া মলুয়া বড় ভয় পাইল।
বাঘের কামড়ে যেন হরিণা পড়িল॥
['মলুয়া', মৈগী ১,২: ৮৯]

পূর্বের ঘটনার ক্রমধারায় এক সপ্তাহের মধ্যে চান্দ বিনোদ দেওয়ান জাহাঙ্গীরের হুকুম পালন না করায় বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড হলো। মলুয়াকেও বন্দি করে আনা হয় দেওয়ান জাহাঙ্গীরের প্রাসাদে। জ্যান্ত কবর দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে চান্দ বিনোদকে নিরলইক্ষার চরে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু মলুয়া গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তার পাঁচ ভাইয়ের সহায়তায় স্বামীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাল। দেওয়ানের প্রাসাদে বন্দি অবস্থায় দেওয়ান তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মিথ্যা ব্রতের কথা বলে তিন মাসের সময় চেয়ে নেয় সে দেওয়ানের কাছ থেকে। ক্রমে তিনমাস গত হলে দেওয়ান মলুয়ার কক্ষে যায় প্রিয়-সান্নিধ্য লাভের জন্য। এ অবস্থায় দেওয়ানকে দেখে মলুয়ার মানসিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে উপরের চিত্রকল্পে।

৫৭.

এন্নিকালে ভোলারে দেখি বড় ভয় পাইল।
বাঘের কামড়ে যেন হরিণী পড়িল॥
['ভেলুয়া', পূগী ৩, ২ : ১১৯]

'ভেলুয়া' গাথায় নায়ক আমির সাধু নিজ খালাত বোন ভেলুয়াকে বিয়ে করে শাফলাপুর বন্দরে ফিরল। পরে আমির সাধুর দুষ্ট ও ঈর্ষাপরায়ণ বোন বিভলার প্ররোচনায় আমির বাণিজ্যযাত্রা করতে বাধ্য হয়। এই সুযোগে একাকী ভেলুয়ার চরিত্রে নানারকম দোষারোপ করে তার ননদিনী বিভলা তাকে নানা নির্যাতনের সম্মুখীন করে। শাস্তির অংশস্বরূপ তাকে নদী থেকে কলসী ভরে পানি আনতে হতো। একদিন ভরদুপুরে স্নানশেষে ঘাটে উঠে সে যখন তার মাথাভর্তি চুল শুকাতে দিল, তখন কাউলী নগরের ভোলা সওদাগর বাণিজ্য শেষে ফেরার পথে নদীর ঘাটে পরীসদৃশ কন্যা ভেলুয়াকে দেখে তার রূপশ্রীতে মুগ্ধ হল। সে মাঝিমাল্লাসহ তাকে অপহরণ করে নৌকায় উঠিয়ে আমির সাধুর মিথ্যা মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয় এবং গভীর রাতে সে ভেলুয়ার কাছে যায় তার সুখসঙ্গ লাভের জন্য।

ভোলা সদাগরকে দেখে ভেলুয়ার মানসিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে বাঘের আক্রমণে পড়া ভীতু হরিণীর অনুষঙ্গে উপরিউক্ত চিত্রকল্পে।

ময়মনসিংহ গীতিকায় নারী চরিত্রের স্বরূপ গ্রন্থে বলা হয়েছে, "এ-যেন পূর্ববঙ্গের ঘন অরণ্যের মধ্যে বাঘের থাবায় আহত হরিণীর উপমায় সামন্ত প্রভু কর্তৃক নির্যাতিতা বঙ্গরমণীর প্রতিচ্ছবি - যা বাস্তব সমাজ সমস্যার অসাধারণ জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে" (মোঃ শহীদুর রহমান ১৯৯৮:৮৮)। আঙ্গিক বিচারে পূর্বোক্ত তিনটি চিত্রকল্পই পশু-আশ্রয়ী। কারণ কাজী, দেওয়ান ও ভোলা সওদাগরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পশুর হিংস্রতার অনুষঙ্গই ব্যবহৃত হয়েছে এখানে।

৫৮.

আমি না পাগল কন্যা যোয়াইয়ের চিলা।
এইখানে থাকিয়া কন্যা শুন আমার কথা॥
['ধোপার পাট', পূগী ২, ২ : ৪]

পশুপাখি-আশ্রয়ী মানসিক অবস্থা বর্ণনাত্মক আরেকটি চিত্রকল্প পাওয়া যায় 'ধোপার পাট' গাথায়। ধোপার সুন্দরী চতুর্দশী কন্যা কাঞ্চনমালার রূপে মুগ্ধ হলো জমিদারপুত্র। তাদের প্রণয়ঘন সংলাপ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে গাথার শুরু। এক পর্যায়ে জমিদারপুত্র কাঞ্চনমালার হাত ধরে পিতার রাজ্যধনসহ

সবকিছুর বিনিময়ে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় এবং তার প্রতি গভীর মোহাচ্ছন্নতার কথা জানায়। এই মানসিক অবস্থা ধরা পড়েছে পাখি আশ্রয়ী এ চিত্রকল্পটিতে। নদীতে জোয়ারের সময় শিকারী চিল যেমন মাছের আশায় পাগলের মতো উড়তে থাকে, জমিদার পুত্রের মনের অবস্থাও তেমনি। সে কাঞ্চনমালার প্রণয়ে আসক্ত হয়ে ঐ রকম ক্ষুধার্থ চিলের মতোই পাগল হয়েছে। এ মনোভাব শুনে কাঞ্চনমালা প্রথমে এ প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে তাদের অসম অবস্থা জমিদার পুত্রকে মনে করিয়ে দেয়।

৫৯.

পন্থের পানে চাইয়া থাকি বন্ধুর লাগিয়া।
চক্ষে ঝুরে মাকড়াসা আন্ধার লাগিয়া।
['রূপবতী', মৈগী ১, ২ : ২৫৫]

এক জেলে দম্পতির গৃহে আশ্রয় নিয়ে ছয় বছর দাম্পত্য জীবন অতিক্রান্ত হবার পর স্বামী মদন স্ত্রী রাজকন্যা রূপবতীর কাছে পক্ষকালের জন্য বিদায় নিয়ে মা-বাবার সংবাদ নিতে নিজ দেশে যায়। এক পক্ষ কাল অতিক্রান্ত হবার পরও মদন যখন ফিরে না, তখন রূপবতী বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়ে। মদনের জন্য পথের দিকে চেয়ে থেকে থেকে তার চোখ দিয়ে অবিরত অশ্রু নির্গত হয়। স্বামী মদনের অনুপস্থিতিতে বিরহ-কাতর রূপবতীর দুঃখ ও মানসিক অবস্থার বর্ণনা স্থান পেয়েছে উপরিউক্ত কীট-পতঙ্গ আশ্রয়ী চিত্রকল্পে। দুঃখে রূপবতীর চোখ থেকে অবিরত অশ্রু নির্গত হতে হতে ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দু চোখের উপর পড়ে মাকড়সার জালের মতো সৃষ্টি হয়েছে, যা চমৎকার চিত্রকল্পে রূপলাভ করেছে। নায়িকার কান্না বিজড়িত চোখের বর্ণনায় চিত্রকল্পটিতে মাকড়সার জাল অনুষঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬০.

শিরে হাত দিয়া সবে জুড়য়ে কান্দন।
শুনিয়া হইল চন্দ্রা পাথর যেমন॥
['চন্দ্রাবতী', মৈগী ১, ২ : ১১৩]

নায়ক ব্রাহ্মণপুত্র জয়ানন্দ তার আবাল্য সাথী ব্রাহ্মণকন্যা চন্দ্রাবতীর প্রতি অনুরাগবশত প্রণয় নিবেদন করে। এক পর্যায়ে বিয়ের দিন তারিখও নির্ধারিত হয়। কিন্তু এরই মাঝে জয়ানন্দ কর্তৃক অপর এক মুসলমান কন্যার রূপজ মোহে ধর্মান্তর গ্রহণের সংবাদ এলে চন্দ্রাবতী মানসিক আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়। আবাল্য সাথী জয়ানন্দকে সে স্বামী হিসাবে পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছে বহু পূর্ব থেকে। কিন্তু ধর্মান্তরের সংবাদে সেই স্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। চন্দ্রাবতীর এই বেদনাদীর্ণ মানসিক অবস্থার বর্ণনা প্রকাশ পেয়েছে এ চিত্রকল্পটিতে। প্রবাদ আছে, "অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর"- পরনারীগামী, ধর্মান্তরিত জয়ানন্দের আচরণ চন্দ্রাবতীর নিকট এতটাই অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল যে সে অধিক শোকে প্রায় পাথর হয়ে গিয়েছিল। চন্দ্রাবতীর মনে এ আঘাত শুধু সাধারণ আঘাত নয়, তার হৃদয়ের প্রণয় বাসনার উপর আঘাত।

৬১.

জোড় পালঙ্কে শুতি কৈন্যা ঘোরে নিন্দ্রা যায়।
কামারের ভাতির মতন নিয়াস ফেলায়॥
['কাফেন চোরা', পূগী ৩, ২ : ৬০]

আজিম বেপারীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আয়রা বিবির স্বামী বিরহে মানসিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে উপরিউক্ত চিত্রকল্পটিতে। আজিম বেপারী তার নব বিবাহিতা স্ত্রী আয়রা বিবিকে রেখে ব্যবসার জন্য অন্য স্থানে যায়। তিন মাসেও স্বামী ফিরে না আসায় বিরহ ও নানা দুশ্চিন্তায় সে কাতর হৃদয়ে গভীর রাতে নিদ্রামগ্ন। নানা দুশ্চিন্তাবশত নিদ্রায় সে স্বামী আজিমের মুখ স্বপ্নে দেখে নিজের অজান্তেই; ঘুমের ঘোরে সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে যার বর্ণনা এখানে স্থান পেয়েছে কামারের ভাতির অনুষঙ্গে। কামার তার লোহা পোড়ানো আগুন আরো তীব্র করতে বাতাস দেওয়ার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করে তার সঙ্গে আয়রার দীর্ঘশ্বাস তুলনায়িত হয়ে ত্বগেন্দ্রিয়নির্ভর চিত্রকল্পটি সৃষ্টি হয়েছে।

৬২.

তিন চাইর কিল মারে তারে ঘেণ্ডির উপর।
খাড়াই রইছে চান্দ ভাঁড়ালী যেমন পাথর॥
['চৌধুরীর লড়াই', পূগী ৩, ২ : ৪২১]

পিতৃতুল্য বাবা রজেন্দ্রনারায়ণ ষোলো আনি জমিদারীর হিসাব করে একটি সনদে সাত আনি লিখে রাজচন্দ্রকে দিতে প্রস্তুত করলে কাছে দাঁড়ানো চান্দ ভাঁড়ালী ঐ সাত আনি হিস্যা লিখিত সনদ ছিড়ে ফেলে। কেননা চান্দ ভাঁড়ালী জানত রাজেন্দ্রনারায়ণ সম্পত্তি পেলেও লম্পট চরিত্রের কারণে সে তা ধরে রাখতে পারবেনা। সনদ ছিড়ে ফেলার অপরাধে রাজেন্দ্রনারায়ণ চান্দ ভাঁড়ালীর ঘাড়ে কিলের পর কিল বসিয়ে দেন। এমনি অবস্থায় চান্দ ভাঁড়ালীর মানসিক অবস্থা বিষয়ক চিত্রকল্প এটি। সে এমন একটা আকস্মিক পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। ঘাড়ের উপর একাধিক কিল পড়ায় সে যেন পাথরের মতো স্থির ও নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তার এ পাথরসম নিস্তব্ধতার মধ্যে অপরাধপ্রবণ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া গেলেও সনদের কাগজটি ছিড়ে সে যে ভুল করেনি তার প্রমাণ আমার কাহিনীর শেষেই পাই। মারের ভয়তে কাউকে আর কিছু না বলে চুপচাপ থাকলেও সে মনে মনে বলে যে তার কথায় একসময় সবাই সুখ পাবে। অর্থাৎ তার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হবে। বস্তু-আশ্রয়ী আলোচ্য চিত্রকল্পটিতে চান্দ ভাঁড়ালীর মানসিক অবস্থা বর্ণনায় স্থির চিত্রকল্প সৃষ্টিতে পাথরের অনুষঙ্গ এসেছে।

৬৩.

এই দেখ্যা ডিঙ্গাধরের কলিজা যে ফাটে।
বারুদের আগুন যেমন জিক্‌কাইর মার্যা উঠে॥
['মইষাল বন্ধু', পূগী ২, ২ : ৪৮]

সামন্ত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় প্রথমে ভাগ্যবিড়ম্বিত ও পরে ভাগ্যবান ডিঙ্গাধর অনেকদিনের বিচ্ছেদের পরও বলরমের কন্যা সাজুতীকে ভুলতে পারেনি। একদিন ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে সে বলরামের বাড়ী গিয়ে জানতে পারে বলরামের মৃত্যু হয়েছে এবং তার একমাত্র কন্যা সাজুতী ও তার মা সীমাহীন দারিদ্র্যে জীবন কাটাচ্ছে। বলরাম মৃত্যুর পূর্বে আষাঢ়িয়া মণ্ডলের কাছ থেকে পাঁচশ' টাকা ধার করে পরিশোধ করে যেতে পারে নি। তাদের বাড়ীঘর, পোশাক-পরিচ্ছদের জীর্ণতায় ডিঙ্গাধরের অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যেতে বসে। মহাজনী ঋণের গ্রাসে এমনি একটি পরিবারের নিঃস্ব হওয়ায় সে বারুদের আগুনের মতো জ্বলে ওঠে। বারুদ যেমন হঠাৎ ফেটে বিকট শব্দ করে ওঠে, ডিঙ্গাধরের অন্তর্যন্ত্রণাও তেমনি ফুটে উঠেছে উপরিউক্ত চিত্রকল্পটিতে। এখানে আমরা একটি তপ্ত প্রাণের সহানুভূতিশীল মানব মনের পরিচয় পাই।

পরে ডিঙ্গাধর এক ঘটকের মাধ্যমে বলরাম কন্যা সাজুতীর পূর্ব অনুরাগ অক্ষুণ্ন আছে কিনা তা যাঁচাই করে এবং উভয়ের বিয়ে হয়।

৬৪.

এই কথা উজীর জানায় দেওয়ান ফিরোজেরে
আগুন জ্বলিল যেমন সমুন্দুর ভিতরে॥
['ফিরোজ খাঁ দেওয়ান', পূগী ২, ২ : ৪৬৩]

'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' পালায় মানসিক অবস্থা বর্ণনাত্মক যে চিত্রকল্পটি পাওয়া যায় তার পেছনে বংশমর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ন হওয়ার অন্তর্যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে। ঈশা খাঁর বংশধর ফিরোজ খাঁ দেওয়ান এক ছবিওয়ালীর কাছে কেল্লাতাজপুরের দেওয়ান উমর খাঁর কন্যা সখিনা সুন্দরীর ছবি দেখে মুগ্ধ হন এবং পরে স্বচক্ষে সখিনাকে দেখেন। সখিনা বিবিও ছদ্মবেশী ফেরীওয়ালার হাতে ফিরোজ খাঁর ছবি দেখে অভিভূত হন। কিন্তু উমর খাঁ এবিয়েতে সম্মত হলেন না। আভিজাত্যবোধ নিয়ে তিনি মনে করেন জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানরা কাফেরের গোষ্ঠী। ফলে তিনি কন্যার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে উজীরকেও অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। অপমানিত উজীরের মুখে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের খবর অবগত হলে ফিরোজ খাঁ প্রতিশোধপরায়ণ ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর এ ক্ষিপ্ত মানসিক অবস্থার বর্ণনা আগুনের অনুষঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে উল্লিখিত চিত্রকল্পটিতে - যিনি সমুদ্রের মতো শান্ত তিনিই প্রত্যাখ্যানের খবরে অগ্নির মতো জ্বলে উঠলেন। এখানে বিপরীত পরিবেশে আগুনের আবির্ভাবে চিত্রকল্পটির সৃষ্টি।

৬৫.

কৈতরা উইড়া গেলে যেমন খোপ হয়রে খালি।
নারী ছাড়া পুরুষ শুন্য কিসের গিরস্থালী॥
['কমলা রাণীর গান', পূগী ২, ২ : ২২১]

'কমলা রাণীর গান'-এ সুসং রাজ্যের রাজা জানকীনাথের স্ত্রী কমলারাণীর অমরত্ব লাভের ইচ্ছা পূরণের জন্য একটি পুকুর খনন করান। কিন্তু শত চেষ্টাতেও পুকুরে জল ওঠেনা। পরে রাজার স্বপ্ন অনুসরণে রাণী ভরা কলসীসহ শুকনো পুকুরে নেমে পুকুরভর্তি জল প্রার্থনা করলেন। রাজ্যের যত লোকের সামনেই অলৌকিকভাবে পুকুর ছাপিয়ে পানি উঠে চারদিক ভরে গেল। রাণীও হারিয়ে গেলেন ঐ জলের মধ্যে। রানী কমলাকে হারিয়ে রাজা জানকীনাথ একা হয়ে পাগলের মতো হয়ে গেলেন। সোনার পিঞ্জর খালি করে যেন তার রানী পাখীর মতো উড়ে গেছে। প্রদীপ ছাড়া যেমন গৃহ অন্ধকার, ফুল ছাড়া বোটা যেমন বেমানান, পানি ছাড়া যেমন পুকুর শুন্য, প্রাণ ছাড়া দেহ যেমন শূন্য, নারী ছাড়াও সংসার তেমনি শূন্য। এমনি অবস্থায় রানীর আত্মবিসর্জনে রাজার অতিশয় বিচ্ছেদ কাতর হৃদয়ের অসহায়ত্ব প্রকাশ পেয়েছে আলোচ্য চিত্রকল্পটিতে। কবুতর উড়ে গেলে যেমন খোপ খালি হয়ে যায়, কমলা রানীর আত্মাহুতিতে তেমনি যেন রাজার বুকের খোপটি খালি হয়ে পড়ে আছে। এখানে রাজার মনের শূন্যতাকে খালি খোপের অনুষঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে। নারী ছাড়া পুরুষের অস্তিত্ব নেই। কাজেই ঘর সংসারেরও কোনো মূল্য নেই। জোড়ার পাখীকে শরবিদ্ধ করে মেরে ফেললে যেমন ভিনজোড় হয়ে পড়ে, রাজার অবস্থাও তেমনি নিঃসঙ্গ। আঙ্গিক বিচারে আলোচ্য চিত্রকল্পটি শূন্যতা-আশ্রয়ী।

বিবিধ চিত্রকল্প

লোকগীতিকাগুলোতে নায়ক-নায়িকাদের রূপবর্ণনাত্মক ও মানসিক অবস্থা বর্ণনাত্মক চিত্রকল্প ছাড়াও কিছু চিত্রকল্প পাওয়া যায় যেগুলো বিবিধ বিষয়ক চিত্রকল্পে স্থান পেতে পারে।

৬৬.

আমার সোয়ামী সে যে পর্ব্বতের চুড়া।
আমার সোয়ামী যেমন রণ-দৌড়ের ঘোড়া॥
['মলুয়া', মৈগী ১, ২ : ৭৫]

'মলুয়া' গাথায় নায়ক কৃষকপুত্র চান্দবিনোদের নববিবাহিতা সুন্দরী স্ত্রী কৃষককন্যা মলুয়ার রূপসৌন্দর্য দেখে গ্রামের কাজী স্ত্রী হিসাবে তাকে পেতে চায় এবং এ প্রস্তাব নেতাই কুটনীকে দিয়ে পাঠায়। মলুয়া তা প্রত্যাখ্যান করে তার হৃদয়ে স্বামীর অবস্থান হিসাবে কুটনীকে যা জানায় তার সার কথা ফুটে উঠেছে আলোচ্য প্রকৃতি-আশ্রয়ী চিত্রকল্পটিতে। স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, তার স্বামী পর্ব্বতের চুড়ার মতো অটল-অনড়, সে রণক্ষেত্রে বিপক্ষ দলকে পরাজিত করায় অশ্বশক্তিসম্পন্ন। কাজেই সে স্বামীর বিশ্বস্ততাকে জলাঞ্জলি দিয়ে কাজীর প্রস্তাবে রাজি হতে পারে না। সবদিক বিচারে তার স্বামীর তুলনায় কাজী অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ও অনভিজ্ঞ। চিত্রকল্পটিতে একান্তভাবে বাঙালি নারীর পতিভক্তি এবং স্বামীপ্রীতির ইঙ্গিত পাই। কাজীর প্রস্তাবে মলুয়া কুটনীকে যে জবাব দিয়েছিল *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* গ্রন্থে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তাহা সেই দেশেরই যোগ্য, যে দেশে কোন অতীত যুগে স্পর্দ্ধার তুঙ্গশৃঙ্গ সমাশ্রিত লঙ্কেশ্বরের প্রলোভনকে পদদলিত করিয়া অযোধ্যার সম্রাজ্ঞী অশোকবনে স্বীয় চরিত্র গৌরবে জগতকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন" (দীনেশচন্দ্র সেন, ১৯৪৩: পরিশিষ্ট ৬০৩-৬০৪)।

কাহিনীতে কাজী অর্থশালী ও ক্ষমতাবান সামন্ত শ্রেণীর প্রতিভূ। তার সামন্ত শাসনের ক্ষমতার বলেই মলুয়া ও চান্দবিনোদের মধ্যে মানসিক বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে কাহিনীটি হয়ে উঠেছে বিরহাত্মক। চিত্রকল্পটির অন্তরালে খুঁজে পাওয়া যায় তৎকালীন সামন্ত সমাজের বিরাজমান চিত্র।

৬৭.

হেও বাক ফিরাইয়া অন্য বাকে যায়।
নৈক্ষত্র ছুটিল দেখা যায় বা না যায়॥
['ভেলুয়া', পূগী ২, ২ : ১৮৫]

দীর্ঘ ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করে মদন সাধু ও ভেলুয়ার মিলন ঘটলে উভয়ে নৌকায় উঠে দ্রুত নৌকা ভাসাল। নৌকা চলার এক পর্যায়ে তারা টের পেল যে বিশাল নদীবক্ষে ভেলুয়ার স্বজনগণ, লোকজনসহ রাংচাপুরের আবু রাজা, মেনকাসহ হিরণ সাধুর পিতা ধনঞ্জয় সাধু এবং লোক-লস্করসহ হিরণ সাধু চতুর্দিক থেকে নৌকায় যুদ্ধ নিশান উড়িয়ে তাদের আক্রমণের জন্য দ্রুত ছুটে আসছে। মদন সাধু ও ভেলুয়ার বুঝতে বাকী রইলা না তারা চরম বিপদের সম্মুখীন। ফলে আত্মরক্ষার্থে তাদের নৌকার গতি আরো বাড়িয়ে দিল। মদন সাধু নৌকাটিকে ঘন ঘন বাক পাল্টিয়ে অনুসরণকারীদের কবল থেকে রক্ষার চেষ্টা করে চলল। নৌকার এ দ্রুততার চিত্র ফুটে উঠেছে এ চিত্রকল্পে।

আকাশের গ্রহ-নক্ষত্ররাজী এত দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে যে সাধারণ চোখে তা দেখাই কষ্টকর। পেছন থেকে তাড়া খাওয়া নায়ক-নায়িকার নৌকার গতিও তেমনি এত দ্রুত যে তা দৃষ্টিগোচর নাও হতে পারে। নক্ষত্রের স্থানচ্যুতি যেমন মুহূর্তেই ঘটে থাকে মদন সাধুর ডিঙ্গাখানিও তেমনি যেন ভেলুয়াকে নিয়ে নিরাপদ গন্তব্যের প্রত্যাশী। এখানে নক্ষত্রের অবস্থান বা ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়নি; এর স্থান পরিবর্তনের দ্রুততাই হয়ে উঠেছে নৌকার গতিবেগ প্রকাশের অনুষঙ্গ। আঙ্গিক বিচারে এটি প্রকৃতি-আশ্রয়ী গতির চিত্রকল্প।

৬৮.

ভাতের থালি যেমুন ভাইরে সোমান থাকে তলি।
এম্নি মোতন থাকে নদী বাও বাতাস না পাইলি॥
['মাণিকতারা বা ডাকাতের পালা', পূগী ২, ২ : ২৩৫]

পালায় কাহিনী শুরু হয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদীর বর্ণনা দিয়ে কারণ ঐ নদীর তীরবর্তী একটি গ্রামের কাহিনীই পালাটির বিষয়বস্তু। গাথায় ব্রহ্মপুত্র নদীটিকে ভয়ংকররূপে চিত্রিত করা হয়েছে। বর্ণনাগুণে নদীটি হয়ে উঠেছে একটি চরিত্র বিশেষ। এটি এত প্রশস্ত যে এর এক পাড় থেকে অন্য পাড় দেখা যায় না। ফলে মনে হয় যেন এর অন্য পাড় নাই। এখানে নদীটির প্রমত্ততা এবং খরতা ও গভীরতার বর্ণনাই প্রাধান্য লাভ করেছে।

কিন্তু যখন বাতাস থাকে না তখন এ ভয়ংকর নদীও মাটির মতো স্থির হয়ে পড়ে থাকে। এর ঢেউয়ের ডাকও থাকে না। আকাশে যখন বাতাস বা ঝড়বৃষ্টি থাকে না তখনকার ব্রহ্মপুত্র নদীর বর্ণনা ফুটে উঠেছে এ বস্তু-আশ্রয়ী চিত্রকল্পটিতে। ভাত খাবার থালার নিচ যেমন সমতল ও মসৃণ থাকে, নদীতে বাতাস বা ঝড় বৃষ্টি না থাকলে এর পানিও তেমনি সমতল, মসৃণ ও স্থির থাকে। এখানে নদীকে স্থির ও শান্ত বোঝাতে ভাতের থালার তলার অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে।

৬৯.

কান্ধে কলসী মেঘের রাণী ফিরুন পাড়া পাড়া।
আসমানে খাড়ইয়া জমিনে ঢালে ধারা॥
['আয়না বিবি', পূগী ৩, ২ : ২০৫]

'আয়না বিবি' গাথায় মামুদ উজ্জ্যালের সঙ্গে নায়িকা আয়নার বিয়ে হলে তাদের বিবাহিত জীবন সর্বাংশে সুখময় ছিল। খুব সহজেই হেসে খেলে তাদের দিন অতিবাহিত হওয়াকালীন আষাঢ়ের আগমনে এ প্রকৃতি-আশ্রয়ী চিত্রকল্পটির সৃষ্টি। আষাঢ় মাস আসে ভরা জলবতী যৌবন নিয়ে। চিত্রকল্পটি সম্পর্কে *গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "আষাঢ় মাসে বর্ষণরত আকাশকে মেঘের রাণী কর্তৃক জমিতে কলসী থেকে জল নিক্ষেপের চিত্রকল্পে ধরেছেন কবি" (বরুণ কুমার চক্রবর্তী, ১৯৯৩:৩৩৩)। আষাঢ়ের বারিবর্ষণে মেঘের রাণী কর্তৃক জল নিক্ষেপের অনুষঙ্গে আলোচ্য দর্শনেন্দ্রিয় নির্ভর চিত্রকল্পটির অবতারণা।

৭০.

চান্দের বাগের ফুল নারে সূরজে দিলাইন দড়ি।
এই না ফুল দিয়া আমি মালা খানি গাঁথি॥
['রতন ঠাকুরের পালা', পূগী ৪, ২ : ৩২৩]

পালায় এক মালাকর কন্যার নিপুণ হাতে তৈরি শিল্প সুষমামণ্ডিত একটি পুষ্পমালার গঠন-বৈশিষ্ট্য বর্ণনার সূত্রে আলোচ্য প্রকৃতি-আশ্রয়ী চিত্রকল্পটির অবতারণা। চিত্রকল্পটিতে মালিনী আপন কল্পনায় চন্দ্রের বাগানের ফুলের মধ্যে সুর্যকিরণের সূতা দিয়ে বসন্ত-বাহার মালা গাঁথছে। অর্থাৎ যে চাম্পাফুল দিয়ে সে মালাটি গাঁথছে সে ফুলগুলো যেন চন্দ্র বাগানের ফুল, আর তা গ্রথিত করার মাধ্যম বা সূতাটি হচ্ছে সূর্যরশ্মি। এখানে প্রকৃতির দুটি বিপরীতমুখী উপাদান অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্যকে অনুষঙ্গরূপে গ্রহণ করে চমৎকার চিত্রকল্প সৃষ্টি হয়েছে। চিত্রকল্পটির অনুষঙ্গ দুটির পিছনে মালিনীর আপন মনের মাধুরী মেশানো সযত্ন হাতের স্পর্শের সন্ধান পাওয়া যায়।

৭১.

সাইগরের জানোয়ার পাহাড়ের সমান।
'হুমাহুমি' শব্দ করে যেনরে তুয়ান॥
['নছর মালুম', পূগী ৪, ২ : ৩৯]

নানা বিপদ অতিক্রম করে নছর মালুম ছোট একটি নৌকা নিয়ে পলায়ন করে নিজ দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু ক্রমে সে ছোট নদী থেকে বিশাল সমুদ্রে এসে পড়ল। দেশের প্রিয়জনদের কথা গভীরভাবে মনে পড়ায় তার নিজ প্রাণের কথা প্রায় ভুলে গিয়ে সে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ ভেঙ্গে নৌকা নিয়ে চলল। এই সময়ে সমুদ্রের উত্তাল অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে আলোচ্য প্রকৃতি-আশ্রয়ী চিত্রকল্পটিতে। নদী বা সমুদ্রের ঢেউই জলযানসমুহের বিপদের প্রধান কারণ। এই ঢেউই পাড় ভাঙে, যান ডুবিয়ে দেয় এবং তীরে অবস্থানরত কোনো কিছুকে সবেগে টেনে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তার কর্মকাণ্ডকে তাই হিংস্র জানোয়ার হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে যে জানোয়ার শক্তি ও ক্ষমতায় পাহাড়ের সমতুল্য। পাহাড় অটল-অনড়তার প্রতীক এবং একই সাথে নিষ্ঠুর, নিস্তব্ধতাও তার বৈশিষ্ট্য। সাগরের ঢেউ যেন সেইরূপ জানোয়ার যার উচ্চতা পাহাড় তুল্য। এখানে তুফানের তাণ্ডবলীলাকে পাহাড় সদৃশ জানোয়ারের অনুষঙ্গে প্রকাশ করে এর ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডকে নির্দেশ করা হয়েছে। জানোয়াররূপী সেই ঢেউয়ের গর্জন যেন বিকট শব্দে নছর মালুমের নৌকার দিকে তেড়ে আসছে।

৭২.

চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘাটে বাঁধা রাখে সদাগর।
জলের উপুরে যেমন ভাসিছে নওগর॥
['মলয়ার বারমাসী', পূগী ৪, ২ : ৪০৬]

নবরঙ্গপুরে নিতিমাধব নামে বিত্তবান সওদাগরের সুখ্যাতি। অফুরন্ত ধন দৌলতের কারণে তাঁর প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার প্রকাশ রূপ লাভ করেছে এ চিত্রকল্পে। সওদাগর নিতিমাধবের নৌঘাটিতে মাঝিমাল্লাসহ চৌদ্দটি ডিঙ্গা সর্বদা প্রস্তুত থাকে। এতগুলো নৌকা পাশাপাশি অবস্থান করলে মনে হয় যেন পানির উপর নগর-বন্দর গড়ে উঠেছে অর্থাৎ এখানে জনকোলাহলপূর্ণ নৌকাগুলোর একত্রাবস্থানকে নগর বন্দরের অনুষঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে।

৭৩.

পূব পাহাড়ের শালধা কাঠে বড়া বড়া ঠুনি
ও ভাই বড়া বড়া ঠুনি।
রাজ্যের যত মাছুয়ারাঙ্গা মারিয়া দিছে ছানি॥
দূরন বাক্যা নজর করলে বাইরা মালুম হয়।
মেঘের উপরে যেমুন রামধনুর উদয়॥
['জীরালনী', পূগী ৪, ২ : ৪২৭]

রূপকথা ও বাস্তবতার সংমিশ্রণে গঠিত 'জীরালনী' গাথায় কুশাই নদীর তীরে প্রতাপশালী এক রাজা চক্রধর বায়ান্ন দুয়ারী ঘর-সহ বড় বড় বাঙ্গালা ঘরে তার বসবাস। পূর্ব পাহাড়ের এলাকায় মাছরাঙ্গা পাখি মেরে তার পালক দিয়ে রাজার ঘরের চালি দেওয়া হয়েছে। বহু রঙ্গের মিশ্রণে গঠিত মাছরাঙ্গার পালক দিয়ে ঘরের চালি দেওয়ায় দূর থেকে মেঘের উপর রংধনুর আবির্ভাব বলে মনে হয়। রংধনুতে বহু রংয়ের সমাবেশ। একই গুনসম্পন্ন মাছরাঙ্গা পাখির পালক দিয়ে ঘরের চালা দিলে যে কৃত্রিম রংধনুর সৌন্দর্য ফুটে উঠে তার পরিচয় পাই প্রকৃতি-আশ্রয়ী এ চিত্রকল্পটিতে। এখানে প্রকৃতির একটি ক্ষণিক ও চমৎকার শিল্পনৈপুণ্যের অনুষঙ্গ নিয়ে সৃষ্ট চিত্রকল্পটি একটি দুষ্প্রাপ্য চিত্রকল্পের মর্যদা লাভের অধিকারী॥

উপসংহার

মধ্যযুগে রচিত হওয়া সত্ত্বেও মধ্যযুগীয় সাহিত্যধারার প্রভাব-মুক্ত লোকগীতিকাগুলো ব্যক্তি-অভিরুচি-আশ্রয়ী প্রণয়মহিমা। এগুলো একান্তভাবে লৌকিক ও জাগতিক হয়েও দেহাতীত। লৌকিক বলে এতে ব্যবহৃত প্রতীকগুলোও লোকজীবন ও প্রকৃতিকেন্দ্রিক। গাথা রচয়িতাদের চারপাশে দৃষ্ট প্রকৃতি, বস্তু, প্রাণি ও বিভিন্ন কাল্পনিক জীব-জন্তু এমনকি সংস্কার-কুসংস্কার নিয়েও রচিত হয়েছে বহু প্রতীক। এসব প্রতীক ব্যবহারে রচয়িতাদের শিল্পচাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

লোকগীতিকার রচয়িতারা সরাসরি জীবন থেকে এর কাহিনী ও চরিত্রগুলো গ্রহণ করেছেন বলে এতে ব্যবহৃত প্রতীক বা চিত্রকল্পগুলোও জীবনঘনিষ্ঠ। এর মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানবহৃদয় যেন একাত্ম হয়ে মানবপ্রেমেরই জয়গান গেয়েছে। রচয়িতারা প্রেম ও প্রকৃতিনির্ভর অলঙ্কার সৃষ্টি করে আশ্চর্য কৌশলে মানুষের হৃদয়-রহস্যকে উদঘাটিত করেছেন এসব গাথায়। এর স্থানে স্থানে যেসব অলঙ্কার আছে তা সংস্কৃতের থেকে গৃহীত নয়, বরং গ্রাম্য রচয়িতাদের নিজস্ব উদ্ভাবন।

গীতিকার রূপবর্ণনাত্মক চিত্রকল্পগুলোতে মধ্যযুগের রূপবর্ণনার রীতি অনুযায়ী প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম বর্ণনা স্থান না পেলেও এখানে বিশেষত নায়িকাদের মাথার চুল থেকে পা পর্যন্ত যে রূপবর্ণনা স্থান পেয়েছে তা থেকেই গাথায় নায়িকাদের অবস্থান সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। চিত্রকল্পগুলোতে ধরা পড়েছে নায়িকাদের সেই রূপ যা নায়ককে আকৃষ্ট করে কাহিনীকে গতিদান করেছে। এমনকি নায়িকাদের এই রূপই কখনো 'অপনা বৈরী' হয়ে উঠেছে অত্যাচারিত দেওয়ান, কাজী কিংবা প্রভাবশালী চরিত্রের রূপজ-মাহে।

মানসিক অবস্থা বর্ণনাত্মক চিত্রকল্পে পালায় বর্ণিত নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে পাত্র-পাত্রীদের মানসিক অবস্থার পরিচয় বিদ্যমান। তৎকালীন সমাজ ছিল সামন্ত শাসনে তটস্থ। জিঘাংসা ও রিরংসাবৃত্তি ছিল এ-শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পালায় উল্লিখিত কাজী, দেওয়ান ও ভোলা সওদাগর প্রভৃতি চরিত্রের বিভিন্ন হিংসাত্মক কর্মের মাধ্যমে তা জানা যায়। 'মলুয়া' ও 'ভেলুয়া' গাথায় সামন্ত শাসনের এরূপ বর্ণনামূলক চিত্রকল্প পাওয়া যায় তিনটি। তিনটিতেই সামন্তশক্তির অত্যাচার-নির্যাতনের স্বাক্ষর লক্ষণীয়। এখানে কাজী, দেওয়ান বা ভোলা সওদাগরকে বাঘের হিংস্রতার চিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মৈমনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায় বর্ণিত পালাগুলোর বৃহৎ অংশ দখল করে আছে শাসক ও জমিদার শ্রেণির লোকেরা যাদেরকে সামন্ত শাসনের প্রতিভূ বলা যায়। তারা নিজ নিজ এলাকায় শান-শওকত, ক্ষমতা ও দাপটের সঙ্গে বসবাস করত। প্রজাদের কাছে তারা রাজা নামে পরিচিত ছিল। এদেশে বড় বড় নদী থাকায় তাদের তীরে পাথর ও ইট নির্মিত ঘর তৈরি নিরাপদ নয় বলে তারা বড় বড় বাঙালা ঘর বানাতো। এ সব বাঙালা ঘরের ছাদগুলো নির্মিত হতো মাছরাঙ্গা পাখি এবং ময়ূরের পালক

দ্বারা। এগুলো সূর্য কিরণে ছবির মতো ঝলমল করতো। এর উপর ভিত্তি করে নির্মিত একটি চমৎকার চিত্রকল্পসহ কিছু বিচ্ছিন্ন চিত্রকল্প স্থান পেয়েছে বিবিধ শ্রেণির চিত্রকল্পের মধ্যে।

গীতিকায় প্রাপ্ত চিত্রকল্পগুলো ইন্দ্রিয়নির্ভরতার ক্ষেত্রে ঘ্রাণ এবং স্বাদেন্দ্রিয়নির্ভর ব্যতীত দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় এবং ত্বগেন্দ্রিয়নির্ভর। তাই দেখা যায় পালার রচয়িতা বিভিন্ন জন হলেও মোটামুটি সবারই দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় এবং ত্বগেন্দ্রিয়ের প্রতি সূক্ষ্ম অনুভূতি কাজ করেছে।

গীতিকাগুলোর মধ্যে ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সমাজচিত্র ও সমাজতত্ত্ব আছে। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়েও এর মূল্য কম নয়। এ গাথাগুলো সরস ও সুন্দর। স্থানে স্থানে প্রচুর অলঙ্কার আছে। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, প্রতীক, সমাসোক্তি, চিত্রকল্প, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, সন্দেহ, ভ্রান্তিমান, অপহ্নুতি, ধ্বন্যুক্তি, অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি সবই এতে পাওয়া যায়। এসব অলঙ্কারের মাধ্যমে রচয়িতাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তি-অনুভূতি ও অভিরুচির পরিচয় প্রকাশ পায়। তাদের ব্যবহৃত এসব অলঙ্কারের উৎস রচয়িতাদের জীবনাভিজ্ঞতা, সমাজজ্ঞান, প্রকৃতি-সচেতনতা ও সূক্ষ্ম রসবোধ। প্রাত্যাহিক জীবনাভিজ্ঞতা ও প্রকৃতিজগৎ তথা স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে তারা যেসব আলঙ্কারিক উৎস সংগ্রহ করেছেন তাতে গীতিকাগুলো হয়ে উঠেছে হৃদয়গ্রাহী। এর মধ্যে প্রতীক-চিত্রকল্পসহ সব অলঙ্কারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মানুষের হৃদয়ানুভূতি ও সৌন্দর্য একই সাথে গ্রাম্যজীবন, গ্রাম্য পরিবেশ ও গ্রাম্য ভাষা ব্যবহারে তা ভরে উঠেছে কাব্যিক সুষমায়।

এসব গীতিকায় দারিদ্র্য আছে, সামাজিক বাধা আছে, প্রেম বিষয়ক প্রতারণা আছে, বিরহ-দুঃখ আছে, মানুষের শঠতা, স্বার্থবুদ্ধির কলঙ্ক চিহ্নও আছে; কিন্তু মানব সংকীর্ণতার কোনো সীমাতেই এসব গাথার সৌন্দর্য বাধা পায়নি। গাথায় বর্ণিত কাহিনীর পটভূমিকে ভাষার সুরে, ছন্দের দোলায় ও প্রকাশভঙ্গির কুশলতায় সর্বতো মধুর করে তোলা সম্ভব ছিল বলেই রচয়িতার অবচেতন মনে অলঙ্কারের প্রকাশ ঘটেছে। এমন উদাহরণ বাংলা সাহিত্যের অন্যত্র বিরল। নায়ক বা নায়িকার রূপবর্ণনায় মধ্যযুগীয় কাব্যরীতি এখানে নেই। পল্লীপ্রকৃতির সমস্ত রূপ আহরণ করে রচয়িতারা নায়ক-নায়িকার নয়ন ও কেশের সৌন্দর্য খুঁজেছেন। সমগ্র কিছুকে ব্যক্ত করতে এতে অলঙ্কার যেমন আছে; তেমনি আছে শব্দ, ভাষারীতি, ছন্দ, নিসর্গপ্রকৃতি, প্রকাশভঙ্গির নৈপুণ্য।

অলঙ্কার বিশ্লেষণে শুধু প্রতীক ও চিত্রকল্পের আলোচনাতেই গাথার আলঙ্কারিক পরিচয় অসম্পূর্ণ। তবু একই অঙ্গে বহু অলঙ্কারের সীমা অতিক্রম না করে প্রতীক ও চিত্রকল্প বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গীতিকায় অলঙ্কার ব্যবহারের ধারা সূচিত হতে পারে। কারণ অলঙ্কারও গাথাগুলোকে যথার্থ মর্যদায় উন্নীত করতে সহায়তা করেছে। তাছাড়া প্রত্নতত্ত্বের মাধ্যমে যেমন প্রাচীনকে জানা যায়, অলঙ্কারও তেমনি গীতিকাযুগের সমাজমানসকে পরিস্ফুট করে। বাংলা লোকগীতিকায় প্রতীক ও চিত্রকল্প ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তার প্রকাশ ঘটেছে॥

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থ

অমলেন্দু বসু	১৩৭৯	*সাহিত্যচিন্তা* কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
	১৯৭১	*সাহিত্যলোক* কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
আজহার ইসলাম	২০০০	*প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা* ঢাকা: বাংলা একাডেমী
আবদুল হাফিজ	১৯৭৮	*লৌকিক সংস্কার ও বাঙালী সমাজ* ঢাকা: মুক্তধারা
(সম্পাদিত)	১৯৯৪	*বাংলা একাডেমী ফোকলোর আরকাইভস (৪র্থ খণ্ড)* ঢাকা : বাংলা একাডেমী
আলী নওয়াজ (সম্পাদিত)	১৯৬৯	*ময়মনসিংহ গীতিকা* ঢাকা: সিটি লাইব্রেরী
আশরাফ সিদ্দিকী (সম্পাদিত)	২০০০	*পূর্ব্ববঙ্গ: মৈমনসিংহ-গীতিকা (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা)* ঢাকা : গতিধারা
	২০০০	*মৈমনসিংহ-গীতিকা (পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা)* ঢাকা : গতিধারা
আশুতোষ ভট্টাচার্য	১৯৬২ (১৯৫৪)	*বাংলার লোক-সাহিত্য (১ম খণ্ড)* কলিকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউজ
আহমদ কবির	১৯৮৬ (১৯৭৪)	*রবীন্দ্র কাব্য: উপমা ও প্রতীক* ঢাকা: মুক্তধারা
ওয়াকিল আহমদ	২০০১	*লোককলা প্রবন্ধাবলি* ঢাকা: গতিধারা
	১৯৯৮	*বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত* ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোং
	২০০০	*'লোকসাহিত্য'* *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭ (৩য় খণ্ড)* ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি
কনক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৫৪	*বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের কথা* কলিকাতা
কাজী দীন মুহম্মদ	১৯৬৮	*বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)* ঢাকা: ষ্টুডেন্ট ওয়েজ
কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়	১৩৮২	*রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্প* কলিকাতা: অভী প্রকাশন
জীবেন্দ্র সিংহ রায়	১৯৮৪	*রবীন্দ্র নির্মাণ: কবিতার অবয়ব* কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং
	১৯৮৬	*আধুনিক কবিতার মানচিত্র* কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং
তরুণ সান্যাল	১৯৭২	*আধুনিক কবিতা: বিচ্ছিন্নতা, বিশুদ্ধতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ* কলিকাতা

তুষারকান্তি মহাপাত্র	১৯৮৭	*রবীন্দ্র কবিতা ও চিত্রকল্প* কলিকাতা
দীনেশ চন্দ্র সেন	১৯৪৩ (১৮৯৬)	*বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* কলিকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
	১৯৯৫	*প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান* কলকাতা: করুণা প্রকাশনী
	১৯৯৩ (১৯২৩)	*মৈমনসিংহ-গীতিকা (পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা)* কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
	১৯২৬	*পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা (২য় খন্ড, ২য় সংখ্যা)* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
	১৯৩০	*পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খন্ড, ২য় সংখ্যা)* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
	১৯৩২	*পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খন্ড, ২য় সংখ্যা)* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
	১৯৯৩ (১৯৩৫)	*বৃহৎ বঙ্গ (১ম খণ্ড)* কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং
	১৩৭৪ (১৯৩৯)	*বাংলার পুরনারী* কলিকাতা: জিজ্ঞাসা
	১৯৩৯	*পুরাতণী* কলিকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স
পল্লব সেন গুপ্ত	১৯৯৫	*লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ* কলিকাতা: পুস্তক বিপণী
পাকিস্তান পাবলিকেশান্‌স্	১৯৬২	*পূর্ব পাকিস্তানের লোক-গীতিকা* ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশান্‌স্
	১৯৬৬	*পাকিস্তানের লোক কাহিনী* ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশন্‌স্
প্রবোধ চন্দ্র ঘোষ	১৯৭৩	*রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও সাহিত্য* কলকাতা: রূপা অ্যান্ড কোম্পানী
বাদিউজ্জামান	১৯৭৭	*রংপুর গীতিকা (১ম খন্ড)* ঢাকা বাংলা একাডেমী
	১৯৬৮	*সিলেট গীতিকা* ঢাকা: বাংলা একাডেমী
	১৯৭১	*মোমেনশাহী গীতিকা* ঢাকা : বাংলা একাডেমী
বরুণ কুমার চক্রবর্তী	১৯৯৩	*গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য* কলকাতা: পুস্তক বিপণি
	১৩৮৪	*বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস* কলকাতা: পুস্তক বিপনি
	১৯৯৫	*বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ* কলিকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
বরুণ কুমার চক্রবর্তী ও দিব্যজ্যোতি মজুমদার	১৯৯৬	*বাংলার লোকসংস্কৃতি* কলিকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য	১৯৬২	*বাংলা গাথাকাব্য* কলিকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী

বার্ণিক রায়	১৩৭৮	*কাবিতা: চিত্রিত ছায়া* কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
বিপ্রদাস বড়ুয়া	১৯৭৬	*কবিতায় বাক্‌প্রতিমা* ঢাকা: মুক্তধারা
বিশ্বজিৎ ঘোষ	১৯৯৩	*নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* ঢাকা: বাংলা একাডেমী
বেগম আকতার কামাল	১৯৯২	*বিষ্ণুদে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ* ঢাকা: বাংলা একাডেমী
বেগম সেলিমা খালেক	১৯৯৩	*জসীম উদ্‌দীনের কবিতা: অলঙ্কার ও চিত্রকল্প* ঢাকা: বাংলা একাডেমী
ভূদেব চৌধুরী	১৯৫৭	*বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম পর্যায়)* কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং
মনোয়ারা খাতুন	২০০১	*বাংলাদেশের লোকসাহিত্যে সমাজ* ঢাকা: বাংলা একাডেমী
মফিজুল ইসলাম (সম্পাদিত)	১৯৮৫	*লোকসাহিত্য সংকলন-৪৩* ঢাকা: বাংলা একাডেমী
মানস মজুমদার	১৯৯৯	*লোকসাহিত্য পাঠ* কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং
মালবিকা দাশ	১৯৯৯	*বৈষ্ণব কবিতায় রূপকল্প* ২৪ পরগনা: মহাদিগন্ত মুদ্রণী
মাহবুব সাদিক	১৯৯১	*বুদ্ধদেব বসুর কবিতা: বিষয় ও প্রকরণ* ঢাকা: বাংলা একাডেমী
মাহবুবুল হক	১৯৯৪	*আশুতোষ চৌধুরী (জীবনীগ্রন্থ)* ঢাকা: বাংলা একাডেমী
মুনমুন চট্টোপাধ্যায়	২০০৩	*মৈমনসিংহ গীতিকা: পুনর্বিচার* কোলকাতা
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	১৯৯৮ (১৯৫৩)	*বাংলা সাহিত্যের কথা (১ম খণ্ড)* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স
	১৯৯৯ (১৯৬৫)	*বাংলা সাহিত্যের কথা (২য় খণ্ড)* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স
মোবারক হোসেন (সম্পাদিত)	১৯৯৬	*একুশের প্রবন্ধ ১৯৭৭-১৯৭৯* ঢাকা: বাংলা একাডেমী
মোমেন চৌধুরী	১৯৯৭	*লোকসংস্কার ও বিবিধ প্রসঙ্গ* ঢাকা: বাংলা একাডেমী
মোঃ শহীদুর রহমান	১৯৯৮	*ময়মনসিংহ গীতিকায় নারী চরিত্রের স্বরূপ* ঢাকা: বাংলা একাডেমী
	২০০১	*বাংলা সাহিত্যে লোক ঐতিহ্যের প্রভাব* ঢাকা: অনন্যা
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত)	১৯৮৫	*মুহম্মদ এনামুল হক স্মারকগ্রন্থ* ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
যতীন সরকার	১৯৯০	*চন্দ্রকুমার দে (জীবনীগ্রন্থ)* ঢাকা: বাংলা একাডেমী
যামিনীকান্ত সিংহ	১৩৬৫	*ময়মনসিংহ গীতিকার গল্প* কলিকাতা: শান্তি লাইব্রেরী

১৯৮৭ *কেদারনাথ মজুমদার (জীবনীগ্রন্থ)*
ঢাকা: বাংলা একাডেমী

লায়েক আলি খান ২০০০ *বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সমাজ ও চরিত্র*
কলিকাতা : সাহিত্যলোক

শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৯১ *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী চরিত্র*
কলকাতা

শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত) ১৯৮৯ *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন-৫০*
ঢাকা: বাংলা একাডেমী

(সম্পাদিত) ১৯৯৩ *একুশের প্রবন্ধ ১৯৯৩*
ঢাকা : বাংলা একাডেমী

শিখা দত্ত ২০০২ *আধুনিক বাংলা কবিতায় চিত্রকল্প চর্চা (১৯২০-১৯৬০)*
কলকাতা

শিবচন্দ্র লাহিড়ী ১৯৬৫ *বাঙলা কাব্যে উপমালোক (১ম খণ্ড)*
কলিকাতা

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৩ *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা*
(১৯৫৯) কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী

শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৩৮০ *আধুনিক বাংলা কাব্যের গতি-প্রকৃতি*
কলিকাতা: মণ্ডল বুক হাউজ

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস ১৯৯৩ *সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*
কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৪ *আলো-আঁধারের সেতু: রবীন্দ্র চিত্রকল্প*
কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং

সিদ্দিকা মাহমুদা ১৯৮১ *রবীন্দ্রসাথের গদ্য কবিতা: চেতনা ও চিত্রকল্প*
ঢাকা: মুক্তধারা

১৯৯২ *সুধীন্দ্রনাথ: কবি ও কাব্য*
ঢাকা: বাংলা একাডেমী

সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ১৯৭০ *ময়মনসিংহ-গীতিকা (ছাত্র সংস্করন)*
কলিকাতা

১৯৯৬ *ময়মনসিংহ গীতিকা*
কলিকাতা: ভারতী বুক স্টল

সুধীর চন্দ্র সরকার ১৪০৬ *পৌরানিক অভিধান*
কলিকাতা: এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

সুপ্রিয়া সেন ১৯৮৫ *দীনেশচন্দ্র*
কলিকাতা: জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন্স্ (প্রাঃ) লিঃ

সেলিনা হোসেন
মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ *একুশের স্মারকগ্রন্থ ১৯৯৮*
মোবারক হোসেন ১৯৯৮ *ঢাকা: বাংলা একাডেমী*

সৈকত আসগর ১৯৯৩ *আধুনিক বাংলা কবিতা: শিল্পরূপ বিচার*
ঢাকা বাংলা একাডেমী

সৈয়দ আজিজুল হক ১৯৯০ *ময়মনসিংহের গীতিকা: জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য*
ঢাকা: বাংলা একাডেমী

(সম্পাদিত) ১৯৯৯ *মৈমনসিংহ-গীতিকা*
ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

সৈয়দ আলী আহসান	১৯৮৯ (১৯৮৫)	*কবিতার রূপকল্প* ঢাকা: বাংলা একাডেমী
ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক	১৯৭০	*প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১ম খণ্ড)* কলিকাতা: ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়
	১৯৭১	*প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড)* কলিকাতা: ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়
	১৯৭১	*প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৩য় খণ্ড)* কলিকাতা: ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়
	১৯৭২	*প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৪র্থ খণ্ড)* কলিকাতা: ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়
	১৯৭৩	*প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৫ম খণ্ড)* কলিকাতা: ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়
	১৯৭৪	*প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৬ষ্ঠ খণ্ড)* কলিকাতা: ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়
	১৯৭৫	*প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (৭ম খণ্ড)* কলিকাতা: ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়
ক্ষেত্রগুপ্ত	১৩৬৬	*প্রাচীন কাব্য: সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ণ* কলিকাতা: গ্রন্থ নিলয়
A.S Hornby	1994	*Oxford Advanced Learner's Dictionary* Oxford University Press
J.A. Cuddon	1982	*A Dictionary of Literary Terms* Penguin Books
Maria Leach	1949	*Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend* Funk & Wagnalls Co.
M.H. Abrams	1999	*A Glossary of Literary Terms* Rajiv Beri for Macmillan India Limited, New Delhi.
Muhammad Shahidullah (Dr.) and Prof. Muhammad Abdul Hai	1963	*Traditional Culture in east Pakistan* Department of Bengali, University of Dhaka
P.C. Roy Chaudhury	1982	*Folk Tales of Bangladesh* India: Sterling Publishers (Pvt.) Ltd.

পত্রিকা

ওয়াকিল আহমদ	১৪০২	'বাংলা লোকসাহিত্য: শতাব্দীর সাধনা' *সাহিত্য পত্রিকা* (৩৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) ঢাকা
নরেন বিশ্বাস	১৪০২	'প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে খাদ্য-পানীয়' *সাহিত্য পত্রিকা* (৩৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) ঢাকা
ফাতেমা কাওসার	১৩৯৭	'মৈমনসিংহ গীতিকা'র জনজীবন' *সাহিত্য পত্রিকা* (৩৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) ঢাকা

বরুণ কুমার চক্রবর্তী	১৯৯৮	'গীতিকায় মানবতাবাদ' *ফোকলোর* (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) ঢাকা
	২০০১	'গীতিকায় বারোমাসি' *ফোকলোর* (৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) ঢাকা
বিশ্বনাথ রায়	১৯৯৯	'ময়মনসিংহ গীতিকা সম্পদঃ রবীন্দ্র দৃষ্টিতে' *ফোকলোর* (২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা) ঢাকা
মযহারুল ইসলাম	১৩৭১	'পূর্ব পাকিস্তানের লৌকিক পুরাকাহিনী ও লোকগীতিকা' *বাংলা একাডেমী পত্রিকা* ঢাকা
মোঃ শহীদুর রহমান	১৪০৪	'ময়মনসিংহ গীতিকায় নারীচরিত্র' *সাহিত্য পত্রিকা* (৪১ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) ঢাকা
	১৪০১	'গীতিকায় চিত্রিত রোমান্স ও রোমান্টিকতা' *সাহিত্য পত্রিকা* (৩৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) ঢাকা
	১৪০৩	'ময়মনসিংহ্ গীতিকার ভাষাঃ দৃষ্টির ভিন্ন ভঙ্গী' *সাহিত্য পত্রিকা* (৪০ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) ঢাকা
রফিকুল ইসলাম	১৩৮১	'নজরুলের প্রথম পর্বের কাব্যে চিত্রকল্পের ব্যবহার' *সাহিত্যপত্রিকা* (১৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) ঢাকা
সাঈদ-উর রহমান	১৯৮৫	'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকায় সমাজের ছবি' *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা* (২১ তম সংখ্যা)
সৈয়দ আজিজুল হক	১৯৯৬	'দীনেশ চন্দ্রের চেতনায় বাংলার পল্লী জীবন' *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা* (যুক্তসংখ্যা ৫০,৫১,৫২)